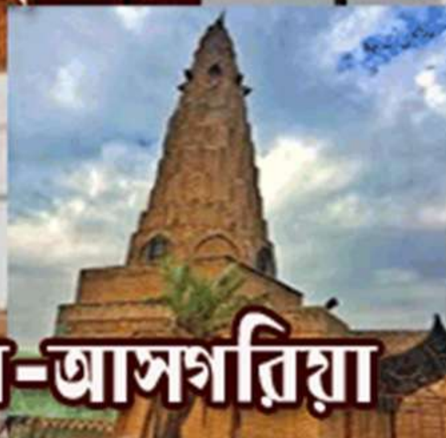
আউলিয়ায়ে সুহরাওয়ার্দিয়া

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী





খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

আউলিয়ায়ে সুহরাওয়ার্দিয়া

(সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকার মাশাইখে আজমের জীবন ও সাধনা)

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী



খানক্বায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া

হাদিয়ায়ে সওয়াব-

সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার সকল আউলিয়ায়ে কিরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এর প্রতি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করুন।

কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল ক্বদর খলিফা, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত পরিচালক

হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দা.বা. এর পক্ষ থেকে-

প্রাক কথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা-বাদ-

আলহামদুলিল্লাহ! খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে আরো একটি দ্বীনি গ্রন্থ প্রকাশ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। খানক্বার প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী "**আউলিয়ায়ে সুহরাওয়ার্দিয়া**" শিরোনামের এই বইটি রচনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত পাঠ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ উপকৃত হবে। আর তাঁর ওয়ারিস হিসেবে স্বীকৃত উলামা ও ওলিআল্লাহগণের জীবনী পাঠ করলেও অনুরূপ উপকৃত হওয়া যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দীর্ঘদিনের চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে লেখক এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠকদের সম্মুখে হাজির করেছেন। আমি আশারাখি প্রত্যেক পাঠকই এ থেকে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থে প্রথমত, পেয়ারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। সকল সুফি তারিকার সিলসিলাই হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অথবা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছুয়েছে। সুতরাং যে কোনো তরিকার সিলসিলা মুতাবিক ওলিদের জীবনালোচনায় সিরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকবেই। সেসাথে থাকবে হযরত আলী কিংবা আবু বকর সিদ্দীক ও সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের জীবনাদর্শের আলোচনা। চিশতিয়া তরিকার মতো সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার সিলসিলার সমাপ্তি ঘটেছে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগ পর্যন্ত জন্ম নেওয়া সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকার ২৯ জন ওলির জীবন ও সাধনার উপর আলোচনা হয়েছে এ গ্রন্থে। ওলিদের জীবন খুব

চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের জীবনভর সাধনার বর্ণনা আমাদেরকে প্রভুপ্রেমের প্রতি আকর্ষিত করে। ওলিরা আমাদের আদর্শ। তাঁদের জীবনকাহিনী পাঠ করে যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়ামী হাসিল করতে পারেন। আমি আশারাখি সুন্দর প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ থেকে সবাই উপকৃত হবেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রার্থনা জানাই তিনি যেনো আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা। পাঠকরাও যাতে ওলিআল্লাহদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে দ্বীনদারিত্বের প্রতি, তাসাওউফের সাধনার প্রতি আরো বেশি আগ্রহান্বিত হন, আমি এই কামনাই করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য করুন। আমিন।

ফারুক আহমদ
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

সূচিপত্র

ভূমিকা ০১০
সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ০১৭
হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১৩১
হযরত শায়খ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৪২
হযরত শায়খ হাবিব ইবনে মুহাম্মদ আজমী বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৫২
হযরত শায়খ দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৬২
হযরত শায়খ আবুল হাসান সিররি ইবনে মুগলিস সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৬৯
হযরত শায়খ আবুল ক্বসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৮৩
হযরত শায়খ আবু আলী আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২২০
হযরত শায়খ আবু আলী হাসান ইবনে আহমদ কাতিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২২৬
হযরত শায়খ খাজা আবু উনসান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২২৮
হযরত শায়খ আবু বকর তুসী নাসসাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৩৫
হযরত শায়খ আহমদ গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৩৮
হযরত শায়খ জিয়াউদ্দিন আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৪৭
হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৫০
হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৬৩
হযরত শায়খ সাইয়্যিদ জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৮০
হযরত শায়খ কাজি হামিদুদ্দিন নাগরী রাহামতুল্লাহি আলিইহি ২৮৫
হযরত শায়খ সদরুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৯১
হযরত শায়খ রুকুনুদ্দিন আবু ফাতাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৯৫
হযরত শায়খ মুসলেহ উদ্দিন সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩০০
শায়খ মাওলানা জিয়াউদ্দিন নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩২৩
হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল কুরাইশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩২৯
হযরত শায়খ সাইয়্যিদ আলী শা'বান মিল্লাত জৌনসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৩২
হযরত মাখদুম শায়খ তকিউদ্দিন জৌনসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৪১
হযরত শায়খ তকি মাহসুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৪৬
হযরত শায়খ মাখদুম হুসামুদ্দিন চিশতী সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৫০
হযরত শায়খ সাইয়্যিদ কুতুবুদ্দিন কৌরাহ জাহানাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৫৬
হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন ইবনে সাইয়্যিদ কুতুবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৬৭
হযরত মাওলানা শায়খ মুবারক সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৭০

হযরত শায়খ নূরুদ্দিন আহমদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৭৩
হযরত শায়খ শাহ আবুল গউস বিরউই মৌ'ই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৭৬
পরিশিষ্ট: কে কোথায় সমাহিত আছেন ৩৮২
গ্রন্থপঞ্জী ৩৮৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ তা'আলার শুকুর-গুজার করে শেষ করা যাবে না। তাঁর অনুগ্রহে এ অধম, বিখ্যাত সুফি তরিকা '**সুহরাওয়ার্দিয়া**' শায়খদের জীবন ও সাধনার ওপর আলোচিত এ গ্রন্থটি সুপ্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমার এ প্রচেষ্টা। এ থেকে একজন পাঠকও যদি উপকৃত হন তবুও আমার কষ্ট-সাধনা সফল হবে। আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনালোচনা থেকে উপকৃত হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। বিখ্যাত ওলিআল্লাহ শায়খ খাজা ইউসুফ হামাদানী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো: "**যখন আল্লাহর ওলিগণ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান তখন আমরা কী করবো?**" তিনি বললেন, "**তাঁদের কথা ও উপদেশবাণীর পুনরাবৃত্তি করো।**" এতে বুঝা গেলো ওলিদের জীবনালোচনা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হওয়া যায়। বিশিষ্ট ওলিআল্লাহদের চিত্তাকর্ষক জীবনী গ্রন্থ পড়ে অনেক লোক সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমিয়েছেন বলেও বহু প্রমাণ বিদ্যমান। সুতরাং '**আউলিয়ায়ে সুহরাওয়ার্দিয়া**' শিরোনামের এ গ্রন্থটি পাঠ করে যদি কেউ সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমান তাহলে সবিনয় আবদার থাকবে, অনুগ্রহপূর্বক এ অধমের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে দুআ করবেন।

মহাত্মন আউলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর প্রিয়জন। তাঁদের জীবন ও সাধনা সকল মুসলমানের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা ও অনুসরণযোগ্য। তাঁদের জীবনালোচনা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা একটি দীর্ঘ সাধনা। আল্লাহর খাস অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া এরূপ কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা-সাধনার বিনিময়ে প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি লিখে শেষ করার তাওফিক ইনায়েত করায়, আমি অধম আবারও মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বেশ কিছুদিন হলো '**আউলিয়ায়ে চিশত**', '**আউলিয়ায়ে নকশবন্দ**' ও '**আউলিয়ায়ে ক্বাদিরীয়া**' শিরোনামে অনুরূপ আরো তিনটি গ্রন্থ রচনা করার তাওফিক হয়।

প্রথমোক্ত গন্থে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার শায়খ হযরত কুতবে জামান মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত মোট ৪২ জন '**চিশতি**' ওলিআল্লাহর জীবন ও সাধনার বর্ণনা এতে স্থান পায়। গ্রন্থটির প্রিন্ট প্রকাশনা করতে এখনও সক্ষম হই নি। তবে আল্লাহর দয়ায় এটি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া হিসেবে ইন্টারনেটে প্রকাশ করতে পেরেছি। দু-তিনটি ওয়েভসাইটে আপলোড করার পর বহু লোক এটি অনলাইনে ও ডাউনলোড করে পাঠ করেছেন এবং করছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে স্থান পেয়েছে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাসহ আধুনিক যুগ পর্যন্ত আরো ৩৫ জন '**নকশবন্দী**' ওলিআল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা। এটাও ইন্টারনেটে প্রকাশ হওয়ার পর অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ অনলাইনে ও ডাউনলোড করে পাঠ করছেন। অনুরূপ '**আউলিয়ায়ে ক্বাদীরিয়া**' গ্রন্থটিও ইন্টারনেটে প্রকাশিত হওয়ায় তাসাওউফ শাস্ত্রের উপর অনুসন্ধানী পাঠকবর্গ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

বর্তমান এ গ্রন্থে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ আরো ২৯ জন '**সুহরাওয়ার্দিয়া**' তরিকার ওলিআল্লাহর জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমরা এটিও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া হিসেবে ইন্টারনেটে আপলোড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশাকরি আগের তিনটি কিতাব পাঠ করে যেভাবে সবাই উপকৃত হচ্ছেন, এটা পাঠ করেও বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সবার প্রতি আবদার জানাচ্ছি, এ অধমের জন্য খাস করে দুআ করবেন মহান দয়ালু আল্লাহ তা'আলার দরবারে। তিনি যেনো এ চারটি কিতাবকে রোজ কিয়ামতের কঠিন সময়ে তাঁর এ গুনাহগার বান্দাসহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তামাম উম্মতকে ক্ষমা করে দেন।

সকল হক্কানি সুফি তরিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। সবগুলোর উৎপত্তিস্থল রাহমাতুল্লিল আলামিন, সায়্যিদিল মুরসালীন, ইনসানে কামিল, স্রষ্টার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম।

'**তরিকা**' শব্দের অর্থ রাস্তা বা পদ্ধতি। প্রত্যেক সুফি তরিকার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। যুগ যুগ ধরে বিশিষ্ট মাশাইখে কিরাম এ চরম-পরম লক্ষ্যর্জনের উপায় অবলম্বন হিসেবে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। প্রাথমিক যুগের আউলিয়ায়ে কিরাম বিভিন্ন তরিকার নামকরণ আলাদাভাবে করেন নি। অনেক পরে বিশিষ্ট শায়খ বা স্থানের নামে বিভিন্ন তরিকার নামকরণ হয়েছে। যেমন: '**চিশতিয়া**' নামকরণের কারণ হচ্ছে শাম [সিরিয়া] থেকে হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী [মৃ.

৯৪০ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসাওউফচর্চার বিকাশ ঘটাতে স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে আফগানিস্তানের '**চিশত**' নামক জনপদে আসেন। তিনি পরবর্তীতে আবু ইসহাক শামী চিশতি হিসেবে পরিচিত হন। অনুরূপ বিখ্যাত ওলি হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী [মৃ. ১১৬৬ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে '**ক্বাদিরীয়া**', হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী [মৃ. ১৩৮৯ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে '**নকশবন্দিয়া**' এবং হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দী [মৃ. ১২৩৪ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির [মতান্তরে তাঁর চাচা হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি [মৃ. ১১৬৮ ঈ.] রাহিমাহুল্লার] নামানুসারে '**সুহরাওয়ার্দিয়া**' তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত প্রত্যেক তরিকার '**জিকির**', '**শুগুল**', '**মুরাক্বাবা**' ইত্যাদির মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকার মধ্যে জিকিরের ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো এই: চিশতি শায়খগণ জিকরে জলি [স্বরবে] এর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অপরদিকে নকশবন্দি শায়খগণ জিকরে খফি [নিরবে] এর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেহেতু এ গ্রন্থে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শাইখুল মাশাইখের জীবন ও কর্মের ওপর আমরা আলোচনা করেছি তাই এ তরিকার পরিচিতি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। আমি আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করি।

সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকা[১]

সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বর্তমান ইরানের অন্তর্গত সুহরাওয়ার্দ শহরে জন্ম নেওয়া ওলিআল্লাহ হযরত জিয়াউদ্দিন আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি [১০৯৭-১১৬৮ ঈ.] রাহিমাহুল্লাহ। মহাত্মন ইমাম গাযালী [১০৫৮-১১১১ ঈ.] রাহিমাহুল্লাহর ছোট ভাই শায়খ আহমদ গাযালী [১০৬১-১১২৬ ঈ.] রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তাঁর মুর্শিদ। তবে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় করে তুলেন আবু নাজিব রাহিমাহুল্লাহর ভাতিজা ও তরিকতের খলিফা হযরত শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর সুহরাওয়ার্দি [১১৪৫-১২৩৪ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইরাক, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকা তাঁরই বিভিন্ন খলিফার মাধ্যমে প্রসার লাভ করে। উপমহাদেশে যে দুজন ওলির মাধ্যমে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার গোড়াপত্তন হয় তাঁরা হচ্ছেন হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী [১১৭০-১২৬২ ঈ.] ও হযরত শায়খ জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী [১১৯৯-১২৯২ ঈ.] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। উভয়েই ছিলেন শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা।

[১] সূত্র: ইন্টারনেট।

সুহরাওয়ার্দি সিলসিলার শায়খ ও মুরিদগণ বাকি তিনটি প্রসিদ্ধ হক্কানী সিলসিলার মতো শরীয়তের ওপর সম্পূর্ণ আনুগত্যশীল ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণে খুবই পাওবন্দ ছিলেন এবং এখনও আছেন। ভারতবর্ষে উপরে উল্লিখিত দুজন বুজুর্গ কর্তৃক মুলতান এবং উচ্ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় সুহরাওয়ার্দি খানক্বাহ।

শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ অতিরিক্ত 'খিলওয়াত' [নির্জনবাস] ও নফল রোযা রাখাকে অগ্রাধিকার দেন নি। তিনি সমকালীন শাসকদের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখতেন। বাগদাদের খলিফাগণ তাঁকে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাত নিরসনে দূত হিসেবে প্রেরণ করতেন। বাগদাদে হযরতের জন্য একটি প্রশস্ত মনোরম বাসস্থান তৈরি করে দেন খলিফা নাসির [১১৫৮-১২২৫ ঈ.]। এই খলিফার বিশেষ দূত হিসেবে হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ সে যুগের বিভিন্ন সুলতান ও রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিতে হয়েছিলেন। তিনি আতিথেয়তা গ্রহণ করেন মিশরের আইয়ুবী সুলতান মালিক আদিল ১ম [১১৪৫-১২১৮ ঈ.], বুখারার খোয়ারিজমের শাহ মুহাম্মাদ ২য় [১১৬৯-১২২০ ঈ.] এবং কনিয়ার সেলজুক শাসক আলাউদ্দিন কায়কোবাদ ১ম [১১৮৮-১২৩৭ ঈ.] প্রমুখের রাজপ্রাসাদে।

শায়খ শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর খলিফা হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লার মুরীদ ও খলিফা ছিলেন হযরত ফখরুদ্দিন ইরাকী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তুরস্কের কোনিয়া শহরে ইলমে তাসাওউফের প্রচার-প্রসার ঘটান। প্রথমে তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর মুলতানের খানক্বায় অবস্থান করেন। একজন কবি হিসেবে রচনা করেন অসংখ্য মরমী কবিতা। স্বীয় পরী বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তাঁকে ডেকে বললেন, "হে ফাখরুদ্দিন! তুমিই হবে আমার স্থলাভিষিক্ত পীর। তোমাকে আমি সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার খিরক্বা প্রদান করছি।"

এ সংবাদে কিন্তু মুলতানের অন্যান্য মাশাইখ খুশি হতে পারেন নি। সুতরাং হিংসা হেতু ফখরুদ্দিন ইরাকী রাহিমাহুল্লাহর বিরুদ্ধে তাঁরা সুলতানের নিকট নালিশ করলেন। ফলে সুলতান তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। কিন্তু তিনি কয়েকজন সহচরসহ মুলতান ছেড়ে পালিয়ে যান।

প্রথমে তাঁরা হারামাইন শরীফাইনে যেয়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। পরবর্তীতে সবাই চলে যান তুরস্কের কোনিয়া শহরে। এসময় কোনিয়ায় অবস্থান করছিলেন হযরত শায়খ জালালুদ্দিন রুমী রাহিমাহুল্লাহ। হযরত ইরাকী রাহিমাহুল্লাহ প্রায়ই রুমী রাহিমাহুল্লাহর দারস ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। পরে রুমী রাহিমাহুল্লাহর জানাযায়ও শরীক হোন।

কোনিয়ায় থাকাকালে সুহরাওয়ার্দি সুফি তরিকার প্রধান ‘মুহাজির শায়খ’ হিসেবেই হযরত ইরাকী রাহিমাহুল্লাহ সবার নিকট পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি সেখানকার এক শায়খের সুহবত লাভ করে ধন্য হোন। তাঁর নাম হলো হযরত সদরুদ্দিন কোনাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন কিছুদিন পূর্বে ইন্তিকালপ্রাপ্ত সুফি শায়খ ও দার্শনিক শাইখুল আকবর হযরত ইবনুল আরাবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জামাতা। হযরত সদরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ সে যুগে তাঁর বিখ্যাত পড়শী রুমী রাহিমাহুল্লাহ থেকেও অধিক খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে হযরত ইরাকী রাহিমাহুল্লাহ ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহর ‘ওয়াহদাতুল উজূদ’ সুফিতত্ত্বের ওপর বিশদ জ্ঞানলাভ করেন। শেষে তিনি নিজেই উক্ত তত্ত্বের ওপর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ‘লামা’আত’ [পবিত্র ঝলকানি] কবিতাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

হযরত ফখরুদ্দিন ইরাকী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁকে সমাহিত করা হয় শায়খুল আকবর হযরত ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহর সমাধির পাশে।

এদিকে মুলতানে হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরই পুত্র হযরত শায়খ সদরুদ্দিন আ’রিফ রাহিমাহুল্লাহ। আর তাঁর খলিফা ছিলেন হযরত আমির হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ‘জাদুল মুসাফিরীন’ নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়া ‘ওয়াহদাতুল উজূদ’ তত্ত্বের ওপরও তিনি একাধিক রচনা করে গেছেন। তাঁর পুত্র ও খলিফা হযরত রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন দিল্লির সুলতানদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী থেকে মুহাম্মদ ইবনে তুগলক পর্যন্ত সুলতানগণ তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

হযরত শায়খ রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকালের পর মুলতানে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য স্থান যেমন উচ্, গুজরাট, পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং দিল্লিতে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এছাড়া সুহরাওয়ার্দি তরিকা তখনকার বঙ্গদেশেও প্রসারিত হয় হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী, হযরত শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানায়িরী প্রমুখ মাশাইখে আজমের মাধ্যমে। বর্তমান

বাংলাদেশের সিলেটের জমিনে সমাহিত প্রথমোক্ত ওলিআল্লাহর মুর্শিদ ছিলেন স্বীয় মামা শায়খ আহমদ কবির সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর খলিফা ছিলেন। তিনি শেষ জীবন মক্কা মুকাররমায় কাটিয়েছেন।

শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু হাফস সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ তাসাওউফ শাস্ত্রের ম্যানুয়েল বা সারগ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থের রচয়িতা। সুহরাওয়ার্দি তথা সকল সুফি তরিকার শায়খ ও সালিকগন এ কিতাব থেকে উপদেশ গ্রহণ করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। এ গ্রন্থে সুলুকের যাবতীয় দিকনির্দেনা ও চেষ্টা-সাধনার পথ ও পাথেয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রাঞ্জল আরবি ভাষায়।[২]

সুহরাওয়ার্দি তরিকায় জিকির হচ্ছে আধ্যাত্মিক ব্যায়াম: আধ্যাত্মিক শুদ্ধিলাভের উপায় সুহরাওয়ার্দি শায়খগণ জিকরুল্লাহকে আধ্যাত্মিক ব্যায়াম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জিকির-মুরাক্বাবা ও ধ্যান-সাধনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট 'আদব' রক্ষা হচ্ছে এ তরিকার গুরুত্বপূর্ণ দিক। শায়খের দায়িত্ব হলো মুরিদদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়া যাতে করে তারা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভে ধন্য হন। হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদে যেয়ে হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ হওয়ার পর প্রথমেই উক্ত 'জিকিরের আদব' শিখেছিলেন। মুলতানে ফিরে এসে তিনি 'খানক্বাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে যারাই তাঁর মুরিদ হতে এসেছেন তাদেরকে তিনি উক্ত জিকিরের আদব এর ওপর প্রথমেই সবক দিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'জিকিরের আদবের প্রতি আনুগত্য মানেই আল্লাহ ও তাঁর শরীয়তের ওপর আনুগত্য। এটাই সকল সালিককে সাহায্য করে সবদিক থেকে। এরই মাধ্যমে সালিকের অন্তরে আল্লাহর মা'রিফাতের নূর পয়দা হবে।'[৩]

এ গ্রন্থে আমরা প্রথমে সুহরাওয়ার্দি স্বর্ণালী সিলসিলা মুতাবিক হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এরপর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাহিদ্বাআল্লাহু আনহুর জীবনালোচনা এসেছে।

২ "হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর আওয়ারিফুল মা'আরিফ থেকে তুহফাতুস সালিকীন" শিরোনামে একটি গ্রন্থ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী। পাঠকরা এটি খানক্বার ওয়েভসাইট: khanqaaminiaasgaria.000webhostapp.com থেকে ডাউনলোড করে পাঠ করতে পারেন।

৩ কামরুল হুদা, স্ট্রাইভিং ফর ডিভাইন ইউনিয়ন: স্পিরিটিউয়্যাল এক্সারসাইজেজ অব দ্যা সুহরাওয়ার্দি সুফিজ, রুটলেজ কার্জন, লন্ডন, ২০০৩, পৃ. ৮।

এরপর ধারবাহিকভাবে সিলসিলা মুতাবিক ইমামুত তারিকা হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি এবং হযরত শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা পর্যন্ত ওলিদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর পরের যুগের সুহরাওয়ার্দি তরিকার আরো বেশ কয়েকজন ওলির জীবন ও কর্মের ওপরে আলোচনা এসেছে। সুতরাং গ্রন্থে রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবি ও চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছাড়াও সুহরাওয়ার্দি তরিকার আরো ২৯ জন শাইখুল মাশাইখের জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা হয়েছে। আমি আশারাখি পাঠকরা এ গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যাঁরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং আমার মুর্শিদে বরহক্ব কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর জলিলুল ক্বদর খলিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম অন্যতম। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা হযরতকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আরো যাঁরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন খলিফায়ে মদনী হযরত মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহিমাহুল্লাহর নাতি মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত সচিব], কবি আবদুল মুকিত মুখতার [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা বিভাগের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী] এবং ড. মোহাম্মদ শামিম খান [খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী]। আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমীন।

ভুল-ত্রুটির জন্য সর্বাগ্রে আমি মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের নিকট ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করবো। হে আল্লাহ! অধম এ লেখক এবং গ্রন্থের পাঠকদেরকে আপনি দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমিন।

-গ্রন্থকার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرفالنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওফাৎ ১০ হিজরি, ১২ই রবিউল আউয়াল, মাজার শরীফ-শরীফ-মদীনা মুনাওয়ারাহ

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইতিহাস।

রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, রাহাতুল আশিকীন, সায়্যিদিল মুহিব্বীন, ইমামুত তারিক্বাত ওয়াশ শারিয়াত হযরত মুহাম্মদ আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয় পবিত্র মক্কা নগরীতে ঈসায়ী ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ প্রভাতকালে। তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের একটি দুআর বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের শুভাগমনের সুসসংবাদ দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ দু'আটি উল্লেখিত হয়েছে:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হিকমাতওয়ালা। [২:১২৯]

হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতে করীমের তাফসীরে বলেন:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র কুরআন শিক্ষা দেন নি। কারণ তাঁর মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রাজ্ঞতার সঠিক দিক-নির্দেশানাও প্রদান করতে চেয়েছেন। সুতরাং তিনি শুধুমাত্র শরীয়তের আইন-কানুন শিক্ষা দেন নি, বরং সাধারণ লোকদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন জীবন-চলার সঠিক পথনির্দেশনা এবং বিশেষ ব্যক্তিদেরকে শিখিয়েছেন সূক্ষ্ম জ্ঞান ইঙ্গিত-ইশারায়। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গুরু। তাদের পবিত্র করবেন- কথাটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, অন্তর বা হৃদয়কে পবিত্রকরণ। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের মিশন শুধুমাত্র কথা ও আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি উত্তম চরিত্রগঠন ও নিয়তের বিশুদ্ধতাও প্রবর্তন করেন। রাসূল হিসেবে তাঁর চতুর্থ দিকটি হচ্ছে, তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ চরিত্র গঠনের মহাসংস্কারক।"

জগতে শুভাগমন ও নামকরণ

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত, আসহাবে ফীলের বছর তথা হস্তীবাহিনী দ্বারা ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা যে বছর মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল সে বছরই রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরার বুকে শুভাগমন করেন। ঠিক কোন তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন যে, শুভজন্মের দিন ছিলো সোমবার এবং সময় ছিলো সুবহে সাদিক। তারিখের ব্যাপারে চারটি রিওয়ায়েত বিদ্যমান: ২য়, ৮ম, ১০ম ও ১২তম রবিউল আউয়াল। এছাড়া ঈসায়ী ৫৭০ এবং কারো কারো মতে ৫৭১ সন হযরতের জন্মের বছর ছিলো বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিশ্ব-ভূবন আলোকিত করে হিদায়াতের নূরের রবি একদিকে মক্কা মুকাররমায় মা আমিনার কোলে উদিত হলেন আর অপরদিকে ভীষণ ভূমিকম্পে পারস্যের সম্রাট খসরুর রাজপ্রাসাদ ধ্বসে পড়লো। অগ্নিপূজার হাজার বছরের নিদর্শন যুগ যুগব্যাপী জ্বলন্ত অনির্বাণ অগ্নিশিখা নিভে গেল। শুকিয়ে গেল পারস্য উপসাগর। এসব অলৌকিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণ হলো যে, আখিরী নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মনোনীত মহাসত্যের মহান দ্বীন মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে ধরার বুকে শুভাগমন করেছেন। তাঁর

জন্মক্ষণে স্বীয় স্নেহময়ী মা আমিনার উদর হতে নূরের ঝলক সৃষ্টি হয়েছিল যার আলোতে সারা বিশ্বজগৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্য। সীরাত লেখকগণ হযরতের জন্মক্ষণের সময়কার আরোও অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সবই ছিলো আখিরী নবীর শুভাগমনের নিদর্শন।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরতের ‘মুহাম্মদ’ নামটি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব রেখেছিলেন। জন্মের পর আরবের রীতি অনুযায়ী শিশুর 'আক্বীকা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন আব্দুল মুত্তালিব। সবাই যখন জিজ্ঞেস করলেন, শিশুর নাম কি রেখেছেন? তিনি তখন বলে উঠলেন, "মুহাম্মদ"। সকলে অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, মুহাম্মদ! এই নামটি তো আমরা কেউ কোনদিন শোনি নি! আব্দুল মুত্তালিবের মুখ থেকে এই নতুন নামটি যেনো অদৃশ্যের ইশারায় বেরিয়ে আসে। সুতরাং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামকরণ হলো 'মুহাম্মদ'। তবে তাঁর মাতা আমিনাও একটি নাম রাখেন আর তাহলো- 'আহমদ'। উভয় নামই ঐশি ইশারায় রাখা হয়েছিল। মুহাম্মদ (محمد) শব্দের অর্থ প্রশংসিত আর আহমদ (احمد) অর্থ প্রশংসাকারী। বলাই বাহুল্য আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি। এছাড়া মানবজাতির মধ্যে মহান আল্লাহ পাকের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসা যে ব্যক্তি করেছেন তিনিও ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং তাঁর উভয় নামই স্বার্থক হয়েছে। এ দু'টো নাম ছাড়াও হযরতের আরো অনেক গুণবাচক নাম ছিলো।

দুগ্ধমাতা হালিমার গৃহে গমন ও শৈশবকাল

আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছিলেন। এরপর আরবের প্রথানুযায়ী তাঁকে দুগ্ধ পানের জন্য ধাত্রী মা হালিমার গৃহে গমন করতে হয়েছিল। সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মা হালিমার গৃহে গমন করার পর থেকেই বরকত নাজিল হতে থাকে। বিবি হালিমার উট, বকরি ইত্যাদি পোষা পশুর মধ্যে এই বরকত আত্মপ্রকাশ করে। এগুলো অতিরিক্ত দুধ যোগান দিতে থাকে। হালিমার সংসারে উত্তরোত্তর উন্নয়ন হওয়া শুরু হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এসেছে। তবে বিবি হালিমার গৃহে থাকাকালে চার বছর বয়সের সময় শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম সীনা ছাকের ঘটনাটি ঘটে। তাঁর জীবনে আরোও তিনবার সীনা ছাক হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়বার সীনা ছাক হয়েছিল দশ বছর বয়সের সময়। তৃতীয়বার এই

মু'জিযা ঘটে নুবুওয়াত-প্রাপ্তির প্রাক্কালে এবং চতুর্থবার সীনা ছাকের ঘটনা ঘটে মিরাজে গমনের পূর্ব মুহূর্তে।[৪]

মাতৃবিয়োগ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট পাঁচ বছর ধাত্রীমাতা বিবি হালিমা সা'দিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তবে আপন মাতা বিবি আমিনার গৃহে প্রত্যাবর্তনের মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই তিনি দুঃখের সাগরে ভেসে গেলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি উল্লেখ করলাম।

বিবি আমিনার গৃহে উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা নামক একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। পরবর্তীতে এই মহিলা সাহাবিয়্যাহ, মুক্ত হয়ে যান। এই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বিবি আমিনা একদা ছয় বছরের শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ ইয়াসরিব (মদীনা) ভ্রমণে যাত্রা করলেন। ইয়াসরিব ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতামহের মাতুতালয়। কিছু কিছু সীরাত লেখকের মতে এই সফরের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। বিবি আমিনা তাঁর আদরের দুলালকে স্বীয় স্বামীর কবরটি জিয়ারত করানোরও নিয়ত করেছিলেন। যা হোক, মাতা-পুত্র ও পরিচারিকা উম্মে আইমান উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চললেন। কয়েকদিন পর তাঁরা ইয়াসরিবে এসে উপনীত হন। এখানে হযরতের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাতা সালমা বিনতে আমর বানূ আদিয়্যা ইবনুন নাজ্জার গোত্রের মেয়ে ছিলেন, বিধায় তারা এই বংশের 'দারুন-নাবিগা'য় অবস্থান করেন। উল্লেখ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের জন্ম ও শৈশবকাল এখানেই কেটেছিল।

দারুন-নাবিগায় দীর্ঘ এক মাস অবস্থানের পর বিবি আমিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আবওয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছুলে আমিনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং একমাত্র প্রাণপ্রিয় আদুরে দুলালের দিকে করুণ নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে এই ধরার কোল থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করলেন। উম্মে আইমান শিশু মুহাম্মদ মুস্তফাকে নিয়ে এই বিপদক্ষণে বিরাট ধৈর্য ধারণ

[৪] "সীনা ছাক" সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন গ্রন্থকার প্রণীত "আউলিয়ায়ে চিশত" শিরোনামের বইটি।

করলেন ও আমিনাকে সেখানেই দাফন করে দ্রুত মক্কা শরীফের পথে পাড়ি জমালেন। এই করুণ হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিপটে জাগরুক ছিলো। হিজরতের পর বানূ আদিয়্যা ইবনুন-নাজ্জার এর মনযিল ও আবাসস্থল অতিক্রমকালে তিনি একবার বলেছিলেন: "শৈশবে আমি যখন আমার মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, তখন বানূ আদিয়্যার এই স্থানে আমি আমার মাতুতালয়ের শিশুদের সাথে খেলা করতাম এবং টিলার উপর বসে থাকা পাখীদেরকে আমরা সবাই উড়িয়ে দিতাম।" এরপর তিনি দারুন-নাবিগার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন: "আমার মাতা এবং আমি এখানেই এসেছিলাম। এই গৃহের মধ্যেই আমার পিতা আব্দুল্লাহর কবর রয়েছে। আর এই ঝিলের জলেই আমি প্রচুর সাঁতার কেটেছি।"

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে

উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে মক্কা শরীফ পৌঁছে আমিনার মৃত্যুর দুঃসংবাদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে বর্ণনা করলেন। আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং পিতামাতাহীন অসহায় আদুরে নাতির ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। নিজের পুত্র-পৌত্রদের তুলনায় অধিক বেশী আদর করে তিনি শিশু মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালন করতে থাকেন। সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, আব্দুল মুত্তালিব তাঁর আদুরে নাতি ছাড়া খাওয়া-পিনা করতেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অবাধে স্বীয় দাদার নিকট আসা-যাওয়া করতেন, তাঁর আসনে উঠে বসে যেতেন। কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কাবা শরীফের পাশেই একটি বড় আসন পাতা ছিলো। গোষ্ঠির অন্যান্য সকলেই এই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আব্দুল মুত্তালিবের চতুর্পার্শ্বে বসতেন। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলে আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে আদর করে নিজের কাছে এনে আসনে বসিয়ে দিতেন। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে সেখান থেকে নেমে আসতে বলতেন, তখন আব্দুল মুত্তালিব তাদের থামিয়ে অত্যন্ত গর্বভরে মন্তব্য করতেন, আমার এই নাতিকে এখানে বসতে দাও। সে ভবিষ্যতে এমন বড় মসনদের অধিকারী হবে যা ইতোমধ্যে কোনো আরব ব্যক্তির ভাগ্যে জুটে নি এবং কোনো কালেও জুটবে না। তিনি হযরতের একান্ত পরিচারিকা উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহাকেও সতর্ক করে দিতেন যে, তিনি যেনো তাঁকে দেখাশোনার ক্ষেত্রে একটুও অলস কিংবা উদাসীন না হোন। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু

আনহা এই দায়িত্ব অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতি ও দৃঢ়চিত্তে পালন করেছিলেন।[৫] এই ভাগ্যবতী মহিলার আসল নাম ছিলো বারাকাত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকারসূত্রে আবিসিনীয় হাবসী এই ক্রীতদাসীর মালিক হোন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তিনি উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে চিরতরে মুক্ত করে দেন। পরবর্তীতে হযরতের পালকপুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এই বিয়ের ফলেই তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

পিতা-মাতা হারা শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র দু'বছর স্বীয় দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অফুরন্ত স্নেহ-মমতায় লালিত পালিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কারণ দুই বছর পরই তিনি পরলোকগমণ করেন। এই মৃত্যুতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকাহত হয়েছিলেন এবং তিনি অনেকের মতো চোখের পানি আটকে রাখতে পারেন নি। বাস্তবে কুরাইশদের প্রসিদ্ধ এই নেতার মৃত্যুতে পুরো মক্কা শহরই শোকাকুল ছিল। আব্দুল মুত্তালিব তার দীর্ঘ জীবনে (কারো কারো মতে তিনি ১৪০ বছর জীবিত ছিলেন) অনেককিছু দেখেছেন। আবরাহা কর্তৃক মক্কা শহর আক্রমণ থেকে যমযম কূপ আবিষ্কার ও হযরতের পিতা আব্দুল্লাহকে 'কুরবানী' করার সংকল্প এবং পরে একশত উট দ্বারা কাফফারা প্রদান ইত্যাদি সবই তার হাতে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মক্কা শহরের অবিসংবাদিত নেতা। সুতরাং তার মৃত্যুর পর স্বভাবতই মক্কা শহরে কয়েক দিন যাবৎ শোক পালিত হয়। বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পিতামহের জানাযায় সকলের সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন।

চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে শৈশব-কৈশোর- যৌবনকাল

বর্ণিত আছে আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুশয্যায় থেকে আদুরে নাতির ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বীয় পুত্র আবু তালিবের হস্তে সোপর্দ করে যান। আবু তালিব অত্যন্ত হৃদয়বান প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের তত্ত্বাবধান সঠিক ও পূর্ণ

---

[৫] তখন তিনি অল্প বয়স্কা যুবতী ছিলেন মাত্র। তাঁর নাম ছিলো 'বারাকাহ'। পরবর্তীতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর আইমান নামক তাঁর এক সন্তানের জন্ম হয়। এ কারণেই তিনি উম্মে আইমান নামে পরিচিত হন।

দায়িত্বশীলতার মধ্যে পালন করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পরে কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ীও ছিলেন এবং সময় সময় তদানীন্তন পৃথিবীর বিখ্যাত পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের কেন্দ্র সিরিয়ার [শামের] দামেস্ক শহরে প্রায়ই বাণিজ্য ভ্রমণে যেতেন। সুতরাং হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন মাত্র নয় বছর পূর্ণ হয়েছে, তখনই চাচার সঙ্গে তিনি সিরিয়ায় সর্বপ্রথম বাণিজ্য ভ্রমণে যান। এই ভ্রমণেই 'বাহীরা' নামক এক খৃষ্টান সন্ন্যাসের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটি কিছু কিছু সীরাত লেখক উল্লেখ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। 'সীরাতুন-নবী' গ্রন্থের লেখক লেখক আল্লামা শিবলী নোমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও 'নবীয়ে রাহমাত' গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেন নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ যৌবনকালে আরেকবার শামে বাণিজ্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার একজন কর্মকর্তা হিসাবে এই ভ্রমণে যান। তাঁর বয়স তখন ২৫ বছর ছিলো। এই বাণিজ্য সফরে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন এবং তার সবই স্বীয় চাচা আবু তালিবের হাতে হস্তান্তর করেন। এই বছরই খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চল্লিশ বছর বয়স্কা (কোন কোন রিওয়ায়েত মতে ৪৫ বছর বয়স্কা) বিধবা সতী-সাধ্বী খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা স্বেচ্ছায় পঁচিশ বছর বয়সের তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে এতোই ভালোবাসতেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অপর কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকাবস্থায় খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র সন্তানের জননী হোন। কন্যা সন্তানদের নাম হলো রুকাইয়া, জায়নব, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না। পুত্র সন্তানদের নাম হলো আব্দুল্লাহ, তায়্যিব, তাহির এবং কাসিম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হযরতের আরেক পুত্র সন্তানের নাম ছিলো ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহু। মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহার গর্ভে এই সন্তানের জন্ম হয় মদীনা

মুনুওয়ারায়। পুত্রদের সকলেই বাল্য বয়সে পরলোকগমণ করেন। চারজন কন্যা সন্তানের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীর ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন।

কাবাঘরে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ, আল-আমীন খেতাবে ভূষিত হওয়া, খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ, সন্তানাদির পিতা হওয়া, হিলফুল ফুযুল সংস্থায় নেতৃত্ব প্রদান এবং ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সবই তাঁর যৌবনকালীন সময়ে সংঘটিত হয়। নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সময় ঘনিয়ে আসলে পরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানসিক অবস্থায় রদবদল শুরু হয়। তিনি দিন দিন ভাবুক হয়ে ওঠেন এবং নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে থাকেন।

নুবুওয়াত প্রাপ্তি

মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম থেকে ৩ মাইল দূরে ঐতিহাসিক হেরা পর্বতটি অবস্থিত। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট্ট গুহা আছে যাকে গারে হেরা বলে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একান্ত একাকী ও নীরবে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যে এই গুহাটি বেছে নিলেন। তিনি খাবার ও পানীয়সহ একাধারে কয়েকদিন অবস্থান করতেন এই গুহাটিতে। নিশ্চয় আল্লাহর অদৃশ্য ইঙ্গিতে এই বিশেষ পাহাড় ও এর মধ্যস্থিত গুহাটি নুবুওয়াত প্রাপ্তির স্থান হিসাবে তিনি পছন্দ করেছিলেন। যারা পবিত্র মক্কা শহরে গিয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই পড়েছে যে, এই পাহাড়খানা মক্কাস্থ অন্যান্য সকল পাহাড়-পর্বত ও টিলার তুলনায় একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্তমানে 'জাবালে নূর' নামক এই পাহাড়ের উপরস্থ অংশটি কিবলার দিকে 'সিজদাবনত' আছে বলে প্রতীয়মান হয়। গুহার শৃঙ্গ থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ আগের যুগে স্পষ্ট দেখা যেতো। এখন অবশ্য অনেক উঁচু ও বিরাট বড় বড় অট্টালিকায় ঘেরা মসজিদুল হারাম এবং বাইতুল্লাহ শরীফ ঐ পাহাড় থেকে আর আগের মতো তেমন পরিষ্কারভাবে দেখায় না।

ঠিক কতদিন তিনি জাবালে হেরায় আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়েছিলেন এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ দীর্ঘ ১১ কিংবা ১২ বছর পর্যন্ত

উল্লেখ করেছেন। যা হোক, নবীজীর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখন যে তিনি ঘন ঘন সেখানে গিয়েছিলেন এবং সময় সময় এক মাস পর্যন্ত একাধারে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটাতেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বিশেষ করে পবিত্র রমজান শরীফে তিনি হেরা গুহায় থেকে যেতে বেশী পছন্দ করতেন। এই রমজান শরীফেরই একটি মুবারক রাতে তাঁর প্রতি প্রথম ওহী নাজিল হয়।

নুবুওয়াত-প্রাপ্তির ৬ মাস পূর্ব থেকেই অত্যধিক পরিমাণ সত্যস্বপ্ন দেখতে লাগলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হেরা পর্বতে আসা যাওয়ার সময়ও তিনি শুনতে পেতেন কে যেনো বলছে, "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!"। গুহার মধ্যে থেকে তিনি মুজাহাদা, ত্যাগ স্বীকার ও রিয়াজতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহির ভার বহনের যোগ্যতা অর্জন করেন। এরপর একদা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম সূরা আলাক্ব এর প্রথম পাঁচটি আয়াত শরীফ নিয়ে হেরা গুহায় আত্মপ্রকাশ করলেন। ঠিক কিভাবে ওহী নাযিলের সূচনা ঘটে তা বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি প্রখ্যাত হাদীস থেকে নিম্নে তুলে ধরছি।

হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রথম প্রথম ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী প্রেরণ শুরু হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা ভোরের আলোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। আর তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে লাগলেন। তাই হেরা গুহায় চলে যেতেন আর পরিবার পরিজনের কাছে আসার পূর্বে এক নাগাড়ে কয়েক রাত পর্যন্ত তাহান্নুস করতেন। তাহান্নুস হলো বিশেষ এক নিয়মে ইবাদত বন্দেগী করা। এ জন্য তিনি কিছু খাবার দাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর বিবি খাদীজার কাছে আসলে তিনি আবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে নিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে সত্য এসে পৌঁছুল। ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করেন। আমি এতে প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তিনি আমাকে আবার ধরলেন এবং ছেড়ে বললেন, আপনি পড়ুন! আমি আবার

বললাম, আমি পড়তে জানি না। এরপর তিনি আমাকে তৃতীয়বারের মতো খুব জোরে ধরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: ... ... اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ... [ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক্ব ... পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।]" [বুখারী]

সর্বপ্রথম এই ওহী নাযিলের পরই কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার আকষ্মিকতায় ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে স্বগৃহে ছুটে গিয়ে হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে বলতে লাগলেন, "আমাকে ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও! আমার বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে!"। এতদশ্রবণে বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাঁকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি সবকিছু খুলে বললেন।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ স্ত্রী। তিনি স্বীয় স্বামী সম্পর্কে যা কিছু গত ১৫ বছরের বিবাহিত জীবনে অবগত হয়েছিলেন তা ইতোমধ্যে আর কেউ বুঝতে পারেন নি। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য, তাঁর চলাফেরা ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মুহাব্বাত, তাঁর পবিত্র চেহারায় সদা প্রকাশিত স্বর্গীয় নূর ইত্যাদি সবকিছুই খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নিকট স্বচ্ছ পানির মতো আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি জানতেন, এই মহাপুরুষ নিশ্চয়ই কোনো মহান দায়িত্বপালন হেতু স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তি। সুতরাং তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহনপূর্বক তার ভার হালকা করেন, অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, মেহমানের খাতির-যত্ন ও মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে চলতে গিয়ে তাকলিফ ও বিপদ-মুসিবতে সাহায্য করেন।" [বুখারী, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ:) প্রণীত 'নবীয়ে রহমত' [বঙ্গানুবাদ] থেকে উদ্ধৃত]

এরূপ সান্ত্বনা প্রদানের পর বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জার নিকট চলে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী আলিম। অতিরিক্ত বয়স হওয়ার দরুন তিনি তখন অন্ধ। সবকিছু অবগত হয়ে বললেন,

"সুবহানাল্লাহ! ইনিই তো সেই মঙ্গলময় বার্তাবাহক জিব্রাঈল ফিরিশতা! যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিসসালামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নুবুওয়াতের প্রচারকালে যদি আমি শক্তিশালী যুবক থাকতাম! হায়, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে"। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শ্রবণ করে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সত্যিই কি আমার লোক আমাকে দেশান্তর করবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ন্যায় যাঁরা আপনার পূর্বে এরূপ সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, জগদ্বাসী তাঁদের সঙ্গেও শত্রুতা না করে ছাড়ে নি।" [বুখারী]

এরপর বেশ কিছুদিন যাবৎ ওহী অবতীর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে হতাশ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত একদা তাঁর প্রতি সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হলো। এ সম্পর্কে যাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন, "একদা আমি পথ চলার সময় আসমানের দিক থেকে বিকট আওয়াজ শ্রবণ করলাম। উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম হেরা গুহায় যে ফিরিশতা আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি আসমান যমীনের মধ্যখানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। আমি এতে ভীষণ ভয় পেলাম। ভয়ার্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে কম্বল দ্বারা ঢেকে দাও। কম্বলে ঢাকা অবস্থায় আমার উপর পবিত্র কুরআনের সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হলো:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, আপনি লোকদিগকে সতর্ক করুন। আপনার প্রভুর মহিমা প্রচার করুন। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" [সূরা মুদ্দাসসির : ১-৫]

এরপর নিয়মিত ওহী নাযিল হতে থাকে। কিন্তু ওহীর ভার বহন করা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট খুব কষ্টকর ব্যাপার ছিলো। একটি হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, "প্রথম প্রথম যখন ওহী নাযিল হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্মরণ রাখার জন্য অনেক কষ্ট করতেন। জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম ওহী পড়ে শোনাবার সময়

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওষ্ঠদ্বয় মুবারক নাড়তে শুরু করতেন।" এরপর পবিত্র কুরআনের এই ক'টি আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ*

"আপনি তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার উদ্দেশে আপনার ওষ্ঠদ্বয় নড়াবেন না; পবিত্র কুরআন আপনার অন্তরে সংরক্ষণ আমারই দায়িত্ব; অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন; এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।" (ক্বিয়ামাহ : ১৬-১৯)

দাওয়াত ও তাবলীগ

স্বভাবতই যাদের সঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো তাদেরকেই প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তবে সর্বপ্রথম যিনি এই দাওয়াত অকপটে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন হযরতের একান্ত বন্ধুজন ও প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা। এরপর আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রায় দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ গোপনে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত ছিলো। শুধু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন, তাঁর নবদীক্ষিত সাহাবীরাও দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজে জড়িত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা ও সফলতা লাভ করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁরই দাওয়াতের ফলে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যুবায়ির ইবনে আওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ইসলামে দীক্ষিত হন। এই গোপনে দাওয়াতী কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ী হয় নি।

আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিলেন তাঁর হাবিবকে। ইরশাদ হলো:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

এবং

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও।" [সূরা শু'আরা: ২১৪-২১৫]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন। তিনি প্রথমেই আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসলেন। আহার শেষে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন আবু লাহাব অশ্লীল বাক্যবাণে এই প্রচেষ্টার জোর বাধা প্রধান করলো।

এরপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আবার নির্দেশ এলো:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"আপনি যে বিষয় আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।" [সূরা হিজর : ৯৪]

এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফ নিকটস্থ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে মক্কাবাসীদের আহ্বান করলেন। কোনো বিশেষ ব্যাপার ব্যক্ত করতে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে ডাক দেওয়ার রিওয়াজ ছিলো তখনকার মক্কা শহরে। সুতরাং তাঁর ডাকে সবাই জমায়েত হলো। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি বলি, ঐ পাহাড়ের অপরপ্রান্তে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছে। এরা তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই সমস্বরে বললো, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কারণ আপনি মিথ্যাবাদী নন। এরপর তিনি মক্কার একেকটি গোত্রের নাম ধরে ধরে বললেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যদি ইহ-পরকালের সাফল্য কামনা করে থাকো তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। এখানেও আবু লাহাব অত্যন্ত মন্দ ভাষায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আচরণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই

পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা লাহাব নাযিল হয়। এই সূরায় আবু লাহাবকে লানত করা হয়েছে।

দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করে তাঁর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কুরাইশরা বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লো। তারা লক্ষ্য করলো নতুন এই ধর্মমত হেতু তাদের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তাদের পূর্বপুরুষের পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। সুতরাং তারা যে কোনো উপায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দমিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলো। প্রথমে তারা জাগতিক বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কাজটি সারার চেষ্টা চালালো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। অবশেষে তারা কঠোরতা অবলম্বন করার হুমকি দিল।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একদা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বললো, "আবু তালিব! আপনি আমাদের মধ্যে একজন প্রবীণ জ্ঞানবান ব্যক্তি। আমরা ইতোমধ্যে আরেকবার আপনার নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে এই নতুন ধর্মমত প্রচার করতে নিষেধ করুন। আপনি তা উপেক্ষা করে গেছেন। আল্লাহর কসম! আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। আমাদের উপাস্য দেবদেবীর উপর দোষারোপ আর কতো সহ্য করবো। হয় আপনি তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন না হয় আমরা তাঁর ও আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো যতক্ষণ না আমাদের কোনো এক পক্ষ খতম হয়ে যায়।"

আবু তালিবের বয়স কম ছিলো না। একে তো বয়সের ভার তার ওপর নেতা হিসাবে তিনি চাচ্ছিলেন না যে, নিজস্ব জাতিগোষ্ঠির বিচ্ছিন্নতা ঘটুক। অপরদিকে এটাও তার উদ্দেশ্য ছিলো না যে, আপন ভাতিজাকে তাদের মর্জির উপর ছেড়ে দিতে। তিনি উভয় কুল যাতে রক্ষা পায় সে ভাবনা করছিলেন। তাই তিনি একদিন স্বীয় ভাতিজার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, "প্রিয় ভাতিজা আমার! তোমার গোষ্ঠির লোকেরা আমার কাছে এসেছিল। তারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তোমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলেছে। এখন দয়া করে আমার দিকে একটু খেয়াল দাও। নিজের জানেরও মায়া করো। আমার ওপর এত বোঝা চাপিয়ে দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই।"

প্রিয় চাচার মনে দুর্বলতা এসেছে লক্ষ্য করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ভাবলেন হয়তো তিনি আর তাঁকে সাহায্য-সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারবেন না। কুরাইশদের একটি প্রস্তাব ছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান তা তারা তাঁকে প্রদান করবে। এমনকি তিনি যদি রাজত্ব চান কিংবা আরবের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী চান তাহলেও তারা দ্বিধা করবে না। কিন্তু বিনিময়ে তাঁকে শুধুমাত্র এই দাওয়াতী কাজ ছেড়ে দিতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবু তালিবকে বললেন: "চাচাজান! আল্লাহর কসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও তুলে দেয় তথাপি আমার কাজ থেকে বিরত হবো না। হয় আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করবেন না হয় এটা করতে করতে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।" কথা শেষ হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো।

ভাতিজার কণ্ঠে এরূপ দৃঢ় সংকল্পের কথা শ্রবণ করে আবু তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, "ভাতিজা! আমার কাছে এসো। যাও! তোমার মনে যা চায় বলো। যেভাবে ইচ্ছে তোমার প্রচার কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তোমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না।"

কুরাইশ কর্তৃক চরম নির্যাতন

কুরাইশরা দাওয়াত পেয়ে ইসলাম-গ্রহণ থেকে শুধু দূরেই থাকে নি বরং কিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসরণকারীদেরকে স্তব্ধ করবে সে চিন্তায় মগ্ন হলো। তারা অনুরোধ, প্রলোভন, অসৌজন্যমূলক আচরণ, কঠোর কথাবার্তা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত নওমুসলিমদের উপর শারীরিক নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে দিল। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যা, শক্তিবল কম থাকায় তারা নির্বিচারে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এসময় হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু, খাব্বান ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু, সুহায়ব ইবনে সিনান আর-রূমী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আমের ইবনে ফুহায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আবু ফুকায়হা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও তাঁর মাতা সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা, পিতা ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং ভ্রাতা আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, লাবীবা রাদ্বিআল্লাহু

আনহা, যিন্নীরা বা যানবারা রূমিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, উম্মু উবায়স (বা 'উনায়স) রাদ্বিআল্লাহু আনহা, আন-নাহদিয়্যা ও তাঁর কন্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর মাতা হামামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা প্রমুখ সাহাবী/সাহাবিয়া কুরাইশদের এমন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যে তাঁদের উপর দৈহিক অত্যাচারের ঘটনাবলী শ্রবণ করলে গাঁ শিউরে ওঠে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তা কখনো নিভে যায় নি।

এদের কেউ কেউ নির্যাতনের ফলে শহীদও হয়েছেন। মহিলা সাহাবী হযরত সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ। নরাধম আবু জাহিল তাঁকে বর্শার আঘাতে হত্যা করে। এছাড়া তাঁর স্বামী ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু নির্যাতনের ফলে শহীদ হোন। সুতরাং পুরুষদের মধ্যে তিনি হলেন প্রথম শহীদ। শুধু তাই নয়, এই দম্পতি শহীদী দরোজা লাভ করার পর তাঁদের আদুরে সন্তান হযরত খাব্বাব ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইশদের চরম দৈহিক নির্যাতনের শিকার হোন। একদা আরেক সাহাবী তাঁকে শুধুমাত্র একটি পাজামা পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। লক্ষ্য করলেন, তাঁর পিঠে প্রচুর দাগ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কিসের দাগ? খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, কুরাইশগণ মক্কার কঙ্করময় মরুভূমিতে আমাকে যে শাস্তি দিত এগুলো তারই চিহ্ন। এই পরিবারের উপর এমন অমানবিক নির্যাতন স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি একদা এই নৃশংসতা স্বচক্ষে অবলোকন করে পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: "হে আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পরিবার! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের ঠিকানা জান্নাত" [বাইহাকী]।

হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘটনা সবার জানা। কিন্তু ঈমানের কী বিরাট শক্তি! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখে এসব মহাত্মন সাহাবীরা ঈমানের নূরে নূরান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁদের ঈমান হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত যাবতীয় মুসলমানের ঈমানের তুলনায় বহু বহু গুণ বেশী। তাঁদের তুলনা নেই। এরা ঈমানের জন্য যেরূপ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। এছাড়া দেশত্যাগসহ জান-মাল কুরবানী করেছেন, জিহাদের মাঠে সহাস্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। দ্বীনের জন্য তাঁদের অবদানের তুলনা নেই। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের যুগকে 'সর্বোত্তম যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে ওঠলো। ইতোমধ্যে হযরতের চাচা হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু এরপরও কুরাইশরা থামলো না। যে কোন মূল্যে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। সুতরাং এই নির্যাতন থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় তা ভেবে একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে বললেন, সম্ভব হলে তোমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করো। সেখানে একজন হৃদয়বান বাদশাহ আছেন। তিনি হকপন্থী ব্যক্তি। সে দেশে কারোর উপর অন্যায় অত্যাচার হয় না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা না করেন ততদিন তোমরা সেখানে নিরাপদে অবস্থান করতে পারবে। সুতরাং ১২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা (মতান্তরে ১২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা বা ১০ জন পুরুষ ৪ জন মহিলা কিংবা ১২ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলার কথাও বলা হয়েছে) আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত করেন। এই দলে ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা।

হিজরতকারীদের কথা কুরাইশরা অবগত হয়ে তাঁদের পেছনে ছুটে গেল। উদ্দেশ্য তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা। কিন্তু মুসলমানগণ সতর্কতার সাথে সমুদ্র তীর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছুয়েই দু'টি নৌকা ভাড়া করে নিয়ে উপকূল এলাকা ছেড়ে সমুদ্রপথে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এদিকে কাফিররা সমুদ্র তীরে পৌঁছুয়ে নৌকো চলে গেছে জেনে বিফলমনোরথে ফিরে এলো। হাবশায় (আবিসিনিয়ায় - বর্তমান ইথিওপিয়া) গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশীর অনুমতিক্রমে পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে দ্বীন পালন করতে থাকেন। তবে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, মক্কার সকল মুশরিক মুসলমান হয়ে গেছে। এ সংবাদ যখন হাবশায় পৌঁছায় তখন সাহাবায়ে কিরাম ভাবলেন, আর এখানে থেকে লাভ নেই। সুতরাং তারা মক্কা শরীফ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। মক্কার নিকটবর্তী হয়েই কিন্তু আসল সত্য তাঁদের নিকট ধরা পড়লো। সুতরাং তারা ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। শেষ পর্যন্ত অনেকেই আর ফিরে না যেয়ে গোপনে মক্কা শরীফ প্রবেশ

করলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনামতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হাবশায় ফিরে গিয়েছিলেন।

হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত

মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের মাত্রা কমলো না বরং আরো বেড়ে ওঠলো। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে মুসলমানদের একটি বড় দল হাবশায় হিজরত করলেন। এই দলে ৯৮ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা ছিলেন বলে বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরতের চাচা জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কুরাইশরা এদেরকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। দু'জন বিজ্ঞ কুরাইশ দূত অনেক উপঢৌকনসহ সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন আমর ইবনুল আস, যিনি পরবর্তীতে মিশর বিজয়ী প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অবশ্য তখনও মুসলমান হন নি। তার সঙ্গী ছিলেন উমারা ইবনুল ওয়ালীদ (কারো কারো মতে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ রবীআ)। এরা দরবারে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত কৌশলে উপঢৌকনগুলো নাজ্জাশীকে উপহার করলেন এবং সভাসদবর্গের সাথে আগেই আলোচনা করে তাদেরকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসলেন।

খৃষ্টান সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে কুরাইশ দূতদ্বয় তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন, "হে মহামহিম বাদশাহ! আমাদের কিছু নির্বোধ লোক স্বীয় কওমের দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে। তারা আপনাদের দ্বীনকেও মানে না। তারা একটি মনগড়া দ্বীনের অনুসরণ করে। এ নতুন দ্বীন সম্পর্কে আপনিও কিছু জানেন না আমরাও জানি না। আমাদের বংশের সম্ভ্রান্ত কিছু ব্যক্তি আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, আপনাকে অনুরোধ জানানো- এসব ধর্মত্যাগীদের তাদের কওমের নিকট ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।" সভাসদবর্গ আগে থেকেই কুরাইশদের পরামর্শ অনুযায়ী বলে উঠলো, হে মহামতি বাদশাহ! এই লোকগুলো সত্য বলেছেন। আমাদের মনে হয় এসব ভ্রান্ত লোকগুলোকে তাদের কওমের নিকট প্রেরণ করে দেওয়াই হবে উচিত কাজ।

সম্রাট নাজ্জাশী কিন্তু এসব কথায় সহজে মাথা নত করার পাত্র ছিলেন না। রাগান্বিত হয়ে বললেন, এই তথাকথিত ভ্রান্ত লোকগুলো কোথায়? কুরাইশরা বললো, তারা

আপনার রাজ্যে বসবাস করছে। বাদশা বললেন, তোমাদের কথায় আমি কখনো তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো না। আমাকে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তাদেরকেই আগে জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি অভিযোগ সত্য হয় তখন আমি তাদেরকে এই দূতদ্বয়ের হাতে সোপর্দ করতে পারি। সুতরাং হিজরতকারী সাহাবীদেরকে সম্রাটের দরবারে ডেকে পাঠানো হলো। সাহাবায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সকলের পক্ষে সম্রাটের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু দেবেন।

এরপর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীরা শুধুমাত্র সালাম জানালেন- সিজদা করলেন না। এতে সম্রাটের সভাসদবর্গ রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বাদশাহকে সিজদা করলেন না? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করি, আর কাউকে নয়। নাজ্জাশী জানতে চাইলেন, স্বীয় কওমের ধর্ম ত্যাগ করে তোমরা কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেছো? তোমরা তো খৃস্টধর্ম কিংবা সমসাময়িক অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের অনুসারী নও। জাফর ইবনে আবি তালিব জবাব দিলেন, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, তাঁর সাথে কাউকে শরীকও করি না।

এবার নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, এই দ্বীন কে এনেছে? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি। হে বাদশাহ! আমরা যাহিলী যুগের এক জাতি ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম। মৃত জন্তুর গোশত আহার করতাম, অশ্লীলতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতাম না, প্রতিবেশীর প্রতি খারাপ ব্যবহারে লিপ্ত ছিলাম। সবলরা দুর্বলকে অত্যাচার করতো। এই অবস্থায় আমরা দিনাতিপাত করেছি। এরপর আল্লাহ পাক আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, আমানতদারিতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে জানি। তিনিই আমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন, তাঁরই ইবাদত করা ও তাঁকে শরীক না করতে বললেন। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব মূর্তির ইবাদত করে তা বর্জন করো- এগুলো মিথ্যা। এতে কোনো লাভ নেই বরং বিরাট ক্ষতি। তিনি আমাদেরকে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আমানতের মালের হিফাজত করা, অশ্লীলতা বর্জন, প্রতিবেশীর

হক্ব আদায় করা ইত্যাদি। আমরা তাঁকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছি। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। আমাদের কওম এতে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। নির্যাতন নিপীড়নে আমাদের জীবন বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদেরকে আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করিয়ে পূর্বের ন্যায় মূর্তি পূজায় নিয়ে যাওয়া। এই অসহ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে রেহাই ও আমাদের দ্বীন পালনে স্বাধীনতা পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা আপনার দেশে হিজরত করেছি। সুতরাং আমরা আশা করি আপনার মতো স্বনামধন্য ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আমদেরকে অত্যাচারে ঠেলে দেবেন না।

হযরত জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক এই বক্তব্য সম্রাট নাজ্জাশীকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করলো। তিনি এবার নতুন ধর্মমত সম্পর্কে আরো জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তিনি যা এনেছেন তার কিছুটা কি তোমার নিকট আছে? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আছে। নাজ্জাশী তা শোনতে ইচ্ছাপোষণ করলেন। জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা মরিয়মের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করতে লাগলেন:

كهيعص . ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا . إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا . قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا . وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ * وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا . يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا . قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا . قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً * قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا....

-"কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স- ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হই নি। আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই

আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া ইতোপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করি নি। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত? তিনি বললেন: এমনিতেই হবে- তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন: এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।"

সম্রাট নাজ্জাশীর চোখ দু'টো থেকে কপোল গড়িয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো। তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। সভাসদবর্গসহ উপস্থিত সবাই কাঁদতে লাগলেন।

নাজ্জাশী বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এই আয়াতগুলো ও ঈসা আলাইহিসসালাম যা এনেছিলেন তা একই উৎস থেকে এসেছে। এরপর তিনি আমর ইবনে আসের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লোকগুলো কি তোমাদের দাস? ইবনে আস জবাব দিলেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এরা কি তোমাদের নিকট ঋণগ্রস্ত? ইবনে আস আবার জবাব দিলেন, জি না। নাজ্জাশী বললেন, তাহলে তোমরা চলে যাও। আমি কখনো এদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো না।

আমর ইবনে আস খুব কূটকৌশলী ছিলেন। তিনি বের হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আগামীকাল এমন এক বিষয় বাদশাহর দরবারে উত্থাপন করবো যে, এর দ্বারা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করে ছাড়বো। পরদিন দরবারে গিয়ে বললেন, রাজন! এরা ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে মারাত্মক আপত্তিকর কথা বলে। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। তিনি বললেন, তারা ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে কী এমন মারাত্মক ধারণা রাখে? তাদেরকে দরবারে হাজির করো!

জাফর ইবনে আবি তালিব এবং অন্যান্য সাহাবা জানতেন, ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকিছু বলেছেন তা-ই তাঁরা ব্যক্ত

করবেন। সবার অনুমতিক্রমে এবারও জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সকলের পক্ষে বাদশাহর দরবারে ভাষ্যকার নির্বাচিত হলেন।

নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তিনি স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন। তার ডানে আমর ইবনে আস এবং বায়ে উমারা। উভয় দিকে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক পাদ্রী।

এরপর নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিসসালাম সম্পর্কে কী বলো? জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন আমরা তা-ই বলি। তিনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি কুমারী মরিয়মের উদরে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়ে তাঁকে অস্তিত্বদান করেন।" এটা শ্রবণ করে নাজ্জাশী হাতদ্বয় মাটিতে মারলেন এবং সেখান থেকে একখণ্ড কাষ্ঠ উঠিয়ে বললেন, "তুমি যা বলেছো ঈসা ইবনে মরিয়ম এই কাষ্ঠখণ্ডের পরিমাণও বেশী কিছু নন।" একথা শোনে সভাসদবর্গের সবাই ফিস ফিস শব্দ করতে লাগলো। তিনি আবার বললেন, 'তোমরা যাই বলো না কেন, ঈশ্বর সম্পর্কে আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি।' তিনি এবার মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা আমার রাজ্যে নিরাপদ। যে তোমাদের অভিসম্পাত দেবে তাকে জরিমানা করা হবে। এক পাহাড় স্বর্ণ দিলেও আমি কাউকে তোমাদের উপর আঘাত করতে দেবো না। ওদের (কুরাইশদের) উপঢৌকন তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও; ওসব আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

কুরাইশ দূতদ্বয় বিফল মনোরথে দেশে ফিরে আসলেন। আবিসিনিয়ায় আগত মুসলমান মুহাজিররা নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলাম-গ্রহণ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম দিকে ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুআয় আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে বিরাট

মর্যাদার অধিকারী করে দিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সত্যিই চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর।

হযরত উমর একদা কুরাইশ নেতা আবু জাহিল ও অন্যান্যদের প্ররোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য সংকল্প করে বসলেন। তিনি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। উমর কী তখন জানতেন, এই ভ্রমণটি ছিলো তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়? তিনি যে শীঘ্রই সত্যের সন্ধান পেয়ে যাবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কারণ ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পবিত্র দরবারে দুআ করে নিয়েছিলেন যে, "হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহিল কিংবা উমরের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও!"। লক্ষণীয় যে, তিনি দুআর সময় উভয়ের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে বলেন নি- যে কোনো একজনের জন্য আল্লাহর দরবারে আবদার করেন। আল্লাহ পাক উমরকেই পছন্দ করলেন।

পথিমধ্যে নু'আম ইবনে আব্দুল্লাহ নামক এক নওমুসলিমের সঙ্গে উমরের সাক্ষাৎ ঘটলো। নু'আম বুঝতে পারলেন, উমর নিশ্চয়ই কোনো কঠিন সংকল্প করেছেন তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই উমর! এভাবে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?' 'মুহাম্মদের শিরচ্ছেদ করবো!' কঠিন ভাষায় জবাব দিলেন উমর। নু'আম একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আগে তোমার নিজের ঘর সামলাও- তুমি কি জানো না, তোমার বোন ও তার স্বামী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছেন?'

উমর গর্জে উঠলেন, 'কী বললে? আমি এক্ষুণি তাদের শায়েস্তা করে নেবো!' এই বলে তিনি ছুটে গেলেন বোনের বাড়িতে। তিনি শুনতে পেলেন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি। বুঝতে পারলেন, সত্যিই এরা মুসলমান হয়ে গেছেন। ঘরের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উমরের বোন ও তার স্বামীকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ভাইয়ের আগমনে ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা কুরআনের পাতাটি লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে আত্মগোপন করলেন। ভগ্নিপতি দরজা খোলার পর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী পাঠ করছিলে? আমাকে দেখাও!'। এই বলে তিনি স্বীয় ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীকে রক্ষার্থে ফাতিমা এগিয়ে আসলে তাকেও তিনি প্রহার করলেন। এতে ফাতিমার শরীর ফেটে

রক্ত বেরিয়ে আসলো। উমর বোনের রক্ত দেখে থেমে গেলেন। তিনি কিছুটা লজ্জাবোধ করে বললেন: 'তোমরা কী পাঠ করছিলে? আমাকে একটু দেখাও। আমার আমার শুধু জানা দরকার তোমাদের এই নতুন দ্বীনটি কি জিনিস।' হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কণ্ঠে নম্রতার ভাব লক্ষ্য করে বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি উভয়ে আশান্বিত হলেন। তবে যেমন ভাই তেমন বোন- ফাতিমা উত্তেজিত হয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'আপনি অপবিত্র! যান, গোসল করে আসুন।'

সুতরাং উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু গোসল করে আসলেন। ইতোমধ্যে বেশ উত্তেজিত ও আশান্বিত হয়ে আত্মগোপনে থাকা হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু বেরিয়ে আসলেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঐ কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বা-হা এর প্রথম কটি আয়াত শরীফ পাঠ করলেন:

طٰهٰ * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى * إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰى * تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا * الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى * وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّه' يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى * اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى *

"ত্বোয়া-হা। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।" (ত্বা-হা : ১-৮)

পাঠ শেষে তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আহ! কী অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী এই আয়াতমালা!' হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না- ঈমানী নূরের ঝলক তাঁর অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে দেহ-তনু-মনে জেগে তুললো রোমাঞ্চকর শিহরণ। বললেন, "আমাকে এক্ষুণি বলো, কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়?"।

ভাই উমরের হৃদয় ঈমানী নূরের ছোঁয়ায় দীপ্ত হয়েছে বুঝতে পেরে ফাতিমার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। শিক্ষক খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু আনন্দের আতিশয্যে হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে জানালেন, 'হে উমর! গতকালই আমি শ্রবণ করেছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আবু জাহিল কিংবা উমরের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও। সেই পবিত্র মুখের দু'আর ফলেই আপনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন।'

এরপর তিনি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে বায়তুল আকরামে উপস্থিত হলেন। দরোজায় কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে উমরকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসংকোচে উমরকে ভেতরে আসতে দাও। হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত বিপদের আশঙ্কায় উমরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন আসল খবর। তিনি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাপড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "হে উমর! তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছো?" হযরত উমর তৎক্ষণাৎ কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন। আকস্মিক ও অভাবনীয় এই ঘটনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর দিয়ে উঠলেন, "আল্লা-হু আকবার!"। সাহাবায়ে কিরামও এতো সজোরে 'আল্লা-হু আকবার' ধ্বনি তুললেন, এতে আশপাশ এলাকা প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। এরপর উমর তখনই আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কুফর নিজেকে সাড়ম্বরে প্রকাশ করছে আর আমরা হক্ব দীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কেনো তা গোপন করবো? উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এই দৃঢ় সাহসী উক্তিতে উপস্থিত ত্রিশ-চল্লিশ জন সাহাবী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলে পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে যেয়ে প্রকাশ্যে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করলেন। সেখানে অনেক কাফির ছিলো, কিন্তু নীরবে এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন ছাড়া তাদের কারোর সাহসে দেয় নি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে চ্যালেঞ্জ করার।

কুরাইশদের কর্তৃক সামাজিক বয়কট

মহাবীর হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের মতো প্রভাবশীল ব্যক্তিদের ইসলাম-গ্রহণ হেতু

মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরাট ফায়দা হলেও কুরাইশদের দুশমনী একটুও কমে নি। বরং তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে লাগলো। সেমতে নুবুওয়াতের ৭ম বছরের ১লা মুহাররম থেকে কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর যাবতীয় পরিবারবর্গকে সামাজিক বয়কটের শিকার করে।

মক্কার অদূরে শা'ব আবি তালিব নামক উপত্যকায় তাদেরকে বন্দী করে রাখলো। উপত্যকা থেকে তাঁদের কাউকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। মক্কার কেউ বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ পেলো না- উপত্যকার বাইরে এসে খাবার দাবারসহ জীবন রক্ষার জন্য জরুরী কোনো বস্তু পর্যন্ত সংগ্রহের অধিকার তাদের ছিলো না।

সামাজিক এই অমানুষিক বয়কটে আক্রান্ত হয়ে সবাই জর্জরিত হয়ে পড়লেন। খাবারের চরম অভাব হেতু শিশু-মহিলা এবং বৃদ্ধরা উপবাসে থেকে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর পরিবারবর্গের উপর এতো বড় বিপদ আপতিত হয় নি। নরাধম কাফিররা সবাই মিলে এমন জঘন্য মহাসঙ্কটে পতিত করে নবী-পরিবারকে। তারা একটি কাগজে বয়কটের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করে কাবা শরীফের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে। এই দলীলে মক্কার বড় বড় কাফির নেতাদের সই ছিলো। দলিল লেখক ছিলো নরাধম মানসি ইবনে ইকরিমা আবারদী। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়াতে শস্তি দিয়েছেন। যে হাতদ্বয় দ্বারা সে লিখেছিল তা তিনি চেতনহীন করে দিয়েছিলেন।

সুদীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ এই বয়কট স্থায়ী ছিলো। আহ! এই সময়ে নবী-পরিবারের উপর কী না কষ্ট! কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সবাই তা সহ্য করে গিয়েছেন। এই চরম বিপদের দিনেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিরাশ হন নি। অবশেষে এক দু'জন মুশরিকের মনেও দয়ার উদ্রেক ঘটলো। মুসলমানদের উপর এরূপ চরম নির্যাতন উচিত হয় নি ভেবে তারা ব্যাপারটি নিয়ে কথাবার্তা শুরু করলো। এদিকে কাবা শরীফের দেওয়ালে লটকানো ঐ কাগজের টুকরো বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে একজাতীয় উই পোকা তা খেয়ে ফেলে। একমাত্র

আল্লাহর নামটি অক্ষত ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন।

এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে জানালেন। তিনি মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাবা গৃহের সামনে গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে কথা বললেন। চুক্তিপত্র বা বয়কটের দলীলটি যে উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে তা তাদের জানিয়ে দিয়ে বয়কট অবসানের দাবী জানালেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর চুক্তিপত্র সত্যিই উই পোকা খেয়ে ফেলেছে দেখে কুরাইশরা লজ্জায় মাথা নত করলো। এদিকে আবদে মনাফ ও কুসাই গোত্রের লোকগণ ঘোষণা দিলো, আমরা এই বয়কট মানি না! শীঘ্রই বয়কটের অবসান ঘটলো। যুহায়র ও তার সাথীগণ নাঙ্গা তরবারি হস্তে ছুটে গেলেন শি'ব আবি তালিবের দিকে। অভ্যন্তরীণ সকল মুসলমানকে তারা মুক্ত করে দিলেন। এভাবেই দীর্ঘ ৩ কিংবা মতান্তরে ২ বছর কঠিন বিপদে আপতিত থেকে নুবুওয়াতের দশম সালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপরিবারে মুক্ত হলেন।

গিরিসঙ্কট থেকে বের হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর চাচা আবু তালিবসহ হিশাম ও মুত্তালিব গোত্রের সকল নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা আল্লাহর ঘরের সামনে গিয়ে গিলাফে ধরে এই চরম দুর্ভোগের জন্য দায়ী কুরাইশ মুশরিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদদু'আ করলেন:
'হে আল্লাহ! যারা আমাদের উপর এই জঘন্য যুলুম করেছে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, আমাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে, আমাদের পক্ষে তুমি এর বদলা নিও'।

দুঃখের বছর (عام الحزن)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনে বিরাট দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-আপদ পতিত হয়েছে। কাফিরদের জ্বালা-যন্ত্রণা তো ছিলোই সেসাথে ইয়াতীম অবস্থায় পৃথিবীতে আসা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ছিলো দুঃখ-ভারাক্রান্ত। তবে যে দু'জন মানুষ তাঁকে কঠিন বিপদ-আপদের সময় কাছে থেকে সর্বাধিক বেশী সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন তাঁরা হলেন হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা এবং চাচা আবু তালিব। তাঁদের জীবদ্দশায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা নিরাপত্তা অনুভব করতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এই দু'জনকেও তাঁর থেকে চিরতরে দূরে সরিয়ে দিলেন।

তখন নুবুওয়াতের ১০ম বছর। হযরত ও পরিবারবর্গ সবেমাত্র সামাজিক বয়কট থেকে মুক্ত হয়েছেন। দীর্ঘ দিন শি'ব আবি তালিবে দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটানোর পর ক'টা দিন যেতে না যেতেই সান্ত্বনাদাত্রী প্রিয় স্ত্রী হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করলেন। এর অল্পদিনের মাথায় চাচা আবু তালিবও এই ধরা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ দু'টি মৃত্যুর ফলে হযরতের যেনো ডানা ভেঙ্গে পড়লো। কুরাইশ কাফির-মুশরিকরা সুযোগ বুঝে তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করলো। একান্ত আপনজনদের হারানো এবং সেসাথে কুরাইশদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে তিনি নিরাপত্তাহীন ও অসহায় বোধ করলেন। এ কারণেই এই বছরটিকে "আমুল হুযন' বা দুঃখের বছর নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা মক্কা শরীফের বিখ্যাত কবরস্থান 'জান্নাতুল মা'ল্লা' -তে সমাহিত আছেন।

তায়েফ গমন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দিক থেকে ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে আপতিত হয়েও তাঁর পবিত্র মিশন চালিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আল্লাহর উপর অগাধ ভরসা রেখে তিনি তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। তবে মক্কা শহরে এই কাজের মাধ্যমে তেমন বেশী সফলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। আপাতত তিনি মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দূরবর্তী জনবহুল তায়েফ শহরে যেতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সফরসঙ্গী হিসাবে প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্বাচিত করে নুবুওয়াতের ১০ম বছর শাওয়াল মাসে তিনি তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছকীফ নামক একটি প্রভাবশালী গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তবে এদের কাছ থেকে কোনো আশানুরূপ জবাব মিললো না- বরং তারা তাঁকে কটাক্ষপূর্ণ কিছু বাক্য শুনিয়ে দিল। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুরোধ করলেন, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করলে না, তবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমার বিষয়টি গোপন রেখো। কিন্তু এতে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠলো। হৈ-হল্লা ও চিৎকার দিয়ে

সেখানে অনেক লোক জড়ো করে দিল। সবাই তাঁকে ঘিরে ফেললো এবং বিভিন্ন ধরনের খারাপ উক্তির মাধ্যমে তাঁকে উত্যক্ত করে তোলার চেষ্টা করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতান্তরে এক মাস তায়েফে থেকে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। ছকীফ গোত্রের নিকট থেকে ফিরে তিনি তায়েফের বিভিন্ন প্রভাবশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা কেউই দাওয়াত গ্রহণ করলো তো না-ই, উপরন্তু তারা তাঁকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলো। তাদের বেওকুফ দাসদাসীদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। এরা অত্যন্ত বে-আদবীপূর্ণ আচরণ করতে লাগলো দু'জাহানের বাদশাহ, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে। এমনকি তারা তাঁকে রাস্তায় ঠেলে দিয়ে পবিত্র দেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। প্রচণ্ড আঘাতে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীর মুবারক থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নবীজীকে রক্ষা করতে। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে অনেক পাথরের আঘাত নিজে সহ্য করে দ্রুত চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র পদদ্বয়ে রক্ত জমা হয়ে পড়লো। এদিকে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে রক্ষা করতে যেয়ে পাথরের আঘাতে তাঁরও মাথা ফেটে গেল। এরপর কোনমতে একটি বাগানের দেওয়ালের পাশে গিয়ে উভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আপাতত নরাধম হামলাকারীদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেলেন।

সেখানে একটি আঙ্গুর গাছ ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির নীচে বসে পড়লেন। অত্যন্ত ক্লান্ত, রক্তে রঞ্জিত, ব্যথিত, ক্ষুধার্ত এবং নিরাশপূর্ণ অবস্থায় পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রুভরা চোখে মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে হাত উত্তোলন করে দু'আ করতে লাগলেন।

না জানি কোন্ বদদু'আ করে তায়েফবাসীকে আজ ধ্বংস করে দেওয়া হবে! কিন্তু না, দয়াল নবীজী এক হৃদয় নিংড়ানো দু'আ করলেন নিজেরই অক্ষমতা স্বীকার করে! তিনি আল্লাহর পবিত্র দরবারে আকুতি-মিনতি করে বললেন:
"হে আল্লাহ! আপনার দরবারে আমি আমার দুর্বলতার ফরিয়াদ জানাই, আমার মধ্যে হিকমাতের অভাব আছে। আমি দুর্বল। ওগো সর্বাধিক দয়াময় আল্লাহ

তা'আলা! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক এবং আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করেছেন? দূরবর্তী কারো নিকট, যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে অথবা শত্রুর নিকট যাকে আমার মালিক বানিয়ে দেবেন? যদি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ না থাকে তবে আমার আর কোনও পরোয়া নেই। অবশ্যই আপনার ক্ষমা আমার জন্য প্রশস্ত। আমি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকে অথবা আমার প্রতি আপনার কঠোরতা প্রদর্শন করা হতে। আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় চাচ্ছি যার দ্বারা যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়। আমি আপনারই সন্তুষ্টি চাই। নেক কাজ করার কিংবা অন্যায় ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি একমাত্র আপনার কাছ থেকেই আমি পেয়ে থাকি"।

যাদুল মাআদে বর্ণিত আছে, উক্ত দু'আ শেষে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের ফিরিশতাদের পাঠিয়ে দিলেন তাঁর হাবীবের নিকট। তারা অবতরণ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে দু'টি পাহাড়ের মাঝে তায়েফ নগর অবস্থিত, আপনি দু'আ করুন এ দু'টো একত্রে মিলিয়ে দিয়ে তায়েফবাসী সবাইকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য। আমরা এ কাজের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মায়ার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা এ কী বলছো? আমাকে আল্লাহ পাক মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন- ধ্বংসের জন্য নয়। তারা যা করেছে তা আমার দুর্বলতা হেতু করেছে- আমি তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝাতে পারি নি। আমি তো আশাবাদী তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর হাবীবের কী মুহাব্বাত মানুষের জন্য! এতো জঘন্যভাবে অপমানিত ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেন যে সম্প্রদায়ের কাছে তাদের প্রতি এই অকল্পনীয় ব্যবহার! প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের চিত্র কতো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে তায়েফের এই ঘটনা থেকে। শিক্ষা হিসাবে ইসলামের দায়ীদের জন্য এই ঘটনাটি চিরদিন যাবৎ আদর্শ হয়ে থাকবে।

তায়েফের ঘটনাবলী থেকে আরো একটি চিরন্তন সত্য দিবালোকের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে- আর তাহলো, ধন-সম্পদের মোহে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। সে

সত্যকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে বসে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে এই ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

"যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, সেখানকার ধনাঢ্য অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা-সহ প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলতো, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না" [সূরা সাবা : ৩৪-৩৫]।

আল-মি'রাজ (المعراج)

সকল নবী-রাসূলের জীবনেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কিছু অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এসব 'মু'জিযাহ' (مُعْجِزَة) সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং নবী-রাসূলদের মু'জিযা সত্য এবং তার উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুবুওয়াতী জিন্দেগীতেও অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল। কোনো কোনো সীরাত লেখক ১ হাজারেরও বেশী মু'জিযা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাবতীয় মু'জিযার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো মু'জিযা হলো পবিত্র কুরআন শরীফ। মহান এই ঐশীগ্রন্থ একটি জ্যান্ত মু'জিযা। আর এর পরবর্তী স্থানে আছে হুজুরের নভোভ্রমণ বা মি'রাজ। এমন অত্যাশ্চর্য মু'জিযা অপর কোনো নবীর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় নি। মি'রাজের দু'টি দিক আছে। যেহেতু মি'রাজের ঘটনা ছিলো বাস্তব তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে মি'রাজে গমণ করেন, তাই মু'মিনদের জন্য এ থেকে আখিরাতের জিন্দেগীতে যে আমরা সশরীরে ঊর্ধ্বজগতে যাবো তার নমুনা ভেসে এসেছে। অপরদিকে দুনিয়ার জীবনে 'আধ্যাত্মিক ভ্রমণের' সূত্রও এই মি'রাজ। এজন্য বলা হয়েছে 'আসছোলাতু মি'রাজুল মু'মিনীন' - নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজ।

পবিত্র মি'রাজের ঘটনাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সশরীরে মক্কা শরীফের মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ- যাকে আরবীতে 'ইসরা' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যার অর্থ রাতের ভ্রমণ। মাসজিদুল আকসা থেকে সপ্ত আসমান পেরিয়ে বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি ভ্রমণ শেষে আরশে আজীম পর্যন্ত ভ্রমণকে বলে 'মি'রাজ' বা ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ। তবে উভয় ভ্রমণকেই পারিভাষিক অর্থে একত্রে মি'রাজ বলে। ঠিক কোন্ সময় মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশের মতে নুবুওয়াতের দশম বছর রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে ইশা থেকে ফযরের মধ্যে তা সংঘটিত হয়।

পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে ঠিক কোথায় ঘুমন্ত ছিলেন সে ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি তাঁর ফুফু হযরত উম্মে হানী রাদ্বিআল্লাহু আনহার ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম এর ডাকে সেখান থেকে উঠে বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন হিজরে ইসমাঈল (বা হাতীমে) চলে যান। সেখানে পৌঁছার পর তিনি আবার নিদ্রামগ্ন হন। তখন তাঁকে ফিরিশতা আবার জাগিয়ে তুলে বুরাকে চড়িয়ে যাত্রা শুরু করেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সেখানে সকল আম্বিয়া আলাইহিস্সালাম এর রূহের সাথে নিজে ইমামতি করে দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের প্রাক্কালে তাঁর সম্মুখে দুগ্ধ ও শুরার দু'টি পেয়ালা পেশ করা হলো। তিনি দুগ্ধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম মন্তব্য করলেন, আপনি যদি শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেতো। এরপর শুরু হলো মি'রাজের পর্ব।

নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম একে একে প্রথম থেকে সপ্তম আসমানের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে গেলেন। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারেই দ্বাররক্ষী ফিরিশতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ হলো: ফিরিশতারা প্রশ্ন করলেন, 'হে জিব্রাঈল! আপনার সাথী কে? তাঁকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে?' ইত্যাদি। জিব্রাঈল প্রত্যেকবারই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় দিলেন এবং স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপনীত হতে তাঁকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে- তা অবগত করলেন। দ্বাররক্ষীরা তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দিল। তিনি প্রত্যেক আসমানেই একেকজন পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ নবীর সাক্ষাৎ পেলেন।

প্রথম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত আদম আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। আদম আলাইহিস্সালাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সুসন্তান', 'সৎকর্মশীল', 'সত্য নবী' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করে অসংখ্য ফিরিশতা ছাড়াও দেখা হলো হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্সালাম এর সাথে। তাঁরা উভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সম্ভাষণ জানালেন। তৃতীয় আসমানে সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। তাঁর সাথে অনেক কথাবার্তার পর চতুর্থ আসমানে আরোহণ করে দেখতে পেলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস্সালামকে। এরপর পঞ্চম আসমানে সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত হারুন আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলিত হলেন যথাক্রমে হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম এর সাথে। তাঁদের সবার সাথেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথোপকথন হয়েছে। সবাই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা ও মুবারকবাদ জানিয়েছেন।

সিদরাতুল মুনতাহায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম আরো ঊর্ধ্বলোকে গমন করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' তথা বদরিকা বৃক্ষের নিকটে যেয়ে পৌঁছুলেন। এখানে তিনি পবিত্র কাবাঘরের অনুরূপ একটি ইবাদাতগৃহ দেখতে পেলেন। এই গৃহের নাম 'বাইতুল মা'মুর'। এই পবিত্র ঘরকে সত্তুর হাজার ফিরিশতা দৈনিক তাওয়াফ করেন। একজন ফিরিশতাকে একবার তাওয়াফ শেষে আরেকবার করার জন্য সত্তুর হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ঊর্ধ্বে 'রফরফের' মাধ্যমে আরোহণ করলেন। এই শেষ সফরে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম যেতে অপারগতা জানালেন। কারণ হিসাবে বললেন, আর যদি এক কদম আমি অগ্রসর হই তাহলে আমার সকল পাখা আল্লাহর তাজাল্লিতে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে!

আল্লাহর পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে যেয়ে পৌঁছুলেন। আরোহণের সময় মনে পড়লো হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম এর কথা। তুর পাহাড়ে আরোহণ শেষে একটি বৃক্ষের নিকট আল্লাহর তাজাল্লির সম্মুখে পৌঁছার পর আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'হে মূসা! তুমি পবিত্র স্থানে আগমন করেছো, তোমার জুতা খুলে ফেলো!'। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে আরোহণের পূর্বে নিজের পা মুবারকে যে খড়ম ছিলো তা খুলে ফেলার জন্য উদ্যত হলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশীবাণী উচ্চারিত হলো, 'হে আমার হাবিব! আপনি জুতা খোলার চেষ্টা করবেন না। আপনার পাদুকার স্পর্শ পেলে আমার আরশ ধন্য হবে!' সুবহানাল্লাহ! আমাদের নবীজীর মর্যাদা স্বয়ং মহাপ্রভুর দরবারে কতো ঊর্ধ্বে!

অতঃপর একান্ত সঙ্গোপনে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা তাঁর হাবীবের সাথে কথোপকথন করলেন যার সঠিক বর্ণনা আমি অধমের কলম থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। তবে মি'রাজ হতে প্রত্যাবর্তনকালে কয়েকটি বিশেষ উপহার আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন। এগুলো হলো: ১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ২. শিরকের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারলে অন্যান্য যে কোনো গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হওয়ার নিশ্চয়তা এবং ৩. সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত।

আল-মি'রাজ এমন এক বিস্ময়কর ও বিরাট ঘটনা যে, এর পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ঘটনা সংঘটিত হওয়াকালে পৃথিবীতে 'সময়' অতিবাহিত হয় নি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে সময়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। সাত আসমান, আট বেহেশত, সাত দোযখ, সিদরাতুল মুনতাহা, আরশে আজীম ইত্যাদি বিরাট বিরাট জগৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভ্রমণ করিয়ে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবকিছু অবলোকন করিয়ে অনেক জ্ঞান দান করেন এই মি'রাজের রাতে। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা তাঁর অন্তরাত্মা ভরপুর করে দেন। এরূপ একটি বিরাট কাজ আঞ্জাম দিতে সময়কে স্তব্ধ রাখা একান্ত জরুরী ছিলো। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যদি কেউ আলোকের গতিতে চলতে পারে তাহলে তার উপর দিয়ে 'সময়ের' গতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। আর মি'রাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাহন বুরাকের গতি ছিলো আলোকের গতি থেকে দ্রুত- তার একেক পদক্ষেপ ছিলো দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত।

মি'রাজের ঘটনা ছিলো বাস্তব এবং সশরীরে এই ভ্রমণ হয়েছিল। এ ব্যাপারে ঈমানদারদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু সে যুগের কাফির, মুশরিকদের মতো আজকের যুগের কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা এই মি'রাজের ঘটনাকে মানতে নারাজ। এমনকি কোনো কোনো দুর্বল 'ঈমানদার' ব্যক্তিরাও একে 'আধ্যাত্মিক', 'স্বাপ্নিক' ইত্যাদি উপায়ে হওয়ার ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। আমরা জোর গলায় বলবো, যে মহান আল্লাহ তা'আলা 'কুন' শব্দের মাধ্যমে সারা মহাবিশ্বসহ, বেহেশত, দোযখ, আরশ, কুরসী ইত্যাদি বিরাট বিরাট জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন সেই অসীম ক্ষমতাধর প্রভুর পক্ষে তাঁর হাবিবকে সময় নামক উপাদানকে সাময়িকভাবে গতিহীন রেখে, পুরো মহাবিশ্ব ঘুরিয়ে দেখানো মোটেই কঠিন কিছু নয়। তাঁর জন্য সবকিছুই অতি সহজ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। মি'রাজের ঘটনা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আমরা শ্রবণ করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

মি'রাজের রাতে অসংখ্য অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে অনেক অপূর্ব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআন শরীফে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল" [বনী ইসরাঈল : ১] এবং

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ * لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

"তাঁর চোখ না অন্যদিকে ঝুঁকেছে আর না সীমা অতিক্রম করেছে। নিশ্চয় তিনি তাঁর পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন।" [সূরা নাজম : ১৭-১৮]।

মদীনায় হিজরতের পূর্বাভাস

মি'রাজের ঘটনার পরে এবং এর পূর্বে তায়েফের ব্যর্থ ও দুঃখজনক সফর শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিরাশ না হয়ে তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। মক্কা শহর ও আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের নিকট যেয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়ের আহ্বান জানালেন। তিনি কালব, ফিজারা, আমির ইবনে সা'সা, হানীফা, শায়বান, হারিস, কা'ব, কিনদা প্রভৃতি গোত্রের নিকট দাওয়াত পৌঁছালেন। মক্কা শরীফের বাৎসরিক প্রসিদ্ধ তিন মেলা তথা 'যুল মাজায', 'মাজান্না' এবং 'উকাজ' মেলায় গিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কুরাইশ নেতাদের কৌশল ও অপপ্রচারের ফলে কেউই ইসলাম গ্রহণ করলো না- বরং অনেকে তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলো। তাদের সবাই এই দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো।

আকাবার প্রথম বাইআত: কিন্তু এই চরম নিরাশার মধ্যেও একদা ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে ওঠলো আল্লাহর অপরিসীম কৃপায়। বর্তমান জামারাতের নিকটে আকাবা নামক উপত্যকায় ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র জামাআতের সঙ্গে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ ঘটলো। এরা প্রাচীন প্রথানুযায়ী হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ (তখনকার নাম ইয়াসরিব) থেকে এসেছিলেন। মদীনার প্রখ্যাত 'খাজরাজ' গোত্রের এসব হজ্জযাত্রীদের নাম ছিলো: ১. আসআদ ইবনে যিয়ারা, ২. 'আওফ ইবনে হারিস, ৩ রাফি' ইবনে মালিক, ৪. কুতবা ইবনে 'আমীর, ৫. 'উকবা ইবনে 'আমির এবং ৬. জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন)। নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাঁরা সবাই সাথে সাথে ইসলাম কবুল করে নিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তারা সহজেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়।

এরপর সবাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অঙ্গীকার করেন যে, দেশে প্রত্যাবর্তন শেষে তাঁরা সকলে ইসলামের দায়ী হিসাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এই ঘটনাই হলো 'আকাবার প্রথম বাইআত'।

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত: অনেক সীরাত লেখক উপরোক্ত আকাবার বাইআতকে ঠিক 'বাইআত' বলেন নি। সুতরাং কারো কারো মতে আকাবার বাইআত মোট দু'টি। তবে আসলে এতে কোন মতানৈক্য নেই বরং বর্ণনার মধ্যে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন মাত্র। যা হোক আমরা মোট তিনটি বাইআত হয়েছিল বলে এখানে উল্লেখ করলাম।

প্রথম বাইআতের ছ'জন পুরুষ তাঁদের অঙ্গীকার পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে তাঁরা দীর্ঘ এক বছর যাবৎ দ্বীনের সফল দায়ী হিসাবে কাজ করেন। তাঁদের চেষ্টার ফলে মদীনা শরীফের প্রখ্যাত গোত্রদ্বয় 'আওস ও খাজরাজ বংশের সবার ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের আলোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। নুবুওয়াতের একাদশ বছরে অর্থাৎ আকাবার প্রথম বাইআতের পরবর্তী বছরেই হজ্জের মাওসুমে উপস্থিত হলেন পূর্বোক্ত ছয় ব্যক্তি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো সাতজন। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ এসে আকাবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষক হিসাবে মদীনা মুনুওয়ারায় প্রেরণ করা হোক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজে নির্বাচিত করলেন হযরত মুসআব ইবনে উমায়ার রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে।

হযরত উমায়ার রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। আওস ও খাজরাজ গোত্রের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেন। সুতরাং মদীনা মুনুওয়ারায় ইসলামের দীপ্তিময় আলো দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো।

আকাবার তৃতীয় বাইআত: এই বাইআতকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বাইআত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যা হোক এটাই মদীনা শরীফে হিজরতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। কারণ এই বাইআতের সময় মদীনা শরীফ থেকে আগত ৭৩ জন মুসলমান হজ্জযাত্রী আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইআত গ্রহণের পরই তাঁকে হিজরত করার জন্য দাওয়াত করেছিলেন। তাঁরা বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিসহ সকল মুসলমান মক্কা শরীফ থেকে হিজরত-পূর্বক আমাদের ইয়াসরিবে গমন করলে

আমরা আপন পরিবার-পরিজনসহ আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধান করতাম।" সবাই অঙ্গীকারও করলেন যে, "এজন্য যদি আমাদেরকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়, তবুও আমরা পিছপা হবো না- আমরা প্রস্তুত আছি এবং সকল ব্যাপারে আমরা আপনাকেই অনুসরণ করবো।"

বলা বাহুল্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোমধ্যেই হিজরতের আভাস পেয়ে গিয়েছিলেন তাই তিনি বিনাবাক্যে তাঁদের দাওয়াত কবুল করে নিয়ে বললেন, "আজ হতে তোমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা আমারও প্রতিশোধ স্পৃহা বলে গণ্য হবে এবং তোমাদের ক্ষমা প্রদর্শন আমারও ক্ষমা প্রদর্শন বলে বিবেচিত হবে। আমি তোমাদেরই একজন আর তোমরাও আমারই।"

মদীনায় হিজরত

মক্কা শরীফের তখনকার কুখ্যাত কাফির-মুশরিকরা শেষ পর্যন্ত পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়ার এক ঘৃণিত পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। মক্কাস্থ তখনকার চারটি প্রধান গোত্রের সবাই এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় জড়িত হলো। তারা জানতো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার পর বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে- এমনকি হাসিম গোত্রের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঁধতে পারে। তাই তারা সকল গোত্রের পক্ষ থেকে চারজন নওজোয়ানকে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য নির্বাচিত করলো। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আর যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে ওহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের খবর জানিয়ে দিলেন এবং মদীনা মুনুওয়ারায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করলেন।

কুরাইশরা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘর ঘেরাও করে নিল। কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম কুদরতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের সামন দিয়ে চলে গেলেন অথচ কেউ তাঁকে দেখলোই না! একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে ছিটাতে ছিটাতে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা ইয়া-সীনের "ফা-আগশাইনাহুম ফাহুম লা-ইয়াবসিরূন" পর্যন্ত পাঠরত অবস্থায় তিনি নিশ্চিন্তে বেরিয়ে আসলেন- কেউ টেরও

পেলো না। নিজের বিছানায় রেখে আসলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে।[৬]

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে এভাবে রেখে আসার মূল কারণ ছিলো, নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমাকৃত মানুষের মালামাল সমজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য। জানা থাকা দরকার, শুধু মুসলমানদের মালামাল তাঁর নিকট জমা ছিলো না- কট্টর বিরোধীরাও তাঁকে এতোই বিশ্বাস করতো যে, তাঁর চরম বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের মালামাল নির্বিঘ্নে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমানত হিসাবে রেখে দিত। যা হোক, অল্প বয়স্ক আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য বিছানায় এভাবে শুয়ে থাকা সত্যিই বিরাট সাহসের পরিচায়ক ছিলো। কারণ, ঘরের ভেতর ঢুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেয়ে কাফিররা হযরত আলীকে রাগের আতিশয্যে সহজেই হত্যা করতে পারতো। তবে শেষ পর্যন্ত তা করা থেকে বিরত থাকে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ায় কিন্তু পুরো মক্কা শহরব্যাপী এক হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেলে। যে কোনো মূল্যে তারা তাঁকে হত্যা করতে যারপরনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বাড়িতে যেয়ে পৌঁছলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে তিনি ঐ রাতেই মক্কা শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে সুর পর্বতের উপর আরোহণ করলেন। পর্বতশৃঙ্গের একটি গুহায় উভয়ে প্রবেশ করে আত্মগোপন করলেন। দীর্ঘ তিনদিন এখানে অবস্থান করতে হয়েছিল। অপরদিকে শত্রুপক্ষ তাঁকে খুঁজে না পেয়ে খুব পেরেশান হয়ে উঠলো। আবু জাহিল ঘোষণা দিল, "যে কেউ মুহাম্মদের মস্তক আমার নিকট এনে দেবে আমি তাকে একশত উট পুরস্কার দেবো"। এ ঘোষণার ফলে চতুর্দিকে লোকজন দলে দলে বেরিয়ে আসলো। সবারই ইচ্ছা একশত উঠ পুরস্কার হিসাবে লুফে নেওয়া।

পুরো মক্কা শহরে খোঁজাখুঁজির পরও কাফিররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধান পেলো না। শেষ পর্যন্ত একদল লোক সুর পাহাড়ে আরোহণ

---

[৬] নবীয়ে রহমত - বঙ্গানুবাদ, পৃ. ১৮২, ইফাবা।

করে ঐ গুহার একেবারে নিকটে এসে হাজির হলো। একসময় গুহার ভেতর থেকে তাদের পা দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠলো। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন কী হবে? দুশমনদের সংখ্যা অনেক আর আমরা মাত্র দু'জন!" তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন: "তুমি ভুল বলছো আবু বকর! আমরা দু'জন নই- তিনজন। মনে রেখো, আমাদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ পাক আছেন! ভয়ের কোনো কারণ নেই। তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করবেন।" পবিত্র কুরআন শরীফে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা তাওবাহ : ৪০][৭]

আল্লাহর কী অপূর্ব কুদরত! কুরাইশরা দেখতে পেলো গুহার মুখে প্রকাণ্ড এক মাকড়সার জাল। এছাড়া একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধে সেখানে ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটানোর জন্য তা দিচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখে তারা ভাবতেই পারলো না যে, এই গুহার ভেতর কেউ থাকতে পারে! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবিবকে দুর্বলতম মাকড়সার একটি জাল ও একজোড়া কবুতর দ্বারা দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করে দিলেন। একমাত্র তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই।

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰه عَلِيمًا حَكِيمًا

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ফাতাহ]

---

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

রাতের অন্ধকারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর গোলাম আমির ইবনে ফাহিরা যাত্রা করলেন মদীনা মুনুওয়ারার পথে। পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেগভরা কণ্ঠে বললেন: "হে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! কতো সুন্দর শহর তুমি, আর আমার কতো প্রিয় ভালোবাসার তুমি! যদি আমার জাতি আমাকে এখান থেকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতাম না।"

সুরাকা ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘটনা

সচরাচর রাস্তা পরিত্যাগ করে অন্য এক রাস্তায় তাঁরা পাড়ি জমালেন। কুরাইশরা তাঁদের কোনো সন্ধানই পেলো না। তবে মুদলিজ গোত্রের সর্দার সুরাকা ইবনে মালিক [পরবর্তীতে ইসলামধর্মে দীক্ষিত] একশত উটের লোভ সামলাতে না পেরে হিজরতকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। অশ্বারোহী সুরাকা যখন মুবারক সেই কাফিলার নিকটবর্তী হলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছুটা বিচলিত হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীকে সান্ত্বনা দান করলেন এবং সাথে সাথে এই দু'আও করলেন: "আয় আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা তাকে (সুরাকাকে) দমন করুন"। সুবহানাল্লাহ! দু'আর সাথে সাথেই সুরাকার ঘোড়ার পাগুলো বালুকার মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেলো। তিনি আর আগে পা বাড়াতে পারলেন না। সুরাকা এই অবস্থা দেখে বুঝতে সক্ষম হলেন, যা তিনি ইচ্ছা করেছেন তা তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর হবে এবং হিজরতকারী এই কাফিলা সাধারণ নয়। তাই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে সাথে সাথে ক্ষমা করে দিলেন। এছাড়া তার ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

"হে সুরাকা! সে সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন পারস্য সম্রাটের কঙ্কন তুমি তোমার হাতে পরবে?"

পরবর্তীতে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সামনে যখন পারস্য সম্রাট কিসরার কঙ্কন, কোমরবন্দ, মেখলা ও শাহী মুকুট এনে হাজির করা হলো তখন তিনি এই সুরাকাকে ওগুলো পরার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কুবা পল্লীতে অবস্থান

যে ভ্রমণ পুরো মানবজাতির ইতিহাসকে সর্বকালের জন্য পরিবর্তন করে দিয়েছিল সেই হিজরতের ভ্রমণ শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠে কুবা নামক পল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। অবশ্য পাঁচ শতাধিক আনসারসহ মদীনার আবালবৃদ্ধবনিতা এই মুবারক কাফিলাকে এমন এক অপূর্ব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিল যে, ইতিহাসে তার তুলনা খুবই বিরল। বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে এই অভ্যর্থনার বর্ণনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মদীনার কিশোর-কিশোরীরা ধপ বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলো:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَتِ الْبِوَدَا عِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَادَعىٰ لِلّٰهِ دَا عٍ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا * جِئْتَ بِالآمْرِ الْمُطَاعِ

ছানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদের উদয় ঘটেছে।
যতোদিন আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একজনও থাকবে, ততোদিন
আমাদের উপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হবে।
আমাদের মধ্যে প্রেরিত ওহে সজ্জন! আপনি বাধ্যতামূলক আনুগত্যের
নির্দেশ নিয়ে এসেছেন।

এই ঐতিহাসিক দিনটি ছিলো ১২ রবিউল আওয়াল হিজরি ১ম সন, ৩১শে মে ৬২২ ঈসায়ী। কুবা পল্লীতে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদই ছিলো ইসলামের প্রথম মসজিদ। এছাড়া এখানেই সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঐতিহাসিক এই উভয় স্থানে দর্শনার্থীদের জন্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতান্তরে ১৪ দিন পর্যন্ত কুবায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি মদীনার মূল শহরের দিকে অগ্রসর হোন।

অসংখ্য আনসার পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বীয় উট আল-কাসওয়ায় আরোহণ করে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। আনসার গোত্রপতিরা বার বার তাঁকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনীর উপর দায়িত্ব

ছেড়ে দিলেন। বললেন, এটা আদিষ্ট হয়েছে। যেখানে গিয়ে এটা বসে পড়বে সেখানেই হবে তাঁর আবাসস্থল। আনসারদের কারো মনে দুঃখ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত বর্তমান মসজিদে নববী যেখানে অবস্থিত সেখানে এসে উটনী বসে পড়লো। সে যুগে এই জায়গাটি ছিলো একটি উন্মুক্ত ময়দান। তবে নিকটস্থ বাড়িটি ছিলো প্রখ্যাত আনসার সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর। তিনি তো খুশীতে পঞ্চমুখ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই বাড়িতে মেহমান হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন।

মদীনা শরীফ পৌঁছেই তিনি উটনী যেস্থানে বসেছিল সেই ময়দান দু'জন ইয়াতীম ছেলের নিকট থেকে ক্রয় করে নিলেন। এরপর সেখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিলেন। এরপর তিনি স্ব-পরিবারে নিজের বাড়িতে যেয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে মাত্র ১০ বছর বয়স্ক হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হযরতের নিকট হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্রটিকে আপনার খাদিম হিসাবে আমি দান করতে চাই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাসের মাতার এই আবদার গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজীর গৃহে খাদিম হিসাবে ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে দাম্পত্য জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর বেশ কিছু হাদীস শরীফ আমরা হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে পেয়েছি।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনা শরীফ পৌঁছার স্বল্পকাল পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এই ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণের কাজে স্বয়ং আল্লাহর হাবিবও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইট বহনকালে তিনি আবৃত্তি করতেন:

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْاَخِرَةْ

فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ

হে আল্লাহ! আখিরাতের পুরস্কারই তো প্রকৃত পুরস্কার;
অতএব, আনসার ও মুহাজিরদেরকে আপনি দয়া করুন।

আনসার ও মুহাজিররা উক্ত কবিতা পুনরাবৃত্তি করতে করতে তাঁকে অনুসরণ করতেন। সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব সুন্দর ও আনন্দময় ছিলো সে দৃশ্য!

প্রথম হিজরি

হুজুরে পাক নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের উপর অত্যল্প কিছু বর্ণনা তুলে ধরা ছাড়া আর বেশী গভীর গবেষণা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। ক্বাদিরী শায়খদের জীবনালোচনার পূর্বে সব তরিকার মূল সূত্র তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যময় জীবনের উপর আলোকপাত একান্ত জরুরী মনে করেই এই লেখার অবতারণা। যা হোক, এখন আমরা হযরতের মাদানী জিন্দেগীর দশটি বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী একে একে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

এই হিজরিতেই সর্বপ্রথম আযানের প্রথা শুরু হয়। নামাযে আসার জন্য 'ডাক' দেওয়ার ব্যাপারে সাহাবারা বিভিন্ন মতামত পেশ করেন। কেউ বললেন একটি পতাকা উত্তোলন করা যাবে; কেউ বললেন, শিঙ্গা বাজানো যায়; অন্যরা বললেন, ঘণ্টা বাজিয়ে নামাযে আসার ইঙ্গিত দেওয়া যাবে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসব মনঃপুত হলো না- এসব উপায় অন্যান্য ধর্মেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামের জন্য একক একটি ব্যবস্থা থাকা জরুরী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের যে কোনো ঐতিহ্য অনুসরণ মুসলমানদের জন্য আদৌ ঠিক নয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সঠিক সিদ্ধান্ত এসে গেলো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখলেন, একজন ফিরিশতা এসে তাঁকে আযানের বাক্যগুলো শিক্ষা দিচ্ছেন। পরে জানা গেলো হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুও অনুরূপ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এভাবে ডেকে মানুষকে নামাযের জন্য মসজিদে জড়ো করার প্রস্তাবটি ভালো লাগলো- তাই তিনি হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সর্বপ্রথম আযান দিতে নির্দেশ দিলেন।

এ বছরই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাথমিক দিনগুলোতেই আনসার

ও মুহাজিরীনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরের শা'বান মাসে হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্ত্রী হিসাবে বসবাস শুরু করেন- যদিও তাঁর বিবাহ বেশ পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় হিজরি

এ বছর রমজান মাসের রোজা, যাকাত, ঈদের নামায এবং সাদক্বায়ে ফিতরা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তখনও মুসলমানদের কিবলা ছিলো বাইতুল মাক্বদিস। এ বছর মসজিদে ক্বিবলাতাইনে নামাযরত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহ তথা কাবা শরীফের দিকে ঘুরিয়ে কিবলা পরিবর্তন করা হয়। সুতরাং মক্কা শরীফের বাইতুল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব-মুসলিমের কিবলা হিসাবে নির্দিষ্ট হলো। প্রথম ঈদুল আযহার নামাযও এ বছর সংঘটিত হয়।

জঙ্গে বদর

এ বছরের রমজান মাসের ১৭ তারিখ বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রখ্যাত যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩১৩ জন। অপরদিকে কাফিরদের সংখ্যা ছিলো ৯৫০ জন। কিন্তু স্বয়ং রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং এক মহান বিজয় প্রদান করেন। এই যুদ্ধে মক্কাস্থ বড় বড় কাফির মুশরিক নেতারা নিহত হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিলো মোট ১৪ জন। এদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন আনসার এবং বাকী ৬ জন মুহাজির। কাফিরদের নিহতের সংখ্যা ছিলো মোট ৭০ জন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বেশে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদেরকে সামরিক শক্তি হিসাবে দৃঢ়পদ করে তুলে। পরবর্তীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে '**বদরী**' খেতাব প্রদান করা হয়।

যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে সাহায্যের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। এই দু'আটুকু মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দু'আ করেন: "হে আল্লাহ! যদি তুমি এই ক্ষুদ্র জামাআতটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত করবার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ

করো। ও আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য চাই; তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।"

বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। সে সময় তোমরা ছিলে অসহায়। অতএব আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো" [সূরা আলে-ইমরান : ১২৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا * سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

"যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়।" [সূরা আনফাল : ১২]।

তৃতীয় হিজরি

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে প্রথম মৃত্যুবরণকারী সাহাবীর নাম ছিলো উসমান বিন মা'জুন রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ বছর তাঁর মৃত্যু হয়। মদীনা মুনুওয়ারার প্রখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। এ বছরের রমজান মাসে হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

জঙ্গে উহুদ

তৃতীয় হিজরির সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো জঙ্গে উহুদ। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে মদীনার উপকণ্ঠে ৭০০ মুসলিম বাহিনী ৩০০০ কাফির সৈন্যদের সঙ্গে চরম মরণপণ সমর-পরীক্ষার সম্মুখীন হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ

বাহিনীকে ছোট্ট এক টিলায় থাকার নির্দেশ প্রদান করলেন। বললেন যুদ্ধের সময় তোমরা আমার নির্দেশ ছাড়া এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। এদিক থেকে কাফিরদের অশ্বারোহী বাহিনী হামলা করতে পারে। তাদেরকে যে কোনো মূল্যে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই নির্দেশের উপর অটল থাকতে ব্যর্থ হওয়ায়, যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে কাফির অশ্বারোহী বাহিনী পেছন দিক থেকে হামলা করে মুসলমানদের অবস্থা নাজুক করে ফেললো। নিশ্চিত বিজয় মুহূর্তে পলায়নরত কাফিরদেরকে দেখে ঐ ৫০ তীরন্দাজদের অধিকাংশ গনিমতের মাল তুলে নিতে স্বস্থান পরিত্যাগ করলেন। তাদের আমীর আবদুল্লাহ বিন যুবাইরসহ ১১ জন স্বস্থান পরিত্যাগ করলেন না। তারা সেখানেই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এদিকে স্থানত্যাগকারীরা ভেবেছিলেন যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাফিররা পলায়ন করছে, তাহলে এখানে অবস্থানের আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের এই মারাত্মক ভুলের জন্য শেষ পর্যন্ত অনেক সাহাবীকে শাহাদতবরণ করতে হয়েছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবননাশের আশঙ্কা দাঁড়ায়। কাফিররা তাঁকে ঘিরে ফেলে। অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, শহীদ হয়ে তাঁকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে যান। এরপরও উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস নামক এক নরাধম কাফিরের প্রচণ্ড প্রস্তরাঘাতে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দন্ত মুবারক শহীদ হয়ে যায়। ইবনে কুমাইয়্যাহ নামক আরেক কাফির তরবারি দ্বারা তাঁকে আঘাত হানে। এই আঘাতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল, তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর এক কাফির গুজব তুললো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ পুরো যুদ্ধের ময়দানব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো। এতে কাফিররা যুদ্ধের উৎসাহ হারিয়ে ফেললো। এদিকে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিল চরম দুঃখ-বেদনা। এভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো।

উহুদ যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আসাদুল্লাহ হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ ৭০ জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল কারো পক্ষেই ছিলো না। কাফিররা এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এমনটি ভাবা ঠিক নয়। যুদ্ধের ময়দান থেকেই তারা ফিরে যায়। বিজয়ী হলে তারা অবশ্যই মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে মদীনা শরীফ দখল করার উদ্দেশ্যে হামলা করতো। যুদ্ধ শেষে

(তখনও) কাফির নেতা আবু সুফিয়ান মুহাজির প্রখ্যাত সাহাবীদের নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন। ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী গারে উহুদ নামে একটি স্থানে অবস্থান করলেন। আবু সুফিয়ানের ডাকাডাকি তাঁদের কর্ণগোচর হচ্ছিল। কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কথা বলতে নিষেধ করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন আবু সুফিয়ান বললেন, "যুদ্ধ পাশা খেলার মতো অনিয়মে ভরা। আজ কারো জয় হচ্ছে তো কাল জয় হচ্ছে অন্যের। দেবতা হোবলের জয় হোক!" এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, উমর! ওকে বলো, "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। তিনি ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই। আমাদের নিহতরা যাবে জান্নাতে আর তাদের নিহতরা যাবে জাহান্নামে!" উমর ইবনে খাত্তাবের কণ্ঠে আবু সুফিয়ান এসব কথা শোনে জবাব দিলেন, "আমাদের রয়েছে উয্যা দেবতা- তোমাদের উয্যা নাই!"

সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা এর জবাব কি দেবো?"। তিনি বললেন, "তোমরা বলো, الله مولنا ولامولى لكم - "আল্লাহ আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নাই!" এরপর যখন উভয় পক্ষ যার তার গন্তব্যপথে রওয়ানা হয়ে গেলেন তখন, কাফিরদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জের সুরে একজন বললো, "হে মুসলমানগণ! আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় আমরা তোমাদের মুকাবিলা করবো"। এতদশ্রবণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে জবাব দিতে বললেন, "বলো! হ্যাঁ। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এই তারিখই বহাল রইলো।"

এদিকে মদীনা মুনুওয়ারায় যুদ্ধের খবর দ্রুত পৌঁছে গেল। মহিলা, কিশোর-কিশোরী ও বৃদ্ধরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কাফিররা বিজয়ী হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অসংখ্য মুসলিম সৈন্য নিহত হয়েছেন। এরূপ খবর শ্রবণে তারা ভীষণ মনঃক্ষুন্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পুরুষ-মহিলাদের অনেকেই ছুটে চললেন উহুদের দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানা গেলো পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন তখন তারা সুস্থির বোধ করলেন। যদিও অনেকেই তাদের নিকটাত্মীয়- পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র ইত্যাদি হারিয়েছিলেন, তথাপি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন দেখে সকলে সেসব হারানোজনদের দুঃখ ভুলে গেলেন। নবীজীর প্রতি ভালোবাসার কী অপূর্ব নিদর্শন!

চতুর্থ হিজরি

এ বছর হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরের সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিলো বীর মাউনায় ৬৯ জন সাহাবীর করুণ শাহাদাতবরণ। এদের সকলেই হাফিজ ও অনেকে আসহাবে সুফফার সদস্য ছিলেন। একমাত্র কা'ব ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু জীবন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে করুণ এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনার উপর সঠিক বর্ণনা আমরা বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থ থেকে এখানে তুলে ধরছি।

নজদ অঞ্চলের আমির বিন মালিক নামক এক ব্যক্তি একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আবেদন জানালো যে, সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। তবে সে তার গোত্রকে ভয় করে সুতরাং একদল বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানবান সাহাবী যদি সেখানে ইসলামের দাওয়াতের জন্য পাঠানো হয়, তাহলে বেশ উপকার হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। সত্তুর জন সাহাবীর এক কাফিলা যখন বীর মাউনা নামক স্থানে পৌঁছুলো তখন বনী সুলায়ম এর উসাইয়্যা, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্র সম্মিলিতভাবে একরূপ নিরস্ত্র এই কাফিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাহাবারা যেটুকু সম্ভব প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন কিন্তু একমাত্র কা'ব ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পান। তিনি পরবর্তীকালে খন্দক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ লাভ করেন।

বীর মাউনায় হযরত ইবনে মিলহান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জাব্বার ইবনে সুলমা নামক একব্যক্তি হত্যা করেছিল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সাহাবী যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা শ্রবণ করে এই ঘাতক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন: আমাকে ইসলামের দিকে যে জিনিস ধাবিত করেছিল তা ছিলো এই যে, আমি বীর মাউনায় ইবনে মিলহানের দিকে বল্লম নিক্ষেপ করি। এটা তাঁর বক্ষদেশ ভেদ করে গেল। তিনি এ সময় যে বাক্য তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তা ছিলো: "কাবার প্রতিপালকের কসম! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি, হয়েছি সফলকাম"। তিনি আরো বলেন, এই বাক্যটি শ্রবণ করে আমি অবাক হলাম। আমি তাঁকে হত্যা করলাম, আর তিনি মৃত্যুর সময় বললেন, সফলকাম হয়েছি! পরবর্তীতে বুঝতে সক্ষম হলাম, শাহাদাতবরণের অমিয় সুধাপানে আত্মহারা হয়ে

তিনি এরূপ বলেছিলেন। আমি তাই এই মহান ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করলাম ও ইসলামে দীক্ষিত হলাম।

বীর মাউনার এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবতই খুব বেশী মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে সেখানে প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল।

এ বছরের রবিউল আওয়াল মাসে ইয়াহুদী গোত্র বনী নাদিরের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে অভিযান সংঘটিত হয়। এই গোত্রটি ছিলো ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ও হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। উদ্দেশ্য ছিলো বনী আমিরের দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনা করা। বনী আমিরের সঙ্গে এদের মৈত্রী চুক্তি ছিলো। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে প্রকাশ্যে খুব ভালো মিষ্ট ব্যবহারের ভান করে এবং গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

সাহাবায়ে কিরামসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘরের দেওয়াল সংলগ্ন স্থানে বসা ছিলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলো যে, এরূপ সুযোগ আর কোনদিন মিলবে না। উপর থেকে তাঁর মস্তকে বড় একটি পাথর ছুড়ে মারতে পারলেই হয়! তাঁর থেকে আমরা চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে যাবো। তাঁদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে সাথে সাথে সেখান থেকে উঠে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং এদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের আয়োজন শুরু হলো।

একদল মুজাহিদসহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাদিরে পৌঁছে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখলেন। দীর্ঘ ৬ দিন অবরোধ রাখার পর বনী নাদিরের নেতারা প্রস্তাব দিলো যে, তারা উট যা বহন করতে পারে সে পরিমাণ মালামাল নিয়ে এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুত- অবশ্য কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নেবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। সুতরাং

বিনা রক্তপাতেই বনু নাদিরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করা হলো। এই অভিযানের সময়ই সুরা পান নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাজিল হয়।

এ হিজরির শাওয়াল মাসে উম্মে সালামাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। অপরদিকে তাঁর স্ত্রী হযরত জায়নাব বিনতে খুজাইমাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা মাত্র ৮ মাসের বৈবাহিক জীবন অতিক্রান্ত করে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পঞ্চম হিজরি

এ হিজরির মুহাররম মাসে 'যাতুর রিক্বা' অভিযান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদের দুষ্ট বনী মাহারিব ও বনী ছা'লাবা গোত্রদ্বয়কে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নাখলা নামক স্থানে পৌঁছার পর অনেকের পায়ে ফোসকা পড়ে যায়, কারণ উটের সংখ্যা কম থাকায় অধিকাংশ মুজাহিদকে হেটে যেতে হয়েছিল। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের ৬ জনের মধ্যে মাত্র ১টি উট ছিলো। ফলে পদব্রজে চলতে গিয়ে সকলের পায়ে ফোসকা পড়ে যায় এবং পায়ের নখ পর্যন্ত উপড়ে যায়।" এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য লোকে নিজেদের পায়ে পট্টি বেঁধেছিলেন। এজন্য এ যুদ্ধ গাযওয়া যাতুর রিক্বা বা পট্টিওয়ালা যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করে। তবে আসলে যুদ্ধ হয় নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসময় সালাতুল খাওফ বা ভয়ের নামাযও আদায় করেন।

এই যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। সাহাবায়ে কিরামও অন্যান্য বৃক্ষরাজির ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বীয় তলোয়ার গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমাদের তন্দ্রা এসে গেলো। কিছুক্ষণ পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাক দিলেন। সেখানে গিয়ে দেখি এক বেদুঈন বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অবগত করলেন, এই লোকটি আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে আমার তলোয়ার হাতে তুলে নেয়। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আমার মাথার উপর তলোয়ারখানা উঁচিয়ে রেখেছে। সে বললো: এখন তোমাকে কে বাঁচাবে? আমি জবাব দিলাম: আল্লাহ। এই দেখো, সে এখন

বসে আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো সাজা দিলেন না। আসলে লোকটির হাতদ্বয় সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গিয়েছিল।

এ বছরের অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অশ্ব থেকে পড়ে যেয়ে আহত হন এবং মাশরাবায় তিনি ৫দিন অবস্থান করেন; হযরত জওয়ারিয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোন; মুনাফিকরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার চেষ্টা করে। পরে স্বয়ং আল্লাহ পাক হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার উত্তম নিষ্কলুষ চরিত্রের স্বীকৃতি হিসাবে আয়াত নাযিল করেন। অপবাদকারীদেরকে সনাক্ত করে শরয়ী নিয়মানুযায়ী ৮০ দুররা মারা হয়।

খন্দকের যুদ্ধ

এ হিজরির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো খন্দকের যুদ্ধ। একে আরবীতে গাযওয়ায়ে আহযাব বলে। এ বছরের (অর্থাৎ ৫ম হিজরির) শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের সূচনা হয়। মক্কার কুরাইশ কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে নও-মুসলিমদের এটিই ছিলো চূড়ান্ত যুদ্ধ। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। এই বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যেয়ে মুসলমানরা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হোন। সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ
الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে, সে সময় মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল" [সূরা আহযাব : ১০-১১]।

কুরাইশ, ইয়াহুদী ও গাফফান গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত এই বিরাট ফৌজ যখন মদীনার পানে অগ্রসর হলো তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্থিতির নাজুকতা সকলকে জানালেন। এরপর পরামর্শ হলো কী করা যায়। অনেকের প্রস্তাব শেষে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্যদের একটি অতি পরিচিত ও কার্যকর সামরিক কৌশল হলো পরিখা খনন করা। অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে এই কৌশল বেশ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা মদীনা শরীফের যেসব এলাকা দিয়ে হামলার আশঙ্কা করছি সেখানে খন্দক বা খাল খনন করতে পারি। আরবদের নিকট এই কৌশল ছিলো সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পছন্দ করলেন। সুতরাং মদীনার উত্তর-পশ্চিম দিকের ময়দানে খন্দক খননের নির্দেশ দিলেন। এদিক থেকেই মদীনা শরীফ আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সর্বাধিক।

প্রতি চল্লিশ হাত পর্যন্ত খন্দক খননে দশ জন করে সাহাবা নিযুক্ত করা হলো। খন্দকের দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার হাত, অর্থাৎ ২৫০০ গজ (১.৩ কি.মি)। এর গভীরতা ছিলো সাত থেকে দশ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ১০ হাত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক খননে নিজে শরীক হোন। এ সময় শৈত্যপ্রবাহ বেশ তীব্র ছিলো। খাদ্যের পরিমাণ সীমিত থাকায় একাধারে তিন-চারদিন পর্যন্ত অত্যল্প খাবার খেয়ে কিংবা উপবাসে থাকতে হয়েছিলো সাহাবায়ে কিরামকে। হযরত আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা ক্ষুধার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম এবং নিজেদের পেট খুলে দেখালাম। আমাদের পেটে তখন একটি করে পাথর বাঁধা ছিলো। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থা দেখে নিজের পেট মুবারক উন্মুক্ত করলেন। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র পেটে দু'টি পাথর বাঁধা আছে। এরূপ ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই সবার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোন ভাটা পড়ে নি- কারণ, তাঁরা যা করছিলেন তা ছিলো সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে: একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে খন্দকের নিকট যেয়ে দেখতে পেলেন ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে মুহাজির ও আনসাররা খনন কার্যে লিপ্ত আছেন। তাদের নিকট না ছিলো কোনো গোলাম কিংবা কর্মচারী যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। সাহাবায়ে কিরামের এই কঠিন পরিশ্রম দেখে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান মুবারক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'আ উচ্চারিত হলো:
"হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; অতএব আনসার ও মুহাজিরদের তুমি ক্ষমা করো।"

উপরোক্ত দু'আ যখন খননকারীদের কর্ণগোচর হলো তখন তাঁরাও বলতে লাগলেন:
نحن الذين بايعوا محمدا * على الجهاد مابقينا ابدًا

"আমরা তো তারাই, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের জীবন প্রদীপ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেছি।"

ভবিষ্যদ্বাণী

খন্দক খননকালে এক বিরাট পাথর সামনে পড়লো। সাহাবাদের কেউই একে ভাঙ্গতে পারছিলেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানানোর পর তিনি নিজেই কোদাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসলেন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে এমন জোরে আঘাত হানলেন যে, পাথরটি এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেলো। সাথে সাথে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, "আল্লা-হু আকবার!" ধ্বনি। বললেন, আমাকে আমাকে সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার আঘাত করার ফলে পাথরখানার আরেক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তিনি আবারো 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছও দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের চোখে মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। এরপর আবার প্রচণ্ড আঘাত করলেন পাথরের উপর- এতে তা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল। এবার আরো জোরে উচ্চারণ করলেন 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি, বললেন, আমাকে ইয়ামনের চাবিগুচ্ছও দেওয়া হয়েছে। এখনই আমি সান'আ শহরের তোরণ অবলোকন করছি। সুবহানাল্লাহ! এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করছিলেন যখন আরবের বিরাট এক বাহিনী কর্তৃক মুসলমানরা পরিবেষ্টিত হচ্ছিলেন, তাদের জান-মালের তথা অস্তিত্বের নিশ্চয়তা পর্যন্ত ছিলো না। তীব্র শৈত্য প্রবাহ, ক্ষুধা, অভাব-অনটন ও বিরাট ক্লান্তিক্ষণে এই কথাগুলো যেনো সাহাবায়ে কিরামের কান-মন-দৃষ্টিতে দীর্ঘ ট্যানেল শেষে ক্ষীণ আলোর আভা ছিলো। কারণ, তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে উচ্চারিত এসব ভবিষ্যদ্বাণী

অক্ষরে অক্ষরে পালন হতে যাচ্ছে। আর তা অবশ্যই হয়েছিল। হযরতের মক্কী জিন্দেগী শেষ হতে না হতেই সিরিয়া, পারস্য, মিশর, ইয়ামন ইত্যাদি অঞ্চলের বিরাট বিরাট শক্তিধর রাজাধিরাজদের পরাজিত করে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি মু'জিযা প্রকাশিত হয়। এখানে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরছি।

১. পাথরগুলো নরম হওয়া

খননকারীরা যখন কোন পাথর ভাঙ্গার ব্যাপারে কষ্টের সম্মুখীন হতেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের পানি দ্বারা কুলি করতেন ও কিছু পাঠ করে দু'আ করে এই পানি পাথরে ছিটিয়ে দিতে বলতেন। এতে পাথরগুলো বালির ঢিবির মতো নরম হয়ে যেতো।

২. খাবারে বরকত ও বড়ো পাথর ভাঙ্গা

খাবারের মধ্যে এমন বরকত হতো যে, অনেক লোক সামান্য খাবারেও তৃপ্ত হতেন এমনকি সমগ্র বাহিনীই পরিতৃপ্ত হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের দিন খননকাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় এক বিরাট প্রস্তর দেখা দিলো। এটা খন্দক খননে বাঁধার সৃষ্টি করছিলো, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বললেন, আমি নামছি। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র পেটে পাথর বাঁধা আছে। আমরা এ সময় তিনদিন যাবৎ উপবাসে ভুগছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাথরে কোদাল দিয়ে আঘাত হানার সাথে সাথে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে নিজের গৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। ঘরে পৌঁছে স্ত্রীকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অবস্থায় দেখেছি তাতে আমার ধৈর্য রাখতে পারছি না। তুমি খানাপিনার কোনো ব্যবস্থা করো। স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ- কিছু যব আর ঐ বকরির বাচ্চা দ্বারা খাওয়ানো যাবে। বাচ্চাটি জবাই করো। সুতরাং রান্নার ব্যবস্থা করে ফিরে

গেলাম পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে। তাঁকে বললাম, আমি অল্প কিছু খানার ব্যবস্থা করেছি। আপনি দু'এক জনকে সাথে নিয়ে চলুন। তিনি জানতে চাইলেন খানার পরিমাণ কি? আমি বিস্তারিত বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, এতো অনেক বেশী খাবার! তুমি ফিরে যাও। তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত ডেগচি চুলা থেকে নামাবে না এবং রুটি উনুন থেকে বের করবে না। এরপর সবাইকে ডেকে বললেন, হে লোকসকল বিসমিল্লাহ বলো! সকল আনসার ও মুহাজির দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি আমার বাড়িতে মেহমানদারির জন্য সবাইকে দাওয়াত করলেন। বললেন, জাবির এক বিরাট দাওয়াতের আয়োজন করেছে, আমরা সবাই তার বাড়িতে যেয়ে মেহমানদারী করবো।

বাড়ি পৌঁছে আমি স্ত্রীকে বললাম, খবর রাখো কিছু? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত লোকদের নিয়ে তোমার বাড়িতে খেতে আসছেন! স্ত্রী বললেন, খাবারের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেছেন কি? তাকে আমি সব খুলে বললাম। ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে লোকসকল ভিড় করো না। সবাই বসে যাওয়ার পর তিনি ডেগচির ঢাকনা না খুলে রুটি ও গোস্ত পরিবেশন করতে বললেন। সুবহানাল্লাহ! সবাই পেট পুরে খেলেন কিন্তু রুটি ও গোস্ত শেষ হলো না। তিনি বললেন, এবার তোমার গৃহের সকলে খেয়ে নাও।

কুরাইশদের কর্তৃক মদীনা অবরোধ

দশ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কুরাইশরা মদীনার উপকণ্ঠে এসে ছাউনি ফেললো। খন্দকের অপরদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'লা পাহাড়কে পেছনে রেখে তিন হাজার মুসলিম সৈন্যবাহিনীসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান নিলেন। শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী সৈন্য সামনে এসে খন্দকের পারে থমকে দাঁড়ালো। তারা এরূপ যুদ্ধকৌশল কখনো অবলোকন করে নি। একটি স্থানে খন্দকের প্রশস্ততা কিছু কম ছিলো। সেদিকে আরবের প্রখ্যাত অশ্বারোহী বীর আমর ইবনে আবদুদ অগ্রসর হয়ে হাঁক ছাড়লো: কে এমন আছে যে, আমার মুকাবিলা করবে? হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এগিয়ে এসে বললেন, আমর! তুমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলে যে, কুরাইশদের কেউ তোমাকে দু'টো বিষয়ে দাওয়াত করলে তার একটি তুমি অবশ্যই কবুল করবে। আমর স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিলো। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাকে আল্লাহ, তদীয়

রাসূল ও ইসলামের দিকে দাওয়াত করছি। সে বললো, আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই! হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে আমি তোমাকে যুদ্ধের মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি! সে বললো, ভাতিজা! আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করতে চাই।

আমর এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। শুরু হলো যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শের-ঈ-খোদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তলোয়ারের আঘাতে আমরের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। আমরের সঙ্গী নওফাল এই অবস্থা দেখে দ্রুত সেখান থেকে পালালো।

খন্দকের যুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষ তেমন বেশী হয় নি। বার বার শত্রুরা খন্দক পার হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলো। আবু সুফিয়ান ভাবলেন, মদীনার মুসলমানদেরকে জব্দ করার একটি পথ হলো পুরো শহরকে অবরোধ করে রাখা। এতে সবাই অনাহারে অর্ধাহারে জর্জরিত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। সুতরাং অবরোধের পন্থাই তারা বেছে নিল। দীর্ঘ এক মাস এই অবরোধ স্থায়ী ছিলো। এমনিতেই সে বছর ছিলো আকাল- তার উপর এই অবরোধের ফলে মদীনা মুনুওয়ারায় কোনো পণ্যদ্রব্য বাইর থেকে আসছিলো না। ফলে সবার উপর নেমে আসে প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা। এদিকে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন হলো। তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে চাই। আসলে তা ছিলো না- এ ছিলো তাদের পালাবার একটি কৌশল মাত্র।

ভয় ও পেরেশানীর মধ্যে মুসলিম বাহিনী কালাতিপাত করছিলেন। শত্রু বাহিনী অবরোধ ওঠানোর কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছিলো না। একদিন গাতাফান গোত্রের নু'আম ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওমের অজান্তে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আপনার অভিপ্রায়মাফিক হুকুম করুন। তিনি বললেন, যুদ্ধ হলো কৌশল বা হিকমাতের নাম। তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে পারো। শত্রুপক্ষের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরাতে তুমি চেষ্টা চালাও। তার চেষ্টার ফলে বনী কুরাইজা ও কুরাইশদের মধ্যে বিশ্বস্ততার সন্দেহ সৃষ্টি হলো। পরিণতিতে তাদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি ভয়ের

সঞ্চার হলো। সুতরাং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বাসনা কুরাইশদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এদিকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে গেল। এক রাতে কাফির-মুশরিক বাহিনীর উপর দিয়ে এমন এক প্রবল শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলো যে, তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে পড়তে লাগলো। রান্নার সরঞ্জামাদি উল্টে-পাল্টে পড়লো। এই করুণ অবস্থাদৃষ্টে আবু সুফিয়ান বললেন, হে কুরাইশগণ! এখন আর এখানে অবস্থান করার উপায় বাকী নেই। আমাদের খচ্চর ও ঘোড়াগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। বনী কুরাইজা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। খুব ভয়ঙ্কর এই প্রবল ঝড়-তুফানে যে কী বিরাট কিয়ামত কাণ্ড ঘটাচ্ছে তা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। আমাদের কোনো আশ্রয়স্থলই নিরাপদ ও অক্ষত নেই। এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। আমি ফিরে যাবার ইচ্ছা করছি। আবু সুফিয়ান এটুকু বলে নিজের উটে আরোহণ করে যেতে লাগলেন। পুরো কুরাইশ বাহিনী তার অনুসরণ করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায আদায় করছিলেন। মুসলমানদের গোয়েন্দা হুজাইফা ইবনে ইয়ামন রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে তাঁর নিকট সব সংবাদ দিলেন। সুতরাং খন্দক যুদ্ধের অবসান হলো। ভোর হতেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্য-সামন্তদের নিয়ে মদীনা মুনুওয়ারায় ফিরে আসলেন। পবিত্র কুরআনে করীমে খন্দকের ঘটনার বর্ণনা এসেছে এভাবে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন" [সূরা আহযাব : ৯]। আরোও ইরশাদ হয়েছে:

وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

"আল্লাহ পাক কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায় নি। যুদ্ধ করতে আল্লাহই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী" [সূরা আহযাব : ২৫]।

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট ৭ জন শহীদ হয়েছিলেন। অপরদিকে মুশরিকদের পক্ষে নিহত হয়েছিল ৪ জন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধের পর বলেছিলেন: এ বছরের পর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হবে না। বরং তোমরাই তাদের ওপর হামলা করবে।

খন্দকের যুদ্ধের পরই বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ইয়াহুদী গোত্র বনী কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত হয়। তাদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক বিচারকার্যে মনোনীত হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুযায়ী ছয় শত পুরুষ বন্দীদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই ইয়াহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে সফল অভিযান শেষে মদীনা শরীফ শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য তাদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হলো।

ষষ্ঠ হিজরি

এ বছরে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশুপুত্র হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহু সে সময় মারা যান। মদীনা শরীফে গুজব উঠলো, এই মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক বিদ্যমান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে অবগত করলেন: তাঁর সন্তানের মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। সূর্যগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। তোমরা বরং এ সময় নামায আদায় করবে। এই নামাযকে বলে, সালাতুল কুসূফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আদায় করেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

এই হিজরির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি মক্কা শরীফে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। এই সত্য স্বপ্নের কাল, মাস বা বছর নির্ধারিত ছিলো না। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এই স্বপ্ন শ্রবণে

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠলেন। কারণ, তাঁরা নিশ্চিত জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নও ওহীর মতো মহাসত্য। দীর্ঘ ছয় বছর মুহাজিররা নিজ জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত। মক্কা শরীফের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও সম্মানবোধ অস্থিমজ্জায় জড়িত হয়ে আছে, সেখানে ফিরে যেতে তাই সবাই উদ্গ্রীব। নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যেয়ে পবিত্র বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করার সৌভাগ্য হয়তো অচিরেই পূর্ণ হবে এই ভেবে সকলেই অধীর অপেক্ষায় রইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, এই বছরই পবিত্র উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সুতরাং হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। উমরার ইহরাম বেঁধে সবাই মক্কার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতিরোধ করলেন। জানা গেল কুরাইশরা তাঁর আগমনে ভীষণ অস্থির ও ঘাবড়ে গেছে। তিনি হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দূত হিসাবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, হে উসমান! তুমি তাদের গিয়ে বলো, আমরা যুদ্ধের জন্য আসি নি। আমরা উমরা পালনের নিয়তে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ইসলামের দাওয়াতও দেবে।

বাইআতে রিদ্বওয়ান

উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফিরে আসছিলেন না। তারপর সংবাদ পাওয়া গেল যে, কুরাইশরা তাঁকে শহীদ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সকলকে একত্রিত করে এই দুঃসংবাদ জানালেন। এরপর তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে সবাইকে বাইআত গ্রহণের আহ্বান করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বসা ছিলেন। তাঁর আহ্বানে ১৪০০ সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে আল্লাহর রাসূলকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বাইআতের জন্য সর্বপ্রথম হাত বাড়ালেন হযরত আবু সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এরপর সকলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিহাদের মাধ্যমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এই বাইআতই 'বাইআতে রিদ্বওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। এক মুনাফিক ছাড়া সকলেই বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত থাকলে তিনিও বাইআতে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হাত মুবারক দেখিয়ে সবাইকে

বললেন, এই হাত উসমানের। অর্থাৎ তাঁর উভয় হস্ত মুবারক একটা আরেকটার উপর রেখে হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে বাইআত করলেন।

বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা বেহেশতে প্রবেশ করবেন। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বাইআত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"মু'মিনগণ যখন বৃক্ষের নীচে আপনার হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করেছিল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের হৃদয়ে যা ছিলো সে ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করেছেন। এবং তাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয়" [সূরা ফাতাহ : ১৮]।

আরও ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ * فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ * وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"যারা তোমার হাতে বাইআত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাইআত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন" [সূরা ফাতাহ : ১০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাইআত সম্পর্কে বলেন: "ইনশাআল্লাহ! এই বৃক্ষের নীচে যারা বাইআত করেছে, তাদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"। একথা শ্রবণে হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا

"তোমাদের প্রত্যেকেই এটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" [১৯ : ৭১]।

এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটাও বলেছেন:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

"অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো"।

বাইআত শেষ হওয়ার পর আসন্ন যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এমন সময় সকলে দেখতে পেলেন হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ থেকে ফিরে আসছেন। এতে অবশ্যই সবাই যারপরনেই আনন্দিত হলেন, তাঁদের উদ্বেগ ও অশান্তির অবসান হলো। হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু জানালেন যে, কুরাইশরা একা উমরাহ করার জন্য তাঁকে বলেছিলো, তিনি তা অস্বীকার করেন। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আটক করে রেখেছিল। পরে তারা জানালো, মুসলমানরা মরণপণ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাই তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়।

এদিকে কুরাইশরা বুঝতে সক্ষম হলো যে, মুসলমানরা সত্যিই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেন নি- তাই তাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র সীমিত ছিলো। সবাই মিলে দুরভিসন্ধি করলো যে, এই সুযোগে মুসলমানদেরকে খতম করে দেওয়া যায়। তাই তারা একদল অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলো। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলো মিরকায। তারা একটি গোপন পথে মুসলমানদের নিকটবর্তী হলো আকস্মিক আক্রমণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আসলে মুসলিম বাহিনী মোটেই অপ্রস্তুত ছিলো না- তারা পুরো কাফিলা পাহারার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একদল দক্ষ সৈন্য কুরাইশদের ঘিরে ফেলেন ও প্রায় সবাইকে বন্দী করতে সক্ষম হন। শুধুমাত্র সেনাপতি মিরকায পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের সকলকেই বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। তাঁর মহানুভবতা কুরাইশদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো।

সন্ধির প্রয়াস

কুরাইশরা শেষ পর্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব দিলো। তারা একে একে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে লাগলো। প্রথমে আসলো উরওয়া ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী। সে কিছু অসংযত উক্তি করেছিল বিধায় তার দ্বারা কোনো কাজ হলো না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহাব্বাত লক্ষ্য করে সে অভিভূত হয়েছিল। সে মক্কা শরীফ ফিরে যেয়ে বললো, "আমি বড় বড় রাজা-বাদশাহদের দরবারে গিয়েছি। তাদের শান-শওকত দেখেছি কিন্তু আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের সাহাবীগণ তাঁকে যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন তা বিশ্বজগতের কোথাও দেখি নি।"

এরপর প্রতিনিধি হিসাবে হুলায়াস ইবনে আলকামা, মিরকায ইবনে হাফস এবং সবশেষে সুহায়ল ইবনে আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা চূড়ান্ত করা ও চুক্তি সম্পাদনের জন্যই সুহায়ল দূত হিসাবে এসেছিলেন। যা হোক কুরাইশদের শর্তাবলীর অনুকূলে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হলো। ঐতিহাসিক এই সন্ধির ক'টি শর্ত ছিলো:

১. এ বছর মুসলমানগণ উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবেন।
২. আগামী বছর এই মুলতবী উমরা কাযা করতে পারবেন। তবে মাত্র তিনদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থানের অনুমতি পাবেন।
৩. কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া উমরা পালনের সময় আর কোনো অস্ত্র আনতে পারবেন না।
৪. মক্কায় অবস্থানরত কোনো মুসলমান মদীনায় চলে গেলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু মদীনা হতে কেউ মক্কায় চলে আসলে তাকে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হবে না।
৫. এই সন্ধি দশ বছর বলবৎ থাকবে।

সুহাইল খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু চুক্তিপত্র লিখতে বসলেন। তিনি প্রথমেই লিখলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুহাইল বাঁধা দিয়ে বললেন, থামুন! রাহমান ও রহীম কে তা আমরা জানি না। আমরা লিখে থাকি: بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ (হে আল্লাহ! তোমার নামে), সুতরাং তা-ই লিখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ঠিক আছে, এটাই লিখো। এরপর লিখা হলো:

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله

"এটা সেই চুক্তিপত্র যার প্রতি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীকৃতি প্রদান করেছেন"। সুহাইল এবারও বাঁধা দিয়ে বললেন, থামুন! আমরা যদি মুহাম্মদকে [সা.] আল্লাহর রাসূল মেনে নিতাম, তাহলে আপনাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হতো কেন? বরং লিখুন: محمد بن عبد الله অর্থাৎ 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ'। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। এরপরও তুমি যা চাও তা-ই লিখা হবে। কিন্তু আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি কিছুতেই 'رسول الله' শব্দটি কাটতে পারবো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। শব্দটি আমাকে দেখিয়ে দাও- আমিই তা কেটে দিচ্ছি। তিনি তা কেটে দেওয়ার পর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেই স্থানে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ' শব্দ ক'টি লিখে দিলেন।

বন্দী অবস্থায় আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আগমন

চুক্তিপত্র তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। শৃঙ্খল বেষ্টিত অবস্থায় কুরাইশ দূত সুহাইলের পুত্র হযরত আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেথায় এসে উপস্থিত হলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে আবদার করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মদীনা শরীফ নিয়ে যান। চরম নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন।

স্বীয় পুত্রকে দেখে সুহাইল এগিয়ে এসে আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর গালে একটি চপেটাঘাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে দাবী করলেন, চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী আমার পুত্রকে অবশ্যই আমার হাতে ফিরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সুহাইল! এখনও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয় নি। অন্তত আমার খাতিরে আবূ জান্দালকে আমাদের সাথে যেতে দাও। কিন্তু সুহাইল কিছুতেই তা মানলেন না। সুতরাং অগত্যা আবূ জান্দালকে সুহাইলের নিকট ফেরৎ দিতে হলো। এদিকে চরম নির্যাতনের শিকার হযরত আবূ

জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা এ কী করছো? এই যালিমদের হাতে আমাকে ফেরৎ দিচ্ছো। দয়া করে আমাকে রক্ষা করো! তাঁর এই আবদার শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন আবূ জান্দালের এই অবস্থা দেখে ক্ষোভে ও দুঃখে জ্বলছিলেন- কিন্তু মুখে কিছুই উচ্চারণ করলেন না। অবশেষে যখন আবূ জান্দালকে মুশরিকরা টেনেহেঁচড়ে মক্কাভিমুখে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো তখন উমর ইবনে খাত্তাবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন: "হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধরো। এরা মুশরিক, তাদের রক্ত আল্লাহর নিকট কুকুরের রক্ততুল্য!"

শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করলেন। মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আওফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাহল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী। মুশরিক পক্ষে সাক্ষী হিসাবে ছিলেন: মিরকায ইবনে হাফস, হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উযযা প্রমুখ।

সন্ধির শর্তে হযরত উমরের প্রতিক্রিয়া

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী প্রায় সবগুলোই ছিলো মুশরিকদের পক্ষে। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সবাই দুঃখে ফেটে পড়ছিলেন কিন্তু মুখে কিছু উচ্চারণ করছিলেন না। তবে ভবিষ্যৎ খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: আপনি যে আল্লাহর রাসূল তা কি সত্য নয়? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসূল। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা যে পথে আছি তা কি ন্যায় ও সত্যের পথ নয়? আর কাফিরগণ যে পথে আছে তা কি অন্যায় ও অসত্যের পথ নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, নিশ্চয়। উমর আবার বললেন, তবে দীনের কাজে আমরা এতো দুর্বলতা দেখাই কেন? এতো অপমান

কেন সহ্য করবো? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। আমি কিছুতেই তাঁর আদেশ অমান্য করবো না। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি বলেন নাই আমরা বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করবো? তিনি জবাব দিলেন, তবে এই বছরই তাওয়াফ করবো তা বলি নি। উমর, ধৈর্য ধরো। অচিরেই আমরা সকলে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবো।

হুদাইবিয়া থেকেই মুসলমানরা কুরবানী সেরে মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম থেকে মুক্ত হলেন। এরপর আরো তিনদিন হুদাইবিয়ায় অবস্থান করে কাফিলা মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। কাফিলার প্রায় সবাই দুঃখে জর্জরিত। তাঁদের ধারণা মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কুরাউল গামীম নামক স্থানে কাফিলা এসে পৌঁছার পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে হঠাৎ ওহী নাযিলের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হলো। তিনি একটু পরই বললেন, হে আমার সাহাবীগণ! তোমাদের রব অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়" [সূরা ফাতাহ : ১]

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয়ের ঘোষণা শ্রবণ করে বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, এটা কী বিজয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্ত স্বরে প্রফুল্লচিত্তে বললেন, হ্যাঁ, এটাই বিজয়। হযরত উমরের মনে সান্ত্বনা আসলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এই ঐতিহাসিক সন্ধিই মুসলমানদের জন্য চুড়ান্ত বিজয়ের কারণ হবে। আর তা-ই ছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবূ বাসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে আসেন। মুশরিকরা সাথে সাথে সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরৎ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তি পাঠিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে আবূ বাসিরকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাতে তুলে দিলেন। আবূ বাসির বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে এসেছি। আপনি আমাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এটা সন্ধির

শর্ত। তুমি ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য কোনো পন্থা বের করে দেবেন।"

মক্কার দু'জন দেহরক্ষী আবূ বাসিরকে নিয়ে রওয়ানা দিলো। রাস্তায় তিনি একজন দেহরক্ষীর তরবারির প্রশংসা শুরু করলেন। রক্ষী এতে নিজেকে বড়ো ও গৌরবান্বিত মনে করলো। সে এক পর্যায়ে তার ঐ তরবারি হযরত আবূ বাসিরের হাতে তুলে দিল। বললো, "আমি এটা অনেক লোকের উপর ব্যবহার করেছি!" তরবারি হাতে নিয়ে আবূ বাসির তাকে খতম করে দিলেন। ওপর রক্ষী এই দৃশ্য দেখে জীবন নিয়ে পালালো।

আবূ বাসির আবার মদীনা শরীফ ফিরে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি আবদার করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। এখন আমাকে এখানে থাকতে দিন।" কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এই ঘটনার ফলে যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা আছে। আবূ বাসির ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মদীনা শরীফ থেকে চলে গিয়ে সাগর সৈকতে একটি স্থানে বসবাস শুরু করলেন।

এদিকে হুদাইবিয়া থেকে ফেরৎ যাওয়া সাহাবী আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছুদিনের মধ্যেই আবার পালিয়ে আসলেন। তিনি সমুদ্র সৈকতে লুকিয়ে থাকা আবূ বাসিরের সঙ্গে যোগ দিলেন। ধীরে ধীরে মক্কা শরীফ থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানরা এখানে এসে একটি বসতি গড়ে তুললেন। অতি শীঘ্রই বেশ বড়ো একটি উপনিবেশ গড়ে উঠলো। তবে মরুভূমির উপর তাঁদের জীবন ছিলো অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং জীবনরক্ষার্থে তারা কাফির-মুশরিকদের বাণিজ্য কাফিলার উপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। মক্কা শরীফ থেকে যেসব কাফিলা এদিকে যাতায়াত করতো তারা তারা এদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সবকিছু লুটপাট করে নিতেন। তাদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা মদীনা শরীফ দূত পাঠিয়ে সন্ধির এই শর্ত বাতিল করার প্রস্তাব দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পত্রযোগে এই সংবাদ আবূ বাসিরের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তখন অন্তিম শয্যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রখানা হাতে রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন। সমুদ্র সৈকতে গড়ে ওঠা মুসলিম

উপনিবেশের সবাই মদীনা মুনুওয়ারায় চলে আসলেন- সে সাথে পরবর্তীতে মক্কা শরীফ থেকে হিজরতকারীরাও বিনা বাধায় আসতে শুরু করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছুদিন পরই প্রখ্যাত মুসলিম সেনানায়ক হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা মদীনা মুনুওয়ারায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খালিদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর হাতে সিরিয়া এবং হযরত আমর ইবনে আস এর হাতে মিশর বিজিত হয়েছিল।

সপ্তম হিজরি

এই হিজরিতেই প্রখ্যাত খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কৃত ইয়াহুদীরা এখানে বসবাস শুরু করে। এরপর তারা প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুতরাং এদের দমন-কল্পে হুদাইবিয়ার সন্ধি সমাপ্ত করে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক মাসের ভেতর ১৫০০ মুজাহিদের এক বাহিনী গঠন করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর নির্দেশ মুতাবিক এই যুদ্ধে বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবারাই শুধু যেতে পেরেছিলেন।

মদীনা শরীফ থেকে খায়বারের দূরত্ব ১২৫ মাইল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মুহাররমের ২০/২১ তারিখ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধ ছিলো দুর্গ কেন্দ্রিক। সর্বমোট ৬টি মতান্তরে ১০টি দুর্গে ইয়াহুদীরা বাস করতো। মুসলমানরা একটার পর আরেকটা দুর্গ দখল করে নেন। সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গের নাম ছিলো কামূস। এটি বার বার আক্রমণ করেও মুসলমানরা দখল করতে ব্যর্থ হন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ এবং রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। এই দুর্গ বিজয়ের গৌরব তাকেই আল্লাহ তা'আলা দান করবেন।

সাহাবীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে উঠলো। সবার ভাবনা, কার ভাগ্যে দুর্গ বিজয়ের গৌরব নিহিত আছে। সবাই ভোরে ওঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করলেন। কিন্তু আসলেন না শুধু আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়? একজন বললেন, চোখ-ওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করছেন তিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে আনতে বললেন। তিনি আসার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখ-নিঃসৃত লালা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দু'আ করলেন। সুবহানাল্লাহ! সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলীর চোখ ভালো হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শের-ই-খোদা হযরত আলীর হাতে ঝাণ্ডা প্রদান করে বললেন, "যাও! যুদ্ধ করো যতক্ষণ না বিজয় নিশ্চিত হয়। এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করো না।" অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রথমে শত্রুদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কথাও বলেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঢাল মাটিতে পড়ে যায় এবং এক ইয়াহুদী তা নিয়ে পলায়ন করে। এসময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে এমন রূহানী শক্তির সঞ্চার হলো যে, দুর্গের ভারী লৌহ নির্মিত দরজা উপড়িয়ে তা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। যুদ্ধ শেষে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই দরজা ছুড়ে মারলেন। এরপর দেখা গেলো আট জন শক্তিশালী ব্যক্তি একত্রে মিলেও এই দরজাটি ওঠাতে পারছেন না!

দুর্গ বিজিত হলো। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফিরে আসলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শের-ই-খোদা আলীকে চুম্বন করলেন। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ কিসের ক্রন্দন, দুঃখের না আনন্দের?" তিনি জবাব দিলেন, আনন্দের।

এ বছরের অন্যান্য ঘটনা হলো: খায়বারে ধৃতা হযরত সাফিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সাথে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পন্ন হওয়া; মু'তআ বা অস্থায়ী বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ; মুসলমানদের জন্য গৃহপালিত গাধা ও শিকারী জন্তুর মাংস হারাম হওয়া; এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মাতা হযরত উম্মে রুমান রাদ্বিআল্লাহু আনহার মৃত্যুবরণ ছিলো এ হিজরির বিশেষ ক'টি ঘটনা।

উমরাতুল কাযা

এ বছরের যুল-কা'দা মাসে সন্ধির শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতবী উমরার কাযা আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত সকল সাহাবাসহ আরো অন্যান্য আনসার-মুহাজির এই উমরা পালনে শরীক হলেন। এতোদিন পরে মুহাজিররা তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবেন- আনন্দের বন্যা সর্বত্র বইতে লাগলো। দুই হাজার সাহাবীর এক বিরাট কাফিলাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী শুধুমাত্র কোষবিদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্র কেউই সাথে নিলেন না। তবে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০০ বীর সাহাবীকে যুদ্ধরক্ষী হিসাবে অস্ত্রশস্ত্রসহ আগেই পাঠিয়ে দিলেন। তবে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন যে, তারা যেনো মক্কা শরীফের হারাম সীমানার ভেতরে না ঢুকেন। এই বাহিনী নির্দেশ মুতাবিক 'মাররায যাহরান' নামক উপত্যকার ইয়াজাজ এলাকায় যেয়ে শিবির স্থাপন করে। কুরাইশরা এদের খবর পেয়ে ঘাবড়ে যায়। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে নিশ্চিত হলো যে, তিনি যুদ্ধের জন্য আসেন নি। সন্ধির শর্ত পুরোপুরিভাবে পালিত হবে।

মক্কা শরীফের দৃশ্য এক আশ্চর্য চিত্র ধারণ করলো। কুরাইশদের অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পাহাড়-পর্বতের উপর আশ্রয় নিলো। তাদের শঙ্কা ছিলো, নগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এসব মুসলমানরা হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অপরদিকে অনেকেই আবার দারুন-নাদওয়ার সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের কর্মকা- অবলোকন করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিক দিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন। পবিত্র বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হতেই তিনি আবেগভরা কণ্ঠে তালবিয়ার আওয়াজ তুললেন:

لبيك اللّٰهم لبيك * لبيك لاشريك لك لبيك * ان الحمد والنعمة **لك والملك** *
لاشريك لك *

"হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, প্রভু হে! আমি হাজির। সকল প্রশংসার যোগ্য তুমিই, সকল দান-অনুদান তোমারই আজ্ঞাধীন। রাজত্ব তোমারই কর্তৃত্বাধীন, তোমার কোন শরীক নাই।"

এই অপূর্ব তালবিয়ার ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হলো সাহাবাদের হাজারো কণ্ঠ, মুখরিত হয়ে ওঠলো মক্কা শরীফের আকাশ-বাতাস। কাফির-মুশরিকরা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের এই কাফিলার হৃদয় নিংড়ানো কর্মকা-। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের কী অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ। মালিকের দরবারে বান্দার আনুগত্যের কী সুন্দর নমুনা!

সন্ধির শর্তানুযায়ী মুসলমানগণ তিনদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যে সাহাবায়ে কিরাম প্রিয় জন্মভূমি ঘুরে দেখতে লাগলেন। ফেলে যাওয়া বাড়িঘর ও ভিটা দেখে আবেগ-আপ্লুত হলেন- অনেকের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। স্বাধীনভাবে চলতে কেউ কোনো বাধাও দেয় নি। তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে কাফিলাসহ যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হলো। মদীনা শরীফ যাওয়ার পথে 'সরিফ' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি হয়। এখানেই হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাত্রিযাপন করেন। আর এই স্থানেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হিজরি ৬৩ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর এখানেই বিদ্যমান।

আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ষষ্ঠ হিজরির শেষ ভাগ থেকে সপ্তম হিজরির প্রথম ভাগের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রযোগে আরব উপদ্বীপ ও চতুর্দিকের অঞ্চলসমূহের আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের নিকট দূত মারফত ইসলামের দাওয়াত দেন। যেসব সম্রাট ও বাদশাহদের নিকট পত্র দেওয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী এবং মিসরের বাদশাহ মুকাওকিয়াস প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এসব পত্রের মধ্যে দাওয়াতের নমুনা ছিলো এরূপ: " .... আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম কবুল করুন, শান্তি পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন ... "।

অষ্টম হিজরি

এই হিজরিতেই মূ'তার যুদ্ধ ও মক্কা-বিজয় সংঘটিত হয়। মূ'তার যুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রথম এক বিরাট রোমান ফৌজের মুখোমুখি হয়। আর মক্কা-বিজয় ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কুরাইশ মুশরিকদের বিরুদ্ধে স্থায়ী ও চূড়ান্ত বিজয়। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উভয় ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরছি।

গাযওয়া মূ'তা

মূ'তা সিরিয়া অঞ্চলের একটি জনপদের নাম। মদীনা শরীফ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১১০০ কিলোমিটার। অঞ্চলটি ছিলো রোম সাম্রাজ্যের অধীনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিস ইবনে উমায়ার আল-আযাদী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পত্রসহ দূত হিসাবে বুসরা শহরের শাসনকর্তা শুরাহবীল ইবনে আমর আল-গাসসানীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু দুষ্ট শুরাহবীল তাঁকে বন্দী করে শহীদ করে দেয়। দূত হত্যা সে যুগেও ভীষণ অন্যায় কাজ হিসাবে বিবেচিত হতো। এই করুণ সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। শুরাহবীল দূত হত্যার মতো অমার্জনীয় অন্যায়ই শুধু করে নি- সে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করলো। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ এবং হুমকি থেকে মদীনাকে রক্ষার্থে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মূ'তা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

এই অভিযান অষ্টম হিজরির জুমাদাল ঊলা মাসে হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানের পূর্বে মোট তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই তিনজনই যে যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাবেন সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, "যদি যায়িদ নিহত হন তাহলে সেনাপতি হবেন জাফর ইবনে আবি তালিব, তিনিও যদি নিহত হন তাহলে সেনাপতি হবেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। আর তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে তোমরা কাউকে সেনাপতি হিসাবে নির্বাচিত করবে।"

মূ'তা অভিযানে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা রোমানদের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ছিলো। মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের বিপরীতে দুশমন বাহিনীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেনাপতি যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে পতাকা ছিলো। তিনি প্রচণ্ড বেগে শত্রুদের উপর তরবারির আঘাত হানতে লাগলেন। এক পর্যায়ে শত্রুর বল্লমের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল- তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। পতাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত মুতাবিক জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু উত্তোলন করলেন। ব্যাপক যুদ্ধ শেষে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "হযরত জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শরীরের সম্মুখদিকে বর্শা ও তরবারির নব্বুই ঊর্ধ্ব আঘাতের দাগ ছিলো।" তিনি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর দ্বীনের পতাকা নির্দেশ মুতাবিক হাতে তুলে নিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি তুমুল যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন।

এরপর পতাকা হাতে নিয়ে সাবিত ইবনে আকরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু চিৎকার দিলেন: হে মুসলমানগণ! তোমরা পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে নতুন সেনাপতি নির্বাচন করো। সবাই সর্বসম্মতভাবে মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। নির্বাচিত হওয়ার পর যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কৌশলে মুসলিম বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। অপরদিকে শত্রু বাহিনী উত্তর দিকে চলে গেল। ইতোমধ্যে রাতের আঁধারে সমগ্র অঞ্চল ঢেকে গেলো। অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা সমীচিন মনে না করে উভয় পক্ষই আপাতত থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

পরদিন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক সুকৌশল অবলম্বন করে শত্রুদেরকে পরাজিত করে দিলেন। তিনি পুরো মুসলিম বাহিনীকে এমন এক উপায়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন যে, অপরদিক থেকে মনে হচ্ছিল এক বিরাট বাহিনী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সবাই মিলে এমন উচ্চস্বরে 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি তুললেন যে, রোমান বাহিনী মনে করলো মদীনা শরীফ থেকে বুঝি সাহায্যকারী বিরাট বাহিনী এসে যোগ দিয়েছে। শত্রুদলে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা আর যুদ্ধ পরিচালনা উচিত হবে না ভেবে ময়দান থেকে চলে গেল। সুতরাং মাত্র ৩০০০

সৈন্যের এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে এভাবে আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রদান করলেন। সুবহানাল্লাহ!

এই যুদ্ধের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদূর মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে বসে অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যান। বুখারী শরীফসহ সহীহ রিওয়ায়েতে তাঁর এই মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তিনজন সেনাপতির শাহাদাতবরণের সংবাদ তিনি সাহাবায়ে কিরামকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এখন যায়িদ পতাকা হাতে নিল, সে শহীদ হলো। জা'ফর পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শহীদ হলো। এবার ইবনে রাওয়াহার হাতে পতাকা আছে, সেও শাহাদাতবরণ করেছে (এসব বলার সময় পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো)।" তিনি আরো বললেন, "আল্লাহর তরবারির মধ্যে একটি তরবারির (অর্থাৎ সাইফুল্লাহর - খালিদ ইবনে ওয়ালিদ) হাতে এখন পতাকা আছে- আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।"

মূ'তা যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে শহীদ হয়েছিলেন মাত্র ১২ জন। অপরদিকে শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে মোট নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এছাড়া যায়িদ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমও যে অসংখ্য শত্রুসৈন্যদের কতল করে শাহাদাতবরণ করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিলো যে, আরবের যে কোনো গোত্র স্বাধীনভাবে মুসলমান অথবা কুরাইশদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে এবং এতে কোনো পক্ষ বাঁধা দেবে না। এই শর্তানুযায়ী দু'টি পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষকারী গোত্রের একটি মুসলমানদের সঙ্গে এবং অপরটি মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছিল। মক্কার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল বনী বাকর আর মুসলমানদের সাথে চুক্তি করেছিল বনী খুযা'আ। মক্কার নিকটেই বসবাসকারী বনী খুযা'আ ও মুসলমানদের মধ্যে এই মিত্রতা কুরাইশদের সহ্য হলো না। সুতরাং তারা চিরদুশমন এই গোত্রকে বনী বাকর কর্তৃক আক্রমণে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহায্য-সহযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র প্রদান এমনকি ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, সুহাইল ইবনে

আমর প্রমুখ কুরাইশ জওয়ানরা ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিয়ে বনী খুযা'আর বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করলো না। বনী খুযা'আ অতর্কিত হামলায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তারা ভয়ে প্রাণ-রক্ষার্থে বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পৌত্তলিকরাও হারাম শরীফের ভেতর হত্যাকাণ্ড ঘটাতে ভয় করতো- কিন্তু বনী বাকার গোত্রের সর্দার নাওফাল বললো, "এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাবো না- কা'বাগৃহের মর্যাদা ভুলে যাও! সবাইকে হত্যা করো"। কুরাইশগণ হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত প্রকাশ্যে ভঙ্গ করে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সদলবলে যোগ দিল।

এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই খুযাঈরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করে সাহায্যের প্রার্থনা করলো। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন, সন্ধির শর্তানুসারে এখন খুযাঈদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মম এই অত্যাচারের ঘটনা শ্রবণে তিনি খুব মর্মাহত হলেন। কুরাইশরা যে সন্ধি ভঙ্গের নিমিত্তে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা বুঝতে বাকী রইলো না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে না যেয়ে প্রথমে দূত মারফত নিম্নোক্ত প্রস্তাবাদি পেশ করলেন:

ক. বনী খুযা'আকে তোমরা উপযুক্ত রক্তপণ দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার করো;

খ. কিংবা বনী বাকরের সাথে সকল সম্বন্ধ বাতিল করো;

গ. অথবা হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল হয়েছে বলে ঘোষণা দাও।

কুরাইশগণ আগে থেকেই হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাই তারা দূতকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে, শেষোক্ত শর্তই আমরা মেনে নিলাম। সুতরাং কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে বাতিল করে দিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল বিলম্ব না করে মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে বাতিল করে যে বিরাট ভুল করা হয়েছে কুরাইশরা তা অচিরেই উপলব্ধি করলো। মুসলমানদের আক্রমণের মুখে তাদের টিকে থাকা আর সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের নেতা আবু সুফিয়ান দূত হিসাবে মদীনা শরীফ এসে সন্ধি পুনর্বহালের চেষ্টা চালালেন। মদীনা শরীফ এসে আবু সুফিয়ান স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। পিতাকে দেখে তিনি তড়িঘড়ি করে বিছানা তুলে ফেললেন। আবু সুফিয়ান এই দৃশ্য

দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বিছানা গুটিয়ে রাখলে কেন?"। উম্মে হাবীবা জবাব দিলেন, "আপনি অপবিত্র! কাফির! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিছানায় বসার উপযুক্ত আপনি নন!" আবু সুফিয়ানের মনে এ কথাগুলো বিরাট প্রভাব ফেললো। তিনি স্বভাবতই মনোক্ষুন্ন হয়ে বের হয়ে গেলেন। মসজিদে নববীতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ধি পুনর্বহালের প্রস্তাব দিলেন।

তার এই প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মঞ্জুর হলো না। অনেক চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে আবু সুফিয়ান নিজেই ঘোষণা করলেন, 'হে মদীনাবাসীগণ! শুনো, আমি হুদাইবিয়ার সন্ধিকে পুনঃবলবৎ ও সুদৃঢ় করে গেলাম।' এরপর তিনি মদীনা থেকে প্রস্থান করলেন।

আবু সুফিয়ানের ব্যর্থতা হেতু কুরাইশরা অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় পতিত হলো। তারা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চরমভাবে পরাজিত হবে তা তারা জানতো। সুতরাং আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তারা ভীষণ ভয় ও শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো।

মক্কা যাত্রা

পবিত্র রমজান মাসের ১০ তারিখ, অষ্টম হিজরি মুতাবিক ১লা জানুয়ারী ৬৩০ ঈসায়ী সালে মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনীসহ রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

তকদির খুললো ইসলামের চরম দুশমন আবু সুফিয়ানের

মারউ'জ যাহরান উপত্যকায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাউনি ফেললেন। দশ হাজার সৈন্যের এই বিরাট বাহিনী পুরো বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী তাঁবু টাঙ্গিয়ে রাতের বেলা সর্বত্র বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। মক্কা শহর থেকে অদূরে অবস্থানরত এই সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হিযাম ও বুদায়াল ইবনে ওয়ারাকাকে তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলো। কিন্তু ছাউনির নিকটে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পাহারারত একদল মুসলিম বাহিনীর হাতে আবু সুফিয়ান বন্দী

হলেন। তাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো। সবাই অপেক্ষা করছিলেন ইসলামের এই চরম দুশমনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ উপায়ে হত্যার নির্দেশ দেবেন সেটা শ্রবণ করতে। কিন্তু দয়ার সাগর পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন: "হে আবু সুফিয়ান! তোমার মঙ্গল হোক। এখনও কি সময় আসে নি যে, তুমি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই?"

হযরত উমরসহ উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। আবু সুফিয়ানের মনে নবীজীর এই করুণা-ভরা দাওয়াত রেখাপাত করলো। তিনি যে ধীরে ধীরে সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছিলেন তা নিজেই বুঝতে পারেন নি। আল্লাহ পাক তাঁর উপর দয়ার দৃষ্টি দিয়েছিলেন- আর তা অবশ্যই স্বীয় প্রিয় হাবীবের ওয়াসিলায় হয়েছিল। আবু সুফিয়ান জবাব দিলেন: "আপনার জন্য আমার মাতাপিতা কুরবান হোক! আপনি মহান, দয়ালু ও ধৈর্যশীল আর আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারছি, যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ থাকতো তাহলে আজ আমার অবশ্যই কোনো উপকারে আসতো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে আবার বললেন: "হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপলব্ধির ক্ষমতা দান করুন। তুমি এখনও একথা স্বীকার করবে না যে, আমি আল্লাহর রাসূল?"

কিন্তু আবু সুফিয়ান নির্ভীকভাবে উত্তর করলেন: "আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হতে পানি নি!" একথা শ্রবণ করে হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: "আর কেনো বিলম্ব করছো আবু সুফিয়ান! ইসলাম কবুল করো!" এবার আবু সুফিয়ানের মনে সত্যের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠলো। তার তকদির খুলে গেল। দৃঢ়কণ্ঠে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করলেন: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপরিসীম করুণা! যে ব্যক্তি ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই চরম দুশমন হিসাবে কুরাইশদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন আজ তিনিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আত্মসমর্পণ করলেন- তিনিও এখন থেকে সাহাবা হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হয়ে গেলেন। মাত্র ক'দিনের মধ্যেই আবু সুফিয়ান একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তিনি ইসলামের জন্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করে একটি চক্ষু বিসর্জন দিয়েছিলেন। তায়েফ অভিযানে এই চক্ষু আহত হয় এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই আবু সুফিয়ানের সন্তান প্রখ্যাত সাহাবী ও সমরনায়ক হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু উমাইয়্যা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দিলেন, কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীকে বাধা না দেয় তাহলে কোন রক্তপাত হবে না। আবু সুফিয়ানের ঘর নিরাপদ থাকবে। আবু সুফিয়ান ফিরে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আর কারোর নেই। কেউ যেনো ভুলেও আক্রমণ না করে। এই সংবাদে সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারে পালালো। অনেকে পাহাড়ের উপর, নিজের গৃহে এবং আবু সুফিয়ানের ঘরে আত্মগোপন করলো। মহান আল্লাহর অসীম করুণায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা বাধায় পবিত্র মক্কা নগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। তবে তাঁর পবিত্র মস্তক মাটির দিকে অবনমিত ছিলো। উটের মধ্যে সাথে নিলেন প্রিয় পালকপুত্র মু'তা অভিযানে শাহাদাতবরণকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়িদ বিন হারিসার পুত্র হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে। চারদিক থেকে দশ হাজার মুসলিম সৈন্য মক্কা শরীফ প্রবেশ করলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে যে সেনাদল অগ্রসর হয়েছিল তাদেরকে কয়েকজন দুর্দান্ত কুরাইশ জওয়ান আক্রমণ করায় সামান্য যুদ্ধ বাঁধলো। এতে ১২ জন শত্রুসৈন্য নিহত ও ২ জন মুসলমান জিহাদী শাহাদতবরণ করেন। মক্কা বিজয় এভাবে প্রায় রক্তপাতহীনভাবে সুসম্পন্ন হলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরক্ষণে নাজিলকৃত আল্লাহ বাণী:
"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" - সফল হলো। কুরাইশদের উপর মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হলো।

পবিত্রভূমি মূর্তিমুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কা'বাগৃহের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে হাজারে আসওয়াদে চুমো খেলেন। তারপর কা'বাগৃহের চতুর্দিকে ও ভেতরে অবস্থিত ৩৬০টি মূর্তির সম্মুখে যেয়ে একে একে সবগুলো স্বীয় যষ্টি উত্তোলন করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত পাঠ করতে করতে ভেঙ্গে ফেললেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"এবং বলো, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, আর নিশ্চয়ই মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী" [সূরা ইসরা : ৮১]।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'টি প্রাচীন মূর্তি ছিল। এদের নাম ছিলো যথাক্রমে 'ইসাফ' ও 'নায়িলা'। কুরাইশরা বিশ্বাস করতো যে, ইসাফ ছিলো পুরুষ ও নায়িলা ছিলো নারী। একদা এরা হারাম শরীফের ভেতর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা এদেরকে পাথরে পরিণত করেছেন। কিন্তু এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে কুরাইশরা দেবতা মনে করে উপাসনা করতো। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে সেদিন এ দু'টোকে ভেঙ্গে চুরমার করা হলো। কাবা শরীফসহ পুরো হারাম এলাকা মূর্তিমুক্ত হলো।

মক্কা শহরের আশপাশ এলাকায় লাত, উযজা, মানাত, সুওয়া ইত্যাদি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন।

বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কণ্ঠে আযান

যুহরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে আযান দিলেন। কুরাইশ নেতাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আত্তাব ও হারিস এই আযান ধ্বনিতে পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করলেন। তারা একেকজন একেকটি মন্তব্য করলেন। আত্তাব বললেন, আমার পিতার ভাগ্য ভালো তাই এই আযান ধ্বনি শ্রবণের পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন! হারিস বললেন, ইসলামের সত্যতা এখনও উপলব্ধি করতে পরি নি- যদি পারতাম তবে এই ধ্বনি শিরোধার্য করে নিতাম। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান। তাই তার মন্তব্য ছিলো ভিন্ন। তিনি বললেন, "আমি কিছু বলবো না। আমাদের নিকটতম কঙ্করগুলো যেয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট তা জানিয়ে দেবে!" তার এই উক্তি সঠিক ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা জানতে পেরেছিলেন, তবে কঙ্করের মাধ্যমে নয়- স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়েছিলেন। তিনি ওসব নেতাদেরকে বললেন, তোমাদের সকল কথা আমার জানা হয়ে গেছে। এরপর তিনি হুবহু সকল মন্তব্যগুলো বলে দিলেন। এতদশ্রবণে

হারিস ও আত্তাব কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তারা বললেন, বললেন, আমাদের কথাগুলো কেউই শোনতে পায় নি- একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এই সংবাদ আপনাকে জানিয়েছেন। আপনি যে আল্লাহর প্রেরিত নবী তাতে আমাদের আমাদের আর একবিন্দুও সন্দেহ নাই।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের ইসলাম গ্রহণ

উহুদ যুদ্ধে এই হিন্দই বদর যুদ্ধে নিহত তার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যেয়ে হযরত আমীর হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে কতল করিয়েছিলন এবং তাঁর লাশ কেটে কলিজা বের করে চিবিয়েছিলেন। এই দুর্দান্ত নারীও পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণা থেকে বঞ্চিত হলন না। তিনিও ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে নবীজীর দরবারে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পেরেছিলেন। হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সকলকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তবে গুরুতর অপরাধী চারজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে তিনি ক্ষমা দেন নি। ক্ষমার অযোগ্য এরা হলো: ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, মিকইয়াস ইবনে সাবাবা, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আবী সারাহ এবং মিকইয়াসের দু'জন গায়িকা। এদের মধ্যে ইকরিমা ইয়ামনে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইকরিমার পিতা আবু জাহল ইসলামের চরম দুশমন ছিলেন। লোকেরা স্বীয় পিতাকে প্রকাশ্যে গালি দিতে দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, "আমার সামনে যখন মানুষ পিতাকে গালি দেয় তখন আমার ভীষণ লজ্জা হয়"। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বললেন, "মৃত ব্যক্তিগণ তাদের কর্মফল ভোগ করছে- তাদের গালি দেওয়া ঠিক নয়। মৃতদের জীবনের মন্দ দিক ভুলে শুধু তাদের উত্তম দিক নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ"।

হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশীও পেয়ারে নবীজীর ক্ষমা থেকে থেকে বঞ্চিত হলেন না। ওয়াহশী ইসলাম কবুল করলেন। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলে দিলেন, "তুমি আর কখনও আমার সম্মুখে এসো না"। ওয়াহশী সাহাবা ছিলেন- কারণ তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। সাহাবা হওয়ার শর্ত তিনি পালন

করেছেন। ওয়াহশী হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হন্তা হিসাবে বেঁচে থেকে ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করতেন। তিনি সে-ই বর্শা দিয়েই আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধের সময় নুবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর সেখানে মোট পনের দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সাহাবায়ে কিরামকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কা শরীফের আশপাশ অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন।

হুনায়নের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর যে ক'দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন এর মধ্যেই এই যুদ্ধ বাধে। আরাফাতের ময়দান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে ঘন খেজুর বৃক্ষবিশিষ্ট একটি উপত্যকার নাম হুনায়ন। এখানে হাওয়াযিন ও ছাকীফ নামক দু'টি গোত্র বসবাস করতো। সংখ্যাবহুল, যুদ্ধবাজ, শক্তিশালী এই গোত্রদ্বয় ইসলামের চরম দুশমন ছিলো। ইসলামের ছায়াতলে দলে দলে লোকজন যোগদান করছে দেখে এদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলো। সুতরাং তারা মক্কা শরীফে অবস্থানরত মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট ১২ হাজার মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেক নওমুসলিম ছিলেন। যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিলেন। মুশরিকদের অতর্কিত হামলায় তারা চতুর্দিকে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ২০০ সাহাবীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ় থেকে তরবারি চালনা অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন: "হে লোকসকল! তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল, আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ!"

তুমুল যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে দু'আ করলেন। শীঘ্রই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাহায্য আসলো। তিনি ফিরিশতা পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়ে মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিত

বিজয় দান করলেন। এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে কাফিরদের উপর ছুড়ে মারলেন। এতে তারা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কাফিররা সাথে নিয়ে আসা তাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, বিষয়-সম্পদ ও গবাদি পশু পেছনে রেখে পলায়ন করলো। হুনায়নের যুদ্ধে যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে, এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিন, যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিলো সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি। বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ নিজ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নি এবং তিনি কাফিদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন। এটাই কাফিরদের কর্মফল" [তাওবাহ : ২৫-২৬]।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন হযরত হালীমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কন্যা শায়মা বিনতে হারিছও ছিলেন। প্রথমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পারেন নি। শায়মা বললেন, "আপনি আমার পিঠে একদা কামড় দিয়েছিলেন- এই দাগটি এখনও আছে।" একথা শ্রবণ করে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এই মহিলাটিই তাঁর দুধবোন। তিনি তাঁকে সম্মানের সাথে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। শিশুকালের কথা স্মরণ হতেই তাঁর পবিত্র চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো। শায়মা ইসলাম কবুল করলেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় নিজের গোত্রের নিকট চলে গেলেন।

হওয়াযীন ও ছাকীফ গোত্রের একটি দল হুনায়নের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তায়েফ এসে অবস্থান নেয়। এই দলে তাদের নেতা মালিক ইবনে আওফও ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং একটি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তায়েফ এসে হাজির হন। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। শত্রুরা এক বছরের রসদপত্রসহ দুর্গের ভেতর অবস্থান নেয়। মুসলিম বাহিনী দুর্গের নিকটবর্তী হতেই শত্রুরা অজস্র তীর নিক্ষেপ করা শুরু করলো- এতে অনেকেই আহত হলেন এবং শাহাদাতবরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু দূরে সরে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবরোধ তুলে নিলেন। ছাকীফ গোত্রের জন্য তিনি হিদায়াত চেয়ে দু'আ করলেন। এই দু'আ আল্লাহর দরবারে দ্রুত কবুল হয়েছিল। তায়েফ অভিযানে মোট বারোজন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন।

যুদ্ধের পর কাফির বাহিনীর সর্দার মালিক ইবনে আওফসহ উভয় গোত্রের প্রায় সকলেই রাসূলুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। হুনায়নের নিকট জি'রানায় তিনি অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে ইহরাম বেধে মক্কা শরীফ প্রবেশ করে উমরা পালন করলেন। এরপর জি'রানায় ফিরে এসে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

নবম হিজরি: তাবুক অভিযান

তাবুক মদীনা শরীফ থেকে সাত শত কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। মদীনার মুনাফিকরা মসজিদে দিরার নামে পরিচিত একটি নামেমাত্র মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে বসে কুপরামর্শ করতো। এটা ছিলো তাদের চক্রান্তের আস্তানা। তারা রোমান সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য পরামর্শ দিতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন সূত্রে জানতে পারলেন রোমান সম্রাট যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে মদীনা শরীফে বসে সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার চিন্তা বাদ দিয়ে বরং তাবুকের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীসহ যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ দুশমনদেরকে সীমান্তে প্রতিরোধ করাই হলো উত্তম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে ত্রিশ হাজার মুজাহিদের এক বিরাট কাফিলা প্রস্তুত হয়ে গেল। এই যুদ্ধের জন্য সর্বস্তরের মুসলমান সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। যুদ্ধ তহবিলে উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু অনেক অর্থকড়ি প্রদান করেন। হযরত আবু বকর তো সবকিছু দান করে দিয়েছিলেন। তাঁকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রশ্ন করলেন, "পরিবার-পরিজনের জন্য কী পরিমাণ রেখে এসেছো?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি"। মহিলা সাহাবীরা হাতের চুড়ি, ব্রেসলেট, পায়ের নুপুর, কানের দুল, গলার হার, আংটি এবং অন্যান্য মূল্যবান স্বর্ণালংকার দান করেছিলেন। সাহাবায়ে

কিরামের জান-মালের এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত বিসর্জনের ফলেই মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সত্যধর্ম পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের আত্মোৎসর্গ, পরহেজগারী, রাসূলের অনুসরণ ইত্যাদি আমল স্বয়ং আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল, তাই তিনি পবিত্র কুরআন শরীফে তাঁদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন:

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যারা সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজী হয়েছেন, আর তারাও সকলে আল্লাহর প্রতি রাজী হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, এতে তারা হবে চিরস্থায়ী; এটাই হলো বিরাট সফলতা" [তাওবাহ : ১০০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরির রজব মাসে তাবুকের ময়দানে পৌঁছে ছাউনি স্থাপন করে মোট বিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। রোমানরা মুজাহিদদের দৃঢ় মনোবল ও যুদ্ধের প্রস্তুতি অবলোকন করে ভয় পেয়ে গেল। গাসসানী সৈন্যরা ময়দান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল। তাবুকের ময়দানে ফজরের নামায পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত মুজাহিদদের সামনে এক আদর্শিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। সীরাত বিশ্বকোষ থেকে এই অপূর্ব সুন্দর ভাষণের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ পেশ করার পর বললেন, "হে জনগণ! সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব; সবচেয়ে মজবুত রজ্জু হলো তাকওয়ার বাক্য; সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মিল্লাত হলো হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাত; সবচেয়ে উত্তম সুন্নাত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত; সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বাক্য হলো আল্লাহর যিকির; সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা হলো আল-কুরআন; ... সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো মিথ্যা কথন; ... যে ব্যক্তি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাকে মার্জনা করেন; যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে

আল্লাহ্ তাকে অধিক প্রতিদান দেন; ... হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন।"

কাফির মুশরিক রোমান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ এই শীতের সময় আর তাবুক থাকা সমীচিন মনে করলেন না। তাছাড়া অভিযানের সফলতা অর্জন হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতোমধ্যে খবর এলো তাবুকের অদূরে ডুমাতুল জান্দালের খৃষ্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদিল মালিক কিন্দী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এটা জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্যের একটি বাহিনী সেথায় প্রেরণ করেন। ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে খালিদ তাদেরকে পরাজিত করে স্বয়ং উকাইদিরকে বন্দী করে নবীজীর খিদমাতে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুক্তি দেন।

তাবুকের যুদ্ধই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ যুদ্ধ যাতে তিনি স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট ২৭টি মতান্তরে ২৮টি যুদ্ধে স্বয়ং নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব যুদ্ধকে বলে গাযওয়া। এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সাহাবার নেতৃত্বে মোট ৬০টি যুদ্ধ কিংবা অভিযান সংঘটিত হয়েছিল- এগুলোকে বলে সারিয়্যা।

মসজিদে দিরারে অগ্নিসংযোগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযান শেষে মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে যু-আওয়ান নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলো। এতে মুনাফিকদের দিরার মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও চক্রান্ত তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত মালিক ইবনে ডুখশুম ও মা'ন ইবনে আদী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে নির্দেশ দিলেন, ঐ মসজিদ জ্বালিয়ে ফেলো। তাঁরা তাঁর নির্দেশ মুতাবিক ঐ মসজিদে যেয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। মসজিদের অভ্যন্তরে যারা ছিলো তারা জীবন বাঁচিয়ে পালালো।

ইসলামের প্রথম হজ্জ

এই বছরই (নবম হিজরি) মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরজ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করেন। তিনি তিনশত লোকের এক কাফিলা নিয়ে হজ্জে গমন করেন।

এ বছর মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা নামাযে ইমামতি করেন। তাকে কুর্তা প্রদান করেন যা কাফন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জানাযা নামাযের পূর্বমুহূর্তে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, 'তাদের জন্য আপনি মাগফিরাত কামনা করেন বা না এবং আপনি যদি ৭০ বারও মাগফিরাত কামনা করেন তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না'"। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন জবাব দিলেন: "আমি যদি জানতাম তাদেরকে ক্ষমা করা হবে তাহলে অবশ্যই আমি ৭০ বারেরও বেশী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম"। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু একথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে মুনাফিক/কাফিরদের জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করে দিলেন। তিনি ইরশাদ করেন:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও- বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে" [তাওবাহ : ৮৪]।

আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর মৃত্যুসংবাদ জানার পর সাহাবাদের নিয়ে তিনি 'গায়িবানা জানাযা' নামায আদায় করেন। হানাফী মাযহাব মুতাবিক এরূপ গায়িবানা নামায পড়া একমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস ছিলো। মুসলমানদের জন্য

এরূপ নামায পড়া জায়িয নয়। এ বছর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিআল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়।

দশম হিজরি

নবম হিজরির শেষ ও দশম হিজরির প্রথম দিকে সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে অসংখ্য মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে হাজির হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ১০ হাজার সৈন্যসহ মক্কা বিজয় এবং কুরাইশ সরদারদের ইসলাম গ্রহণ সমগ্র আরবে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে মদীনা মুনুওয়ারায়। সুতরাং বিদায় হজ্জ বাদে এ বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এসব প্রতিনিধিদলের ব্যাপক আগমন ও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ।

বিদায় হজ্জ

দশম হিজরির জিলহাজ্জ মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্জ পালন করেন। এই ঐতিহাসিক হজ্জে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন লক্ষাধিক সাহাবী। মদীনা শরীফ থেকে এই বিরাট কাফিলা ২৫ যিলকদ বাদ যুহর যাত্রা শুরু করে। যুল হুলাইফায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধেন ও উচ্চস্বরে তালবিয়া (লাব্বায়িক) পাঠ করা শুরু করেন। লক্ষাধিক হজ্জযাত্রী তাঁর সঙ্গে তালবিয়া পড়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেন। যি-তুওয়া নামক স্থানে এসে কাফিলা রাত্রি যাপন করে।

জিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখ দিনের বেলা উচ্চভূমি হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শহরে প্রবেশ করেন। বাইতুল্লাহ শরীফের উপর চোখ পড়তেই তিনি পাঠ করলেন:

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وتَكْرِيْمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً

"হে আল্লাহ! তোমার এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা, তাজিম ও তাকরীম এবং ভীতিকর প্রভাব বৃদ্ধি করে দাও।" (তাবারানী)

আরো পাঠ করলেন:

اَللّٰهم اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

"হে আল্লাহ! আপনি শন্তিময় শান্তিদাতা আর আপনার পক্ষ হতেই শান্তি আসে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শন্তিসহ বাঁচিয়ে রাখুন।" (বাইহাকী, সুনানে কুবরা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করে ৮ জিলহাজ্জ পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করেন। অধিকাংশ মতে তিনি ক্বিরান হজ্জ আদায় করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ৮ জিলহাজ্জ যুহরের পূর্বে সমগ্র মুসলিম কাফিলাকে নিয়ে তিনি মীনায় গমন করেন। সেখানে তিনি যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর এই পাঁচ রাকাআত নামায আদায় শেষে, ৯ জিলহাজ্জ ভোরে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তিনি আরাফাতের ময়দানে পৌঁছার পর তাঁর উটনী 'আল-কাসওয়ার' উপর আরোহণ করে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দান করেন। জুমু'আর দিন হওয়াতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামায আদায় করলেন, জুমু'আর নামায পড়লেন না। আরাফাতের প্রখ্যাত জাবালে রাহমাতের নিকট এসে তিনি উকুফ করলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আয় কাটিয়ে দিলেন। দু'আ শেষে কুরআন শরীফের এই আয়াতাংশটি নাযিল হলো:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا * فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ * فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম; অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহের প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল" [সূরা মাইদা : ৩]।

সূর্যাস্তের পর হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পেছনে বসিয়ে উটনীর উপর আরোহণ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন। ফজরের নামাযের পর পূর্বাকাশ ফর্সা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাশ'আরিল হারামের নিকট কিবলামুখী হয়ে বসে তিনি দু'আ, কান্নাকাটি ও যিকির-আযকারে কাটিয়ে দিলেন। এই সময়টিকে বলে 'উকুফে মুজদালিফা'। এরপর তিনি মুজদালিফা থেকে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বরাবরের মতো তালবিয়া পাঠ করতে করতে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। পুরো কাফিলা তাঁকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলো। ওয়াদিয়ে মুহাসসার নামক জায়গাটির মাঝামাঝি আসতেই তিনি তাঁর উটনীর গতি বাড়িয়ে দিলেন। এই জায়গায়ই আবরাহার হস্তীবাহিনী আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। মুজদালিফা থেকে কুড়িয়ে আনা ৭টি কঙ্কর জামারাতুল আকাবায় স্থাপিত স্তম্ভে শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। এরপর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করলেন।

মীনার কুরবানীর স্থলে এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৬৩টি উট স্বহস্তে কুরবানী করেন। হিসাব করে দেখা গেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৬৩ বছর এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। অবশ্য উটের সংখ্যা ছিলো ১০০। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বাকী উটগুলো কুরবানী করেন। কুরবানী শেষে ক্ষৌরকারকে মাথা মুণ্ডানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। মুণ্ডিত কেশ মুবারক নিকটস্থ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বণ্টন করলেন। এরপর তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তাওয়াফে জিয়ারত (যাকে তাওয়াফে ইফাদাও বলে) শেষে তিন যমযম কুপের নিকট গমন করে পানি তুলে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। এরপর ঐদিনই মীনায় ফিরে আসেন ও পরের তিন রাত্রি অর্থাৎ ১৩ জিলহাজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেন। উভয় দিন তিনি জামারাতে যেয়ে যথাক্রমে ছোট, মধ্যম ও বড়ো স্তম্ভে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর মক্কা শরীফ যাত্রা করেন, শেষ রাতে বিদায়ী তাওয়াফ করে লোকজনকে তৈরী হতে নির্দেশ দেন। এরপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই ছিলো অতি সংক্ষেপে বিদায় হজ্জের কার্যাবলীর বিবরণ।

পরম প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের প্রস্তুতি

বিদায় হজ্জের সময় যখন আরাফাতের ময়দানে সূরা মাইদার ৩ নং আয়াত নাযিল হলো তখনই বুঝা গিয়েছিল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াতী দায়িত্ব প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তিনি মানুষকে হিদায়াতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। ভাষণের সময় তিনি সবাইকে এ ব্যাপারে প্রশ্নও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসা করা হবে, সেদিন তোমরা তার কী জবাব দেবে?" সাহাবায়ে কিরাম সমস্বরে জবাব দিয়েছিলেন, "আমরা বলবো, আপনি আল্লাহর পয়গাম যথাযথ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।" তিনি তখন আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি উঁচিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করেন: "হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকো।"

তিনি বিদায় হজ্জের বিভিন্ন খুতবায় এ কথাটিও বার বার উচ্চারণ করেছেন: "তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। সম্ভবত এ বছরের পর আমার আর হজ্জ করার সুযোগ হবে না"। এরপর সূরা নাসর অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এতে প্রদান করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসল এবং তুমি দেখলে লোকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। অতএব তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের প্রশংসাগীতিসহ তাসবীহ পাঠ করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অবশ্যই তাওবা কবুলকারী" [সূরা নাসর : ১-৩]।

শেষ রোগ

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কণ্ঠ থেকে এমন কিছু বাক্য উচ্চারিত হতে লাগলো যে, এতে প্রকাশ্য ইঙ্গিত মিললো, তিনি এই মায়াবী পৃথিবী ছেড়ে শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করবেন। এই শেষ সফরে যেতে তিনি যেনো দিন দিন ব্যকুল হয়ে উঠছিলেন। পরম প্রিয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষায় তিনি উন্মুখ। তিনি উহুদের শহীদদের কবর জিয়ারত করলেন।

এরপর একদিন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবাদেরকে বললেন, "আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। এরপর তোমাদের সঙ্গে আমার হাওযে কাওছারে দেখা হবে।" এসব কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তারা জানতেন, তাঁদের মহান সাথী পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বেশিদিন তাঁদের মধ্যে থাকবেন না।

সফর মাসের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি রাতের বেলা জান্নাতুল বাকীতে যেয়ে কবর জিয়ারত করেন। ফিরে এসেই অসুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থানের জন্য তিনি সকল স্ত্রীদের নিকট থেকে অনুমতি নিলেন।

জীবনের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এই বাহিনী যাত্রা করে জুরুফ নামক স্থানে পৌঁছলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়ার তীব্রতা বাড়তে লাগলো। এমতাবস্থায় অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হলো। অবশ্য আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফত লাভ করেই এই অভিযান সম্পন্ন করেছিলেন।

সর্বশেষ ইমামতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ বেড়ে গেল। ইন্তিকালের চারদিন পূর্বে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ ইমামতি করেন যুহরের নামাযে। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার ৮ রবিউল আওয়াল ১১ হিজরি। নামায শেষে তিনি জীবনের শেষ ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি হামদ ও ছানা পাঠ শেষে প্রথমেই উহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে মাগফিরাত কামনা করলেন। এরপর নিজের কবরকে উপাসনার বস্তু বানাতে নিষেধ দিলেন; কারো কোনো প্রাপ্য থাকলে তা পরিশোধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন; মুহাজিরদেরকে বললেন, তোমরা আনসারদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে; এরপর বললেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতের সবকিছু প্রদান করতে ইচ্ছা করলেন, সে আখিরাতকেই পছন্দ করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষোক্ত কথাটির মর্মার্থ হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠলো। তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবু বকর! সবর করো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছু নসিহত করে ফিরে গেলেন।

অসুস্থতার সময় একদা ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীর নিকট তাশরিফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁকে কানে কানে কি যেনো বললেন, এতে তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর আবার কানে কানে কিছু বলার পর তিনি খুশী হলেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, প্রথমবার আমার পিতা আমাকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন এতে আমি কেঁদে ফেলি। কিন্তু দ্বিতীয়বার বললেন, আমার পরে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সঙ্গে মিলিত হবে, এতে আমার মনে আনন্দ অনুভব করলাম।

আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমাম নিযুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েত মুতাবিক হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার বর্ণনামতে ইশার নামাযের সময় লোকজন মসজিদে অপেক্ষারত ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার চেষ্টা করছিলেন নামাযে যোগ দিতে কিন্তু তিনি পারলেন না। শেষে বললেন, আবু বকরকে বলো নামাযে ইমামতি করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ১৭ বা ২১ ওয়াক্ত মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়তে পারেন নি।

ওফাতের দিন এসে হাজির হলো

১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার। তেষট্টি বছর পূর্বে এই একই তারিখে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ পয়গম্বর, জগতসমূহের জন্য রাহমাত পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মায়াবী ধরার কোলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছিলেন। আজ তিনি সেই মহান দায়িত্ব পালন শেষে মা'বুদের ডাকে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিভোর করে তুললো। তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবাদের

সঙ্গে আজ ক'দিন যাবৎ মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতে পারছিলেন না রোগের প্রাবল্যতা হেতু। সুবহে সাদিকের সময় হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হুজরার পর্দা তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁরই ইঙ্গিতে। তিনি শেষবারের মতো তাঁর সাহাবাদেরকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চান। নবীজীর মুবারক দীপ্তিমান চেহারা ভোরের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে যেনো শতগুণ বেশী নূরানী রূপ ধারণ করলো। তিনি সাহাবাদেরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মতরা নামায আদায় করে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন, তিনি বুঝি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এক্ষুণি নামাযের ইমামতির জন্য মসজিদে তাশরীফ আনবেন। সবাই তাঁর আগমনের জন্য সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারায় আবু বকরকে নামায আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় তখন ফুটে ওঠেছে অপূর্ব স্নিগ্ধ হাসির রেখা। তিনি হুজরায় ফিরে গেলেন।

ইন্তিকালের পূর্বে হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কোলে তাঁর পবিত্র মাথা মুবারক ছিলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ঐ দীনারগুলো কি করেছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো টাকাকড়ি ছিলো না, তিনি সবকিছু ইতোমধ্যে গুছিয়ে ফেলেছিলেন। তবে সাতটি দীনার তার নিকট অবশিষ্ট ছিলো। তিনি আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে নির্দেশ দিলেন এই টাকাগুলো সদকা করে দিতে।

সর্বশেষ আ'মল মিসওয়াক ব্যবহার

মিসওয়াক করা ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন দেখে অনেকেই যারতার কাজে চলে গেলেন। কিন্তু আসলে এ ছিলো বিদায় মুহূর্তের সংকেত মাত্র। অচিরেই তাঁর অন্তিম সময় এসে হাজির হয়ে গেল। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। এমন সময় আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আসলেন। তাঁর হস্তে একটি কাঁচা মিসওয়াক ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটির দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। আমরা বুঝতে পারলাম তিনি এটা চাচ্ছেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা আপনাকে দেবো? তিনি হ্যাঁ-সূচক ইশারা করলেন। আমি এটা হাতে নিয়ে চিবিয়ে নরম করলাম, এরপর তাঁকে দিলাম। তিনি খুব উত্তমভাবে মিসওয়াক করলেন। ইতোপূর্বে কখনো আমি তাঁকে এতো ভালোভাবে মিসওয়াক করতে দেখি নি। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা

পরবর্তীতে অত্যন্ত গর্ব করে বলতেন, আল্লাহর অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালার সঙ্গে আমার লালা একত্র হয়েছে, তিনি আমার বুকে মাথা মুবারক রেখে, আমারই হুজরায় ইন্তিকাল করেছেন।

শেষ নসিহত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নসিহত ছিলো: নামায ও তোমাদের দাসদাসীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি বলেছিলেন, নামায এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

ইন্তিকাল

বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসলো। তিনি এই মায়াবী ধরাধাম থেকে চলে যেতে একরকম ব্যকুল হয়ে ওঠলেন। আল্লাহর সান্নিধ্য সন্নিকটে ভেবে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। অপরদিকে মৃত্যুর পেরেশানী তো ছিলোই। পাশে রাখা পানির পাত্রে হাত মুবারক ডুবিয়ে সিক্ত করে চেহারা মুবারকে বার বার দিচ্ছিলেন আর পাঠ করছিলেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ

"আল্লাহ ব্যতীত কোনও মা'বুদ নাই। মৃত্যুতে রয়েছে পেরেশানী ও যন্ত্রণা"। (তাবারানী)

কোন কোন সময় বলছিলেন: "হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর কষ্টের সময় সাহায্য করুন"।

হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একবার বললেন, "হায় আল্লাহ! আমার পিতার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আজকের এই দিন পর তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট হবে না"।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক প্রস্থানের সময় একেবারে নিকটবর্তী হয়ে আসলো। তিনি বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلٰى

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং আমাকে সম্মানিত বন্ধুর সাথে মিলিত করুন" এবং

اَللّٰهُمَّ اَلرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

"হে আল্লাহ! সম্মানিত বন্ধুর নিকট আমি যেতে চাই"।

তাঁর পবিত্র রূহ মুবারক আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীঊন। তিনি ১১ হিজরির ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার দিন, দুপুরে গোটা মদীনা শরীফ তথা পুরো মহাবিশ্বকে কাঁদিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর আগমনের দিনটি ছিলো পৃথিবীর জন্য মহানন্দের আর যাওয়ার দিনটি হলো মহাশোকের। আমরা তাঁর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি। তিনি চলে গেলেও মানুষের জন্য রেখে গেছেন হিদাআতের দু'টি মহাসত্যের উৎস: আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীম ও তাঁর পবিত্র জীবনের কর্ম, বাণী ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মের সমর্থনসম্মৃদ্ধ পবিত্র হাদীস শরীফ।

হে মহান আরশের অধিপতি! তোমার পেয়ারে হাবীবের শাফায়াত লাভে এই অধম বান্দাকে ধন্য করো। এই লেখাটুকুতে অবশ্যই অনেক ভুল-ত্রূটি করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পেয়ারে হাবিব রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো রোজ কিয়ামতে আমাকে মায়ার দৃষ্টিতে দেখেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ওয়াসিলায়। আপনি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজন এবং পাঠকদের ক্ষমা করুন এবং এ লেখা থেকে উপকৃত করুন। আমীন।

আমি যদি মুখগহ্বর হাজার বার মিশক ও গোলাপজলে ধৌত করি, তোমার পবিত্র নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার যোগ্যতা লাভে ঐ মুখটি ব্যর্থ হবে।

দু' জাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারিক জিনিসপত্র

রাহমাতুল্লিল আলামীন, সয়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, উভয় জগতের সরদার, পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নশ্বর এ ধরার বুকে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। জীবনচলার জন্য একান্ত জরুরী রসদপত্র ছাড়া অতিরিক্ত কিছু তাঁর গৃহে থাকতো না। সকল যুগের সকল ওলিদের পথপ্রদর্শক, শরীয়ত ও মা'রিফাতের মধ্যমণি, পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ 'ইনসানে কামিল' মহামানব- যদি চাইতেন, তাহলে বাদশাহদের বাদশাহর মতো জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চান নি। অবিনশ্বর মহাজগতের অফুরন্ত নিয়ামত এবং খাস করে রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও দীদারের সামনে দুনিয়াবী যাবতীয় ভোগ-বিলাস মহাসাগরের মাঝে মাত্র একফোটা পানির চেয়েও তুচ্ছ। হযরতের ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও গৃহের আসবাব নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তালিকাভুক্ত করেছি। পাঠক এ থেকেই আন্দাজ করে নিতে পারবেন দুনিয়ার প্রতি তাঁর চরম অনাকর্ষণের মাত্রা।[৮]

তাঁর পানপাত্র

তিনি মোট তিনটি পানপাত্র ব্যবহার করতেন: ১. রাইয়্যান। ২. মুদাব্বাব: ধাতুর তৈরী এই পাত্রে ছিলো রৌপ্যের নির্মিত একটি চেইন ও হাতল। এটা তিনি সফরকালে ব্যবহার করতেন। ৩. কাচের তৈরী কাপ।

পানি পানের জন্য ছিলো একটি ক্বাদ- এটা ছিলো কাঠের তৈরী। অযুর বদনা হিসাবেও এটা ব্যবহার করতেন। খেজুর বৃক্ষের তৈরী একটি পাত্র ছিলো যা তিনি রাতে প্রস্রাবের জন্য ব্যবহার করতেন।

চামড়ার তৈরী পানির পাত্র ছিলো মোট ৫টি: ১. ক্বিরবা: অযু ও পানের জন্য ব্যবহার করতেন। ২. আদওয়া: চামড়ার ছোট্ট পাত্র। ৩. মিযাদা: চামড়ার তৈরী পানির পাত্র।

---

[৮] এসব বর্ণনার তথ্যসূত্র হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'সীরাত বিশ্বকোষ', হযরত আবুল হাসান আলী নদবী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত 'নবীয়ে রহমত' [ইফাবা কর্তৃক অনূদিত] এবং হযরত ইদ্রিস কান্ধলবী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'সীরাতে মুস্তফা [স.]' [ইফাবা কর্তৃক অনূদিত] । রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনালোচনায় আরোও বেশ কিছু সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে: আল্লামা শিবলী নুমানী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'সীরাতুন্নবী', ইবনে কাছির রাহিমাহুল্লাহর 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'তারিখে তাবারী' [ইংরেজিতে অনূদিত], 'সীরাতে ইনবে হিশাম' ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য সীরতাগ্রন্থ।

৪. শান্না: পুরাতন চামড়ার পানির পাত্র। গরমের সময় এ পাত্রে পানি রাখলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা ঠাণ্ডা থাকতো। ৫. সিক্বা: চামড়ার পানির পাত্র।

ছুরি

তিনি তিনখানা ছুরি ব্যবহার করতেন: ১. সিক্বিন, ২. মুদিয়া ও ৩. শাফরা: এটা ছিলো অনেকটা চওড়া ছুরি।

মুবারক যষ্টি

তাঁর মোট তিনটি যষ্টি (গল্লা) ছিলো: ১. মিহজান: এর অপর নাম ছিলো 'দাক্বন' (বা দাফন)। এটা ছিলো ১ গজ লম্বা (৩ ফুট)। চলতে ও আরোহী অবস্থায় এটা তাঁর হাত মুবারকে থাকতো। ২. ক্বাদিব: এই গল্লার নাম ছিলো, 'মামশুক'। কাঠের তৈরী এই যষ্টি পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীন ব্যবহার করেছেন বরকতের জন্য। ৩. মিকশারা: এই গল্লার নাম ছিলো 'আরজুন'।

বিছানাপত্র

১. ফিরাশ (বিছানা): এ বিছানা ছিলো চামড়ার তৈরী। এর ভেতর খেজুর বৃক্ষের ছাল ছিলো। ২. উইসাদা (বালিশ): চামড়ার তৈরী এই বালিশের ভেতরও খেজুর গাছের ছাল ছিলো। ৩. মিরফাদা মিন আদাম: এটাও একটি চামড়ার তৈরী বালিশ।

কাঠের খাট

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানা কাঠের তৈরী খাট ছিলো। তিনি প্রায়ই এতে বিশ্রাম নিতেন। এরূপ কাঠের তৈরী খাটে করে মাইয়্যিতকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্য কুরাইশদের মধ্যে ছিলো। এই কৃষ্টিটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এই খাট দিয়ে হুজরা শরীফে সমাহিত উভয় খলিফা- হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে শায়িত অনেক সাহাবায়ে কিরামের লাশও এই খাটে করে বহন করা হয়েছে।

পানীয়

তিনি পানি ছাড়াও বকরির দুধ খুব বেশী পছন্দ করতেন। মাঝে মধ্যে উটের দুগ্ধও পান করেছেন। দুধের তৈরী অন্যান্য জিনিষও তিনি আহার করতেন। যেমন: জুবনা

(পনির), আক্বিত (এটাও একজাতীয় পনির), সাম্ন (ঘি) এবং জুবদা (তাজা ঘি)। দুধে পানি মিশিয়েও পান করেছেন। অপর আরেক ধরনের পানীয় যা খেজুরের রস থেকে তৈরী হয়, তিনি পান করতে ভালোবাসতেন। এটার নাম হলো 'নাবিদ্ব তামর'। আরেক ধরনের পানীয় ছিলো যার নাম 'নাবিদ্ব জাবিব'। এটা কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে তৈরী হতো। এছাড়া 'নাবিদ্ব শা'ইর' নামক আরেক ধরনের পানীয় ছিলো- যা তিনি পান করতে পছন্দ করতেন। এটা তৈরী হয় পানির মধ্যে যব ভিজিয়ে।

মধু

মধু মানুষের জন্য উপকারী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু খেতে ভালোবাসতেন। তিনি খাঁটি মধু খেতেন এবং পানি কিংবা দুধ মিশ্রিত মধুও পান করেছেন।

খেজুর

তিনি খেজুর খেতে ভালোবাসতেন। খেজুর পাকা হওয়ার বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন: বুসর (কাঁচা), রুতাব (তাজা), তামর (শুকনো) এবং তামর আতিক্ব (পুরাতন খেজুর)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের খেজুর খেয়েছেন। তবে রুতাব (তাজা) খেজুর অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে খেতে ভালোবাসতেন, যেমন: ১. রুতাবের সাথে শশা, ২. রুতাবের সাথে তাজা ঘি, ৩. রুতাবের সাথে পনির ও ৪. রুতাবের সাথে তরমুজ।

নূরোজ্জ্বল মুবারক চেহারা

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখনই পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতেন তখনই নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

اِمِيْن بِالْمُصْطَفٰى بِالْخَيْرِ يَدْعُو
كَضَوْءِ الْبَدْرُ زَايَلَهُ الظَّلَامُ

তিনি 'বিশ্বস্ত' ঐশীসূত্রে নির্বাচিত জন, তিনি আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন
তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো- যা দৃশ্য হয় অমাবস্যা রাতের পর।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায়ই কবি জুহায়ির ইবনে আবি সালমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

لَوْ كُنْتُ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الْبَشَرِ
كُنْتُ المضَىْء لَيْلَةَ الْبَدْرِ

আপনি যদি মানব না হয়ে অন্য কিছু হতেন, তাহলে আকাশের চাঁদের মতো
হতেন, আপনার নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো সমস্ত জগৎ।

হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা অত্যন্ত আবেগভরে বলেন:

لنا شمس وللافاق شمس
شمسي تطلع بعد العشاء

আমার নিজস্ব জগতের একটি সূর্য আছে
আমার সে সূর্য উদয় হয় ইশার পরে।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক ছিলো লালচে-উজ্জ্বল-সাদা। তাঁর মুবারক চোখ দু'টোর রং ছিলো গাঢ় কালো। কালো চুল মুবারক অধিকাংশ সময় কানের লতি মুবারক পর্যন্ত দীর্ঘ ছিলো। বুক মুবারকে একটি পাতলা লোমের রেখা ছিলো।

তিনি খুব লম্বা কিংবা বেঁটেও ছিলেন না। যখন তিনি হাঁটতেন, মনে হতো কোন টিলা থেকে নীচের দিকে নামছেন। সৈন্যদের মতো উভয় পদ মুবারক দ্রুত ওঠাতেন এবং ধীরে ধীরে মাটিতে নামাতেন। [*আমার শায়খ কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও এভাবে হাঁটতেন আর বলতেন, এরূপ হাঁটা হলো সুন্নাত।*]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ঘর্মে ছিলো মিশক-আম্বরের সুঘ্রাণ। যখন তা নির্গত হতো, মনে হতো মোতি ঝরে পড়ছে। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাঢ় কালো দীর্ঘ মুবারক দাড়ি ছিলো। বুক মুবারক পর্যন্ত দাড়িতে আবৃত হয়ে যেতো।

মু'জিযাতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবী-রাসূলদের কর্তৃক প্রকাশিত মু'জিযা সত্য। অপরদিকে আউলিয়াদের মাধ্যমেও মাঝে-মধ্যে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়। একে বলে 'কারামত'। এটাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর আক্বীদানুযায়ী সত্য। উভয়টি কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছিলেন, মু'জিযা তারই প্রমাণ হিসাবে তাঁদের জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন: ১. খন্দক খননের সময় পাথর চুরমার করে দেওয়া। ২. কাবা ঘরে সংরক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি মক্কা বিজয়ের দিন লাঠির ইশারায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ৩. পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-তরু-লতা ও পাথরখণ্ড থেকে নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান। ৪. হিজরতের দিন ভোরে একমুষ্ঠি বালু নিক্ষেপ করে কাফিরদের চোখ সাময়িক অন্ধ করে দেওয়া ও তাদের অজান্তে গৃহ থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া। ৫. গারে সূরে অবস্থানকালে মাকড়শার জাল বোনা ও কবুতরের ডিম পাড়া। ৬. বৃক্ষরাজি চলন্ত হওয়া। ৭. কাষ্ঠখণ্ড উত্তম তলোয়ারে রূপান্তর। ৮. জীব-জন্তুর অভিযোগ ও তাদের পক্ষ থেকে সম্মানের সিজদা দেওয়া। ৯. পবিত্র হাতের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির ফোয়ারা নির্গত হওয়া। ১০. ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক বিষমিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করা। ১১. বৃষ্টির জন্য দু'আ ও বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

অধিকাংশ গবেষকের মতে তাঁর মু'জিযার সংখ্যা হাজারেরও অধিক। নিম্নে আমরা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযা কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাঠকদের অন্তরের খোরাক হিসাবে লিপিবদ্ধ করলাম। আল-মিরাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃহৎ একটি মু'জিযা। ইতোমধ্যে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে পুনরুল্লেখ করছি না।

১. সর্ববৃহৎ মু'জিযা কুরআনুল করীম

এটা এমন এক ঐশি কিতাব যার তুলনা জগতসৃষ্টির পর থেকে কখনো হয় নি-কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর হতে চললো। অবতীর্ণ হতে শুরু

হয় এই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান কিতাব মক্কা মুকাররমার জাবালে নূরের চূড়ার সেই 'হিরা' গুহায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলেন মানুষের জন্য হিদায়াতের চিরসত্য বাণী স্বর্গীয় দূত হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম। এরপর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়তী জিন্দেগীতে নাযিল হয় বিভিন্ন সময় পুরো কুরআনে করীম। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য লিখিত কিতাব হিসাবে প্রকাশ করেন। তবে কুরআন শরীফ সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমারই।" (হিজর : ৯)

কুরআন শরীফ যে মানুষের পক্ষে রচনা অসম্ভব তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করে বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস, তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (বাক্বারাহ : ২৩)

এই চ্যালেঞ্জ আরব-অনারব তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি। কিয়ামত পর্যন্ত এটা বহাল থাকবে। সে যুগের আরবের খ্যাতিমান বাগ্মি, বাকপটু, কবি-সাহিত্যিকরা পারেন নি এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে। সুতরাং এ যুগে কিংবা পরবর্তী যে কোনো যুগেও যে কেউ তা পারবে না তা নিশ্চিত। আরব ভাষা-পণ্ডিতগণ যেখানে ব্যর্থ সেখানে অনারবদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুকাবিলার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এরপরও এই চ্যালেঞ্জ সবার প্রতি জারী আছে।

কুরআন শরীফের মু'জিযাত ভাব যা তত্ত্ব জগতের সাথে সম্পর্কিত। অলৌকিক এই ভাবের দু'টি দিক আছে: ১. ভাষালঙ্কার ও ২. ভবিষ্যদ্বাণী। ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য এতোই উন্নতমানের যে, এরূপ কোনো কিতাব পৃথিবীতে কখনো রচিত হয় নি। বার বার পাঠ করলে এর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যান্য কিতাব একবার পাঠ করে নিলে আর দ্বিতীয়বার পাঠ করার ইচ্ছেই হয় না। এছাড়া কুরআন শরীফ সহজ করে দেওয়া হয়েছে হিফজ করার জন্য। একজন হাফিজ হতে বড়জোর তিন বছর সময় লাগে। তবে কেউ কেউ মাত্র এক মাসের মধ্যেও কুরআন শরীফ হিফজ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। সুবহানাল্লাহ! এ সবই কুরআন শরীফের মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। অনেকে বলেছেন, পবিত্র কিতাবুল্লায় অন্তত ৭ হাজার মু'জিযা আছে। তবে এই ভাষালঙ্কার, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুরূপ বাক্য-রচনার চ্যালেঞ্জ এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ হলো অধিকাংশের মতে কুরআন শরীফের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মু'জিযা।

দ্বিতীয়ত, কুরআন শরীফে যেমন অতীতের অনেক ঘটনাবলী, জনপদ ধ্বংসের ইতিহাস ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যার অনেকগুলো ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। এ সবগুলোই একেকটি মু'জিযা। এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি।

(ক) নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদ: হুদাইবিয়ার সন্ধির পরই সূরা 'ফাতাহ' এর প্রথম আয়াতেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

(খ) পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী: ইরশাদ হয়েছে,

وَأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

"এছাড়া অন্য আরেকটি বিজয় রয়েছে, যা তোমাদের আয়ত্তে আসে নি। আল্লাহ একে (নিজ ক্ষমতাবলে) পরিবেষ্টন করে আছেন।"

জমহুর মুফাসসিরীনে কিরাম বলেছেন, উক্ত আয়াতে করীমে আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও সিরিয়া (রোমানদের বিরুদ্ধে) বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে।

(গ) কিছু মুসলমান মুরতাদ হওয়ার পূর্বাভাস: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়- নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (মাইদাহ : ৩০)

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়-গ্রহণের পর আরবের কোনো কোনো গোত্রের বেশ কিছু লোক ধর্মত্যাগ করে। এরা মুরতাদ হয়ে যায়। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে। বিরাট একদল লোক মিথ্যা নবী-দাবীদার মুসাইলামা বিল কাজ্জাবের অনুসারী হলো। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে 'ইয়ামামার যুদ্ধে (৬৩৩ খ্রি.)' জঙ্গে উহুদের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা মহাবীর হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) ঐ একই বর্ম দ্বারা মুসাইলামাকে হত্যা করেন।

(ঘ) পারস্য ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী: পবিত্র কুরআনের সূরা রূমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ *

"আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায়। তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্তর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে।" (রূম ১-৪)

এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধের ফলাফল রোমানদের পক্ষে যায়। উক্ত দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ পাক এই ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণার ৯ বছরের মধ্যেই পারস্য সৈন্যরা রোমান সৈন্যদের হাতে পরাজয়বরণ করে। উল্লেখ্য যেদিন রোমানদের বিজয় হয় ঠিক সেদিন মুসলমানরা বদর প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে রোমানদের বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে দেন। এতে মুসলমানরা দু'টি বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। ইতোপূর্বে পারস্য মুশরিকরা রোমানদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে। তারা বলাবলি করছিলো, 'একদল কিতাবধারীর বিরুদ্ধে মুশরিকরা বিজয়ী হয়েছে!'। এ খবরে মুসলমানরা মনঃক্ষুন্ন হয়ে পড়েন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, পারস্যের এই বিজয় সাময়িক। কিছুদিন পর তারা রোমানদের হাতে পরাজিত হবে এবং সর্বোপরি মুসলমানরা অবশেষে উভয় দলকে পরাজিত করবেন। আর তা-ই হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ!

২. মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী

(ক) সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি দ্বীন সুরাইয়া (সিরিয়াস) নক্ষত্রের গায়ে ঝুলন্ত থাকে, তথাপি পারস্যের কিছু লোক এই দ্বীনকে পেয়ে যাবে।"

মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে একদল এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এতে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলবী প্রণীত, মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম (বঙ্গানুবাদ), অনুবাদ: মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা ১৯৯৫ ঈ।]

(খ) মুসতাদারায়ে হাকিমে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিকট ভবিষ্যতে এমন হবে যে, লোকজন জ্ঞানের সন্ধানে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করবে। কিন্তু মদীনার আলিম অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী আলিম তারা পাবে না।"

হযরত সুফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মদীনার আলিম দ্বারা ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইশারা করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(গ) ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুরাইশ বংশে একজন বড় আলিমের জন্ম হবে। তিনি পৃথিবীকে জ্ঞানের ভাণ্ডার দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন।" রিওয়ায়েতটি বাইহাকী শরীফে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে ইমাম শাফিঈ অপেক্ষা বড় কোনো কুরাইশ বংশীয় আলিম জন্মগ্রহণ করেন নি।

৩. মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বিরাট অগ্নিকুণ্ড

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ৬০০ বছর পর পূর্ণ হয়েছিল। এই বাণীটি সহীহাইন শরীফাইনে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের পূর্বে হিজায অঞ্চলে এমন তীব্র অগ্নি নির্গত হবে যে, এর আলোকে সিরিয়া থেকে বসরা নগরীর উটগুলোর গর্দান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে।"

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। ৬৪৫ হিজরি সনের ৩ জুমাদাল উখরা রোজ শুক্রবার ইশার পর মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে হঠাৎ মাটির গর্ভ থেকে এক প্রকাণ্ড অগ্নি নির্গত হতে থাকে। বিরাট এলাকা জুড়ে অগ্নিশিখা দেখাচ্ছিল। অনেকে বলেছেন, দূর থেকে মনে হতো, "এক বিরাট জ্বলন্ত শহর"। অগ্নির দৈর্ঘ্য ছিলো ১২ মাইল এবং প্রস্থ ৪ মাইল। অগ্নির শিখা ৯-১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ছিলো।

ঘটনার সময় বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা কাসতালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত ছিলেন। তিনি এই অগ্নি সম্পর্কে আলাদা একখানা কিতাব রচনা করেন। তিনি বলেছেন, এই অগ্নি মোট ৫৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো।

৪. হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যুকালীন অবস্থা

তিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আ'রিফ জলিলুল কদর সাহাবী। তিনি জাগতিক সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। আমির-উমারাদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনকে ঘৃণা করতেন। শেষ জীবন লোকালয়হীন 'যুবদাহ' নামক এক স্থানে কাটান। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো। স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কাঁদতে লাগলেন। স্বামীর নিকট যেয়ে মন্তব্য করলেন, "হায়! আমরা এমন এক স্থানে অবস্থান করছি যেখানে ঝোপঝাড় ছাড়া কিছুই নাই! সাহায্যকারী একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না!" হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "হে আমার স্ত্রী! তুমি কেঁদো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আছে যে এমন এক জায়গায় মারা যাবে, যেখানে লোকজন থাকবে না। তার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল হঠাৎ পৌঁছে যাবে।" হে উম্মে যর! শ্রোতাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কেই বলেছিলেন। যাও বাইরে গিয়ে সেই আগন্তুক দলের অপেক্ষা করো।"

উম্মে যর রাদ্বিআল্লাহু আনহা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সত্যিই দেখা গেল একদল মুসাফির তাঁর বাড়ির দিকে আসছেন। তিনি তাঁদেরকে হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে সব অবগত করলেন। তাঁরা ছুটে গেলেন ভেতরবাড়ি। তখনও তিনি জীবিত। বললেন, ওহে আগন্তুক ভাইগণ! আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো সরকারী চাকুরী করেন না কিংবা আমির-উমারা

নন তিনিই আমার কাফন পরাবেন, জানাযায় ইমামতি করবেন ও দাফন দেবেন। একথা শোনে একজন যুবক এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি আপনার কাফনের জন্য নিজের ইযারবন্দ এবং দু'টি কাপড় দান করবো। এগুলো আমার মায়ের হাতের কাটা সূতায় তৈরী।' হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা কবুল করলেন। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অসিয়ত মতো তাঁকে গোসল, কাফন-দাফন করা হলো। (বাইহাকী শরীফ)

৫. পারস্য সম্রাট পারভেজের মৃত্যুসংবাদ প্রদান

ইমাম বাইহাকী এই ঘটনাটি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই। হিজরি ৬ষ্ঠ সনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগের বিভিন্ন সম্রাট ও শাসকবর্গের নিকট পত্রযোগে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন। পারস্য সম্রাট পারভেজের নিকটও একখানা পত্র প্রেরিত হয় দূত মারফত। অহঙ্কারী বে-আদব পারস্য সম্রাট পত্রখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। বললো, 'মুহাম্মদ' নাম কেন আমার নামের পূর্বে লিখা হলো? রাগান্বিত হয়ে পারস্য সম্রাজ্যাধীন ইয়ামনের শাসনকর্তা 'বাযান'কে নির্দেশ দিল, তুমি দু'জন চৌকস ও বিচক্ষণ লোক মদীনায় প্রেরণ করো। মুহাম্মদকে বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে এসো! [নাউযুবিল্লাহ!]

নির্দেশ পেয়ে বাযান দু'জন দক্ষ ও বিচক্ষণ লোক মদীনা শরীফ প্রেরণ করে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। বে-আদবীপূর্ণ কিছু কথা উচ্চারণ করে বললো, আপনি পারস্য সম্রাটের নিকট চলুন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তচিত্তে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, "তোমাদের সম্রাট পারভেজ তো গতরাতে স্বীয় পুত্র কর্তৃক নিহত হয়েছেন! আল্লাহ তা'আলা ওহির মাধ্যমে এ সংবাদ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা চলে যাও!" তারা বাযানের নিকট ফিরে যেয়ে সব কথা খুলে বললো। বাযান পারভেজের মৃত্যু সংবাদ তখনও জানতেন না। তিনি মন্তব্য করলেন, এই সংবাদ যদি সঠিক হয়- তাহলে তিনি সত্যিই আল্লাহর নবী। খুব শীঘ্র পারভেজের হন্তা শিরভিয়া একখানা চিঠির মাধ্যমে তাকে জানালো, "পারভেজ অত্যাচারী বিধায় আমি তাকে রাতে হত্যা করে ফেলেছি। আরব দেশে যে লোকটি নবুওয়াতের দাবী করছেন, আপনি তার সাথে কোনো সংঘাতে যাবেন না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এই সংবাদের সত্যতা যখন বাযানের নিকট প্রমাণিত হয়ে গেল তখন তিনি দু'জন পুত্রসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যান।

৬. ফিরিশতাদের কর্তৃক নিরাপত্তা দান

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুদ্ধে ফিরিশতাদের কর্তৃক সাহায্য করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত আছে। এ সবই তাঁর মু'জিযা হিসাবে স্বীকৃত। তাঁকে ফিরিশতাদের দ্বারা নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন। এ সম্পর্কেও একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এরূপ একটি ঘটনা তুলে ধরছি।

একবার পাপিষ্ঠ মুশরিক আবু জাহল বললো, 'আমি লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদকে মাটির উপর (নামায অবস্থায়) নাক ঘষতে দেখি তাহলে (নাউযুবিল্লাহ্) আমার পা দ্বারা তাঁর গর্দান পিষ্ট করে ফেলব!" ঘটনাক্রমে একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করাকালে পাপিষ্ঠ আবু জাহল উপস্থিত হয়ে তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে অগ্রসর হলো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর উভয় হাতে সে অদৃশ্য কিছু প্রতিহত করতে করতে পেছনের দিকে সরতে লাগলো। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললো, 'আমি ও মুহাম্মদের মাঝখানে ভীতিপ্রদ জ্বলন্ত অগ্নির এক বিরাট গর্ত দেখতে পেলাম। কতিপয় ডানাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আবু জাহল যদি আমার নিকটে আগমন করতো তাহলে ফিরিশতারা তাকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে যেতেন!" আল্লাহু আকবার!

৭. খাবারে অতিমাত্রায় বরকত

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তী জিন্দেগীতে 'খাবারে বরকতের' ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। এরূপ মু'জিযার সবগুলো এখানে বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মাত্র বিশুদ্ধ বর্ণনা তুলে ধরছি।

(ক) পেয়ালার খাবারে বরকত: তিরমিযী ও দারিমী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস আছে। হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, কোনো একদিন আমরা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটি পেয়ালায় রাখা খাদ্য ভক্ষণ করছিলাম। কিছুক্ষণ পর পর ১০ জন করে লোকসংখ্যা বাড়ছিলো। সকলেই ঐ একই পেয়ালা থেকে খাচ্ছিলেন। প্রথম ১০ জনের খাওয়া শেষ হওয়ার পর আরো ১০ জন এসে বসছিলেন। এভাবে পালাক্রমে আহার গ্রহণ চলছিলো। মানুষ হযরত জুন্দুব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, পেয়ালার মধ্যে খাদ্য কিভাবে আসছিলো? তিনি আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওখান থেকে আসছিলো।

(খ) দু'জনের খাবার একশত ত্রিশ জনে খেলেন: বাইহাকী ও তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সহীহ সদনে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশজন আনসার নিয়ে উপস্থিত হলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সবাই ঐ দু'জনের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার দ্বারা পেট পুরে খেলেন। আরো অবাক হওয়ার ব্যাপার, খাবার তখনও সম্পূর্ণ শেষ হলো না- কিছুটা রয়ে গেল। এরপর আরো কিছু লোক এসে খাবার খেতে লাগলেন। মোট ১৩০ জন লোক দু'জনের জন্য পাক করা খাবার খেলেন। অনেকে মুসলমান হলেন ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন।"

(গ) আসহাবে সুফফার সকলকে নিয়ে আহার: মুসলিম ইবনে আবু শাইবা ও তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি রিওয়ায়েত তাঁদের স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে আসহাবে সুফফার সকল লোককে ডেকে আনতে আদেশ দিলেন। সবাইকে নিয়ে আসার পর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মুখে একটি খাদ্যভর্তি পেয়ালা রাখলেন। সকলে এ থেকে তৃপ্তিসহ আহার করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পেয়ালার খাদ্য যেই-সেই রয়ে গেল। শুধু এটুকু লক্ষ্য করলাম, পেয়ালার খাদ্যে আঙ্গুলের অনেক দাগ আছে।" উল্লেখ্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন, আসহাবে সুফফায় একান্ত গরীব অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন শতাধিক সাহাবায়ে কিরাম বাস করতেন। কারো কারো মতে তাঁদের সংখ্যা ৪ শতাধিক ছিলো।

(ঘ) আধা সের আটার রুটি খেলেন চল্লিশ ব্যক্তি: ইমাম আহমদ ও ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনা স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তালিব গোত্রের চল্লিশ জনকে দাওয়াত করলেন। এদের কেউ কেউ খুব বেশী পেটুক ছিলেন। একাই একটা আস্ত বকরি খেয়ে নিতেন। এছাড়া একজনে আট সের পর্যন্ত দুগ্ধ পান করে ফেলতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পেটুকদের জন্য মাত্র আধা সের আটার রুটি তৈরী করালেন। অতিথিরা এটুকু রুটি খেয়ে শেষ করতে পারলেন না- বেশ কিছু রয়ে গেল! এরপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালায় বড়জোর ৪ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট, দুধ আনলেন। এবারও তারা সকলে তৃপ্তিসহ দুধ পান করলেন- কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। মনে হচ্ছিল, কেউই দুধ পান করেন নি!" সুবহানাল্লাহ!

৮. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এই মু'জিযার বর্ণনা সর্বাধিক সহীহ হাদীসগ্রন্থ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। মূল বর্ণনাকারীদের মধ্যে আছেন হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামন রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। ঘটনাটির বর্ণনা নিম্নরূপ।

হিজরতের পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জমায় একদা আবু জাহল, ওলিদ ইবনে মুগিরা, আস ইবনে ওয়ায়িল প্রমুখ মুশরিক একত্রিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে চ্যালেঞ্জ করলো, 'আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আকাশের চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখান!' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি এরূপ করে দেখাতে পারি, তবে কি তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে?" তারা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে যাবো'।

হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি চন্দ্রটির দিকে অঙ্গুলি

মুবারক দ্বারা ইশারা করলেন। আল্লাহর কী কুদরত! সত্যিই চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল! উপস্থিত সকলেই তা দেখলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজের চোখে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে দেখেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের নাম ধরে ধরে বললেন, "হে অমুক, হে তমুক! সাক্ষী থাকো, সাক্ষী থাকো ..."।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য সকলের চোখে পড়লো। উভয় খণ্ড এতো দূর পর্যন্ত চলে গেলো যে মাঝখানে হিরা পর্বত দেখাচ্ছিল। স্বচক্ষে এই অত্যাশ্চর্য মু'জিযা অবলোকন করার পরও পাপিষ্ঠ কাফিররা বলে ওঠলো, 'এ-তো প্রকাশ্য যাদু!' আবু জাহল বললো, 'আমরা এ ব্যাপারে আরো খোঁজ-খবর নেবো। যদি এটা যাদু হয়ে থাকে, তাহলে শুধু আমাদের উপরই হতে পারে। অনুপস্থিত যারা এবং অন্যান্য শহরে বসবাসকারীদের উপর তো যাদুর ক্রিয়া বিস্তৃত হতে পারে না। তাই বাইর থেকে আগত লোকজনদের নিকট থেকে ব্যাপারটি জেনে নেওয়া উচিৎ।' আবু জাহলের এই চ্যালেঞ্জও বাতিল হলো। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে বলতে লাগলেন, তারাও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখেছেন।

এই অত্যাশ্চর্য মু'জিযা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে ইরশাদ করেছেন:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

-"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" (সূরা ক্বামার ১-২)

তারিখে ফিরিশতা, সাওয়ানিহুল হারামাইন ইত্যাদি ইতিহাসগ্রন্থে কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ অবলোকন করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তারিখে ফিরিশতায় আছে, মালাবারের এক রাজা মুসলমানদের নিকট থেকে এই ঘটনা শ্রবণ করে যুগের পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বললেন, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থ খোঁজে দেখেছি, আরবের এক নবীর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবে। আপনি যে ঘটনার কথা বলছেন, সেটা সে-ই ঘটনা।' একথা শোনে রাজা মুসলমান হয়ে যান।

সাওয়ানিহুল হারামাইন কিতাবে আছে, মালোহ রাজ্যের চম্বল নদীর তীরে 'দিহার' নামক একটি শহর আছে। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ক্ষণে সেখানকার রাজা তাঁর প্রাসাদের ছাদে বসা ছিলেন। তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আকাশের চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এরপর আবার একত্রিত হলো। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি সম্পর্কে দেশের পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করলেন। তারা বললেন, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আরব দেশে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ পাবে।' এটা জানার পর রাজা একজন দূত মক্কা মুয়াজ্জমায় হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে নিজে মুসলমানও হয়ে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাজার নাম রেখেছিলেন, আবদুল্লাহ। রাজা আবদুল্লাহর কবর এখন দিহার শহরের বাইরে অবস্থিত। (মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম (বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১২০-১২২)

৯. পাহাড়ের কম্পন ও স্থির হওয়া

ইমাম বুখারী রিওয়ায়েত করেন, একদা এক পাহাড়ের উপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হঠাৎ পাহাড়ে কম্পন শুরু হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পা মুবারক দ্বারা সজোরে পাহাড়ের উপর আঘাত হেনে বললেন, "হে পাহাড়! কম্পন করো না, তুমি কি জানো না তোমার উপর অবস্থান করছেন একজন নবী, একজন সত্যবাদী ও দু'জন শহীদ?" আল্লাহর কুদরতে পাহাড়ের কম্পন সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল। এখানে দু'টি মু'জিযা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথমত পাহাড়ের কম্পন ও স্থির হওয়া এবং দ্বিতীয়ত হযরত উমর ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার শাহাদাতবরণের ভবিষ্যদ্বাণী।

১০. খর্জুর শাখার ক্রন্দন

এই মু'জিযাটির বর্ণনা সহীহ বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ আছে। ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মসজিদে নববীর মধ্যে তখনও কোনো মিহরাব নির্মিত হয় নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খর্জুর বৃক্ষের একটি শাখার মধ্যে হেলান দিয়ে জুমু'আর খুতবা প্রদান করতেন। এরপর তিনি একটি মিহরাব তৈরী করলেন। প্রথমদিন নবনির্মিত মিহরাবে আরোহণ করে খুতবা প্রদানের সময় উপস্থিত

সাহাবায়ে কিরামসহ সকলে শুনতে পেলেন ঐ খর্জুর শাখাটি শিশুদের মতো করুণ সুরে ক্রন্দন করছে! পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাখাটির কাছে যেয়ে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে একে সান্ত্বনা দান করলেন। শাখার ক্রন্দন তখন থেমে গেল।

সুফিদের আদর্শ পুরুষ

এই গ্রন্থে আমরা তাসাওউফ-শাস্ত্রপন্থী তথা সুফি-দরবেশ-ওলিদের জীবনালোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও কর্মের ওপর উপরে বর্ণিত আলোচনায় স্বভাবতই তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা জরুরী ছিলো। তিনি ছিলেন সমগ্র মানব ও জিন জাতির জন্য পথপ্রদর্শন এবং সর্দার। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যার ওপর তিনি আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত নন। তবে আমাদের গ্রন্থের মূল বিষয় তথা তাসাওউফ শাস্ত্রেরও উৎপত্তিস্থল তাঁরই পবিত্র জীবন থেকে উৎসারিত। এই শাস্ত্র যা কিছু শিক্ষা দেয়, তা সবই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আ'মল থেকে উদ্ভুত।

সুফিরা যেসব গুণাবলী অর্জনের জন্য জীবনভর সাধনা করে থাকেন তার সবই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর অন্যতম দিক ছিলো। তিনিই প্রথম পুরুষ যার মধ্যে একই সাথে ইখলাস, তাওবাহ, মুহাব্বাত, শাওক (আগ্রহ), খাওফ (খোদাভীতি), রাজা (আল্লাহর রাহমাতের আশা), যুহদ (দুনিয়ার জাঁকজমক থেকে উদাসীন), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা), কিনাআত (অল্পেতুষ্টি), হিলম্ (সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্যতা), সবর (ধৈর্য), শুকুর (কৃতজ্ঞতা), সিদক্ব (দৃঢ়তা), রেজা (সন্তুষ্টি), ফানা (আল্লাহতে বিলীন), ফানাউল ফানা (আল্লাহতে বিলীনের মধ্যে বিলীন) ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল। এক কথায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন 'ইনসানে কামীল' - পুর্ণাঙ্গ আদর্শ পুরুষ। সুতরাং একমাত্র তাঁর অনুসরণের মধ্যেই মানুষের ইহ-পরকালের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পবিত্র নৈকট্যে বেশী উপকৃত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত উসমান ইবনে আফফান, হযরত যায়িদ বিন হারিসা, হযরত আনাস ইবনে মালিক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে

মাসউদ, হযরত আবু যর গিফারী, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আমর ইবনে আস, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন প্রমুখ মহাত্মনের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহিলা সাহাবীরা তো ছিলেনই। বিশেষ করে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রাত্মা স্ত্রীরা যে কতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না নারী ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। ভাগ্যবান এসব পুরুষ ও নারীরা সকলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদৃষ্টি, দু'আ, আধ্যাত্মিক উষ্ণতা, তাওয়াজ্জুহ ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা-বান্দী ও ওলি-ওলিয়্যাতে রূপান্তর হয়েছিলেন। আর এদের নৈকট্যে ও সুদৃষ্টিতে যারা উপকৃত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন তাবিঈগণ।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকার মূলে ছিলেন খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু
(২৩ হিজরীপূর্ব - ৪০ হিজরী, সমাধি: নাজাফ, ইরাক।)

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলিম উম্মার চতুর্থ খলীফা ছিলেন। অনেকের মতে মাত্র ৯ কিংবা ১০ বছর বয়সে তাঁর ইসলামগ্রহণ ছিলো পুরুষদের মধ্যে প্রথম। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আপনজন ছিলেন। শরীয়ত, তরিকত, হাক্বিকাত ও মা'রিফাতে তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শাজারায় ফায়েজে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারিধারা তাঁরই মাধ্যমে পরবর্তী সুফিদের মধ্যে বিকাশ ঘটেছিল।[৯]

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হিজরীপূর্ব ২৩ সাল মুতাবিক ৫৯৯ কিংবা ৬০০ ঈসায়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ২৯ কিংবা ৩০ বছর ছিলো। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিতার নাম ছিলো আবু তালিব। কুরাইশ (হাশিমী) বংশের প্রসিদ্ধ এই পুরুষ ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা। সুতরাং এ হিসাবে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন হযরতের চাচাতো ভাই। তাঁর মাতার নাম ছিলো ফাতিমা বিনতে আসআদ। তিনিও হাশিমী বংশের মহিলা ছিলেন।

ইসলামগ্রহণ

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সময় হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বয়স ৯ কিংবা ১০ হবে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি এক রাত্রে লক্ষ্য করলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা অজু করে নামায আদায় শেষে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন আছেন। এ

---

[৯] এখানে উল্লেখ্য যে, চিশতিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি তরিকা হযরত আলী মুর্তাজা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ফায়েজ ও বরকতের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে।

দৃশ্য দেখে বালক আলীর মনে আনন্দের বন্যা বইতে লাগলো। এমন সুন্দর, আত্মিক প্রশান্তপূর্ণ ক্ষণ তাঁর জীবনে ইতোমধ্যে কখনো তিনি উপলব্ধি করেন নি। এভাবে ইবাদাতের গুঢ় রসহ্য সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর কচি মন আন্দোলিত হয়ে উঠলো।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবকিছু জিজ্ঞেস করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সবকিছু বুঝিয়ে বলার পর বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান বালক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু আর কালবিলম্ব না করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইসলাম ধর্ম কবুল করে নিলেন। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা যে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তবে পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম মুসলমান ছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত আলী এবং হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম, এই তিন জনই প্রথম মুসলমান হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি উত্তম সমাধান হলো, বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, দাসদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু (পরবর্তীতে তাঁকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত করে দেন) এবং বালকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান ছিলেন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

তুমি আমার ভাই, তুমি আমার উত্তরাধিকারী

হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বয়স মাত্র ১৫ বছর। নুবুওয়াত লাভের প্রাথমিক দিকে একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের একটি টিলায় দাঁড়িয়ে ৪০ ব্যক্তির সামনে কথা বললেন। এই দলে কুরাইশদের হাশিমী শাখার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আমীর হামযা, আব্বাস, আবু তালিব এবং কিশোর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, “হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সম্মুখে দুজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ হাজির করেছি। বলো, তোমাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে এবং কে আমাকে সাহায্য করবে?”

কেউ কথা বলছিলো না। এরূপ নীরবতা দেখে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সহ্য হলো না, বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখানে সবার ছোট এবং এখনও দুর্বল। এরপরও আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আমি আপনার সাহায্যে অটল ও আস্থাশীল থাকবো"। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রতি অত্যন্ত খুশী হলেন। তবে তিনি চাচ্ছিলেন অন্যরা কী জবাব দেন তা জানতে। তাই আবার একই প্রশ্ন করলেন। এবারও সবাই নীরব। তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকলো। কিন্তু আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু পুনরায় দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারায় বসিয়ে দিলেন। সবার মধ্যে নীরবতা লক্ষ্য করে আবারো তিনি একই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! একটা লোকও কিছু বললো না। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সহ্য করতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সাহায্য করবো, আপনার প্রতি আস্থাশীল থাকবো"।

কিশোর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এরূপ বক্তব্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশী হয়ে বললেন, "হে আলী! সত্যিই তুমি আমার ভাই, তুমি আমার উত্তরাধিকারী"।

হিজরতের পর মদীনার আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। মুহাজিরদের সকলেই নিজেদের আনসার ভাই পেয়ে গেলেন কিন্তু বাকী রইলেন একমাত্র আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কিছুটা ম্লান বদনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবাই তাদের ভাই পেয়ে গেলো- কিন্তু আমি তো পেলাম না"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আদর করে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমার সাথে ইহ-পরকালে ভাইয়ের সম্পর্ক তো আমার আগে থেকেই রয়েছে। আজ হতে তুমি জেনে রাখো, আমি তোমার ভাই"। এ সংবাদে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর অন্তরাত্মায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। অনন্তর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উত্তোলন করে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আলী আজ হতে আমার একান্ত আপন, আর আমিও তার একান্ত আপন। আমি তাকে ভালোবাসি।"

ইলমের সাগর

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু যে ইলমে দ্বীনের সাগর ছিলেন তার স্বীকৃতি এসেছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি বলেছেন:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

"আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী এর দরজা"। (তাবারানী, মুসতাদারাকে হাকিম, মা'রিফাতুস-সাহাবা- আবি নুয়াঈম)

হযরত আলীর বোধশক্তি, হাক্বিকাতের ব্যাখ্যা ইত্যাদি ছিলো অদ্বিতীয়। তিনি সুলেখকও ছিলেন। এছাড়া কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর আত্মত্যাগ ও কুরবানী ছিলো রীতিমতো বিস্ময়কর। হিজরতের প্রাক্কালে যে রাতে মক্কার কাফিরগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, সে রাতে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজীর বিছানায় শুয়ে থাকার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। কাফিররা তাঁকে যে হত্যা করতে পারে তা তিনি জানতেন, তথাপি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের নিরাপত্তার সম্মুখে নিজের জীবন তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেছিলেন। তাঁর এই কাজটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে ফিরিশতাদের নিকট গর্ব করেছিলেন।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি শের-ই-খোদা [আল্লাহর ব্যাঘ্র] হিসাবে সুপরিচিত। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদর, উহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, খায়বার ইত্যাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁরই হাতে বিজিত হয়েছিল। আমরা এই ঘটনাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

সুফিদের সর্দার হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

অধিকাংশ সুফি তরিকা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলমে মা'রিফাতের সুধা আহরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, ধর্মের মূল হলো আল্লাহর পরিচিতি তথা মা'রিফাত লাভ করা। তিনি বলেন,

"মা'রিফাতের উচ্চতর মাক্বাম হলো তাঁর (আল্লাহর) অস্তিত্বের প্রমাণ; অস্তিত্বের প্রমাণের উচ্চতর মাক্বাম হলো তাওহিদ; তাওহিদের উচ্চতর মাক্বাম হলো সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আধিপত্যের স্বীকৃতি। তিনি (আল্লাহ) সকল গুণাবলীর ঊর্ধ্বে। কোনো বিশেষ গুণ তাঁর সঠিক স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক নয়। তিনি কোনকিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত নন। কিন্তু সবকিছুকে তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অসীম, সীমাহীন, সময়ের ঊর্ধ্বে, স্থানের ঊর্ধ্বে, কল্পনার বাইরে। সময় তাঁর উপর ক্রিয়া করে না। যখন কোনকিছু ছিলো না তখন তিনি ছিলেন, তিনি অনন্তকাল অস্তিত্বশীল থাকবেন। জন্ম-মৃত্যুর আইন-কানুন তাঁর অস্তিত্বের জন্য প্রযোজ্য নয়। তিনি সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান অথচ কোনকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি কোন কিছুর কারণ নন, অথচ সবকিছুর কারণ তিনি। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টি করেন ধ্বংসও করেন। সবকিছু তাঁর নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। তিনি কোনকিছু সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু নির্দেশ দেন (كُنْ- হও!) এবং তা হয়ে যায় (فَيَكُونُ)।"

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বাপেক্ষা নিষ্কলুষ জিনিস কি যা অর্জন সম্ভব? তিনি জবাব দিলেন, "এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক আলোকিত হৃদয়"।

মা'রিফাত কী? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "আল্লাহকে আল্লাহর মাধ্যমে জানা, যা আল্লাহর মাধ্যমে নয় তা আল্লাহর নূরে জানা।"

যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, "অবশ্যই! তাঁকে না জানলে আমি কিভাবে তাঁর উপাসনা করবো?"

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নামায

কথিত আছে তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কলা পাতার মতো তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হতো। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "একটি আমানত পূর্ণ করার সময় এসেছে। যে আমানতকে আকাশ-পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে নি- কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করেছে।" হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু

আনহু বলেছেন, "হযরত আলীর মতো এই পৃথিবীতে কেউ এমন উচ্চমানের নামায আদায় করতে পারে নি।"

নামাযের সময় তাঁর অবস্থা এমন হতো যে, তিনি প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যেতেন। একদা হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অজ্ঞান অবস্থায় নামাযের মুসাল্লায় পড়ে আছেন দেখে ভাবলেন, তিনি বুঝি এই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছেন! হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তখন জানালেন যে, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায়ই এভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এটা তাঁর জন্য স্বাভাবিক। হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা শ্রবণ করে কাঁদতে শুরু করলেন এবং কিছু পানি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দিলেন। এতে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলো। তিনি আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ক্রন্দন করছো কেন? এই অবস্থায় আমাকে দেখে তোমার চোখে অশ্রু এসেছে। কিন্তু ভেবে দেখো, যেদিন ফিরিশতারা টেনেহেঁচড়ে আল্লাহর সম্মুখে নিয়ে যাবে এবং আমাকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন আমার কি অবস্থা হবে? তাঁরা আমাকে লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে নেবে আল্লাহর সম্মুখে এবং আমার বন্ধুদের যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে, কিছুই করার শক্তি রাখবে না। তারা কোনো সাহায্যে আসবে না- একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহই সেদিন আমার কাজে আসতে পারে।"

ফানাফিল্লাহ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফানাফিল্লাহর সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেছেন, "আল্লাহর অনন্ত মহাসাগরে মানুষ একটি ঢেউ মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তরাত্মা অজ্ঞতা ও জৈবিক ক্ষুধা দ্বারা অন্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে আলাদা সত্তা হিসাবে অনুভব করতে থাকবে। কিন্তু সে ও প্রভুর মধ্যকার হিযাব বা পর্দা যখন উঠে যাবে তখন সে সত্যিকার হাক্বিকাত সম্পর্কে অবহিত হবে। তখন সেই ঢেউ সাগরের সাথে মিশে যাবে"।

তিনি সর্বদাই বলতেন, মানুষকে প্রথমে নিজের পরিচয় অর্জন করতে হবে। আর নিজেকে না চিনে প্রভুকে জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং এই জানার প্রথম স্তর হলো শরীয়তের অনুসরণ। শরীয়তের ভেতরই তাসাওউফ বিদ্যমান।

জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর উপর গুণিজনের মন্তব্য

হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার স্বামী ছিলেন। তবে তিনি কিভাবে নবী-দুলালীর স্বামী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন সে ঘটনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

কথিত আছে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীর সামনে ঘোষণা দিলেন, "যে কেউ সবার আগে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করে আসতে পারবে, তারই নিকট আমার মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে দেবো।" সবাই দ্রুত কুরআন তিলাওয়াতে লেগে গেলেন। কিন্তু দেখা গেলো হযরত আলী কিছুক্ষণ পরই হযরতের নিকট এসে হাজির হয়ে গেছেন! আশ-পাশে তখনও কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন সাহাবারা আশ্চর্যবোধ করলেন, সবাই হযরত আলীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি, তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। আর তিলাওয়াতের মধ্যে সওয়াবই মূখ্য উদ্দেশ্য- সুতরাং আমি তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে চলে এসেছি!" একথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঠোঁটদ্বয়ে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমিই আমার মেয়ের স্বামী হওয়ার যোগ্য।

তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব যে পাওয়া যায়, তা সহীহ ইবনে হিব্বানে শুদ্ধ রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

দাওয়াতী কাজেও তাঁর জুটি ছিলো না। দশম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ইয়ামনে প্রেরণ করেন। এই অভিযানের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো ইয়ামনবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা। হযরত খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হলেন। কেউই মুসলমান হলো না। শেষ পর্যন্ত রমযান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে এই মিশনে প্রেরণ করলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাঁর পবিত্র হাত মুবারক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বুকের উপর রেখে দু'আ করলেন। তিনি ইয়ামনে পৌঁছে দাওয়াতী কাজ

শুরু করতেই ইয়ামনবাসী অবিশ্বাস্যভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন "আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু উম্মত হলেন আবু বকর; আল্লাহর দ্বীনের উপর একনিষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন উমর; সর্বাপেক্ষা বিনয়ী হলেন উসমান; এবং আলী হলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম জ্ঞানের অধিকারী"।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হযরত আবু আবদুল্লাহ জাদালীকে একদা বললেন, "[কুফায়] আল্লাহর রাসূলকে কি কেউ অপমান করছে?" তিনি বিস্ময়ে জবাব দিলেন, "আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি!" উম্মুল মু'মিনীন আবার বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে কেউ আলীকে অপমান করে, আমাকেই অপমান করে'।"

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানবান ব্যক্তি হচ্ছেন আলী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) এবং উবাই ইবনে কাব (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) হলেন কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে সর্বাধিক দক্ষ।" হযরত আলী সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে 'খারিজী' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এই দলটিই ছিলো ইসলামের প্রথম চরমপন্থী বিদআতী। এরা বিশ্বাস করতো, সকল পাপীই কাফির এবং যারা তাদের এই আক্বীদায় বিশ্বাস রাখে না, তারাও কাফির। তাদের এই ভ্রান্ত আক্বীদার উপর ভিত্তি করে তারা মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করতো না। তাদের দলে যোগ দেওয়ার একটি শর্ত ছিলো, প্রথমে নিজেকে অমুসলিম ঘোষণা করে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হতে হবে।

এই খারিজীরা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আমর ইবনে আ'স রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একই সঙ্গে হত্যার এক

গুরুতর ষড়যন্ত্র করে। তারা তিনজন ঘাতককে এই দায়িত্ব অর্পণ করে। এরা ছিলো: আমর ইবনে বকর তামিমী, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিরিয়ার মসজিদে যেয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করা; দ্বিতীয় জনের নাম ছিলো, বকর ইবনে আবদুল্লাহ তামিমী। সে দায়িত্ব নেয় মিসরে যেয়ে হযরত আমর ইবনে আসকে হত্যা করার এবং তৃতীয় ঘাতকের নাম ছিলো আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম। সে দায়িত্ব নেয় কুফার মসজিদে যেয়ে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে হত্যা করতে।

তিন জনের মধ্যে একমাত্র মুলজাম সফলকাম হয়েছিল। সে তার শপথ অনুযায়ী ১৭ রমযান বদর দিবসে রোজ শুক্রবার ফজরের নামাযে মসজিদে অবস্থান নেয়। সে সারা রাতই মসজিদে থেকে হত্যার ফন্দি আঁটছিলো অন্যান্য খারিজীদের সঙ্গে। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মসজিদের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন সেখানে ইবনে মুলজাম ও তার এক সহযোগী আত্মগোপন করে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। এদিকে হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহুর) সারারাত ঘুম হয় নি। একবার সামান্য চোখ লাগতেই তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি এই স্বপ্নের বর্ণনা স্বীয় পুত্র হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাবা হাসান, আমি তোমার নানাজানকে দেখলাম, তাঁকে সবিনয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উম্মত দ্বারা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। তিনি জবাব দিলেন, দু'আ করো আল্লাহ তা'আলা যেনো তোমাকে শীঘ্রই তাদের কবল থেকে মুক্ত করেন। তিনি বলেন, মহানবীর পরামর্শ অনুযায়ী আমি ঠিক এই দু'আ করলাম।

হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু সে-ই চরম বেদনাময় ক্ষণটি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন, আমি আব্বাজানের হাত ধরে যেই মাত্র মসজিদের ভেতর পা দিয়েছি, তখনই দেখলাম দু'টি তরবারি একসাথে চমকে উঠেছে। শাবির নামক অপর ঘাতকের আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও ইবনে মুলজাম সফল হলো। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মস্তক প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। তিনি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি। ঘাতককে তোমরা পাকড়াও করো! শাবির ও ইবনে মুলজাম উভয়ই ধরা পড়ে গেল। ইতোমধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে গৃহে নিয়ে যাওয়া হলো।

তাঁর নির্দেশে ঘাতক ইবনে মুলজামকে সামনে হাজির করা হলে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তোর উপর আমার কোনো অনুগ্রহ নেই কি?

ইবনে মুলজাম স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিল। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাকে আর কিছু না বলে স্বীয় পুত্র হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, বাবা! ইবনে মুলজাম এখন বন্দী তাই তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আমি বেঁচে থাকলে তার দণ্ড আমিই দেবো। এটুকু বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এরপর আবার তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলো। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও অপর পুত্র মুহাম্মদ বিন হাফিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে উপদেশ দিলেন। উপস্থিত মুসলমানদেরকেও কিছু নসিহত করলেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁর দেহখানা শীতল হয়ে এলো। তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। সবার মুখে উচ্চারিত হলো অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে সেই বাক্য:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৩ বছর বয়সে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর খিলাফতকাল ৪ বছর ৯ মাস স্থায়ী ছিলো। ঘাতক ইবনে মুলজামকে শরয়ী আইন মুতাবিক মৃত্যুদ দণ্ডিত করা হয়।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মূল্যবান উপদেশ বাণী

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলমানদের জন্য মহামূল্যবান অনেক উপদেশ বাণী রেখে গেছেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত এসব বাণীর একটি তালিকা নীচে পেশ করা হলো।

১. তিনি বলেন, তোমরা জ্ঞানার্জন করো- তাহলে আল্লাহর মা'রিফাত ও তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পাবে। মনে রেখো, তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে যখন সত্যের দশ ভাগের নয় ভাগই মানুষ অস্বীকার করবে। একমাত্র আল্লাহমুখী, তাওবাকারী ছাড়া কেউই এই ফিৎনা থেকে রেহাই পাবে না।
২. হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সাবধান! দুনিয়া বিদায় নিচ্ছে আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার হয়ো না।

৩. সাবধান! যারা দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ তারা মাটিকে বিছানা ও ধূলাকে বিছানার চাদর রূপে গ্রহণ করে। তারা পানিকে সুগন্ধিরূপে বরণ করে।

৪. আখিরাতমুখিরা কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকে। যে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে তার নিকট যাবতীয় সমস্যা অতি তুচ্ছ মনে হয়।

৫. জেনে রাখো, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন যারা জান্নাতীদের ও জাহান্নামীদের বসবাস করতে দেখেছেন। এসব মহাত্মনদের অন্তর-আত্মা পূত-পবিত্র। তাঁদের পার্থিব চাহিদা খুব সীমিত।

৬. একদিন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসাবাণী উচ্চারণের পর মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! মৃত্যুকে ভয় করো। তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে চাইলে, সেটি তোমাদেরকে খুঁজে বের করবে। সুতরাং পরকালীন মুক্তি চাও, পরকালীন মুক্তি কামনা করো। জলদি করো, জলদি করো। কবরের মাটি তোমাদেরকে পেছন থেকে তাড়া করছে।

৭. কবর হয়তো আগুনের গর্ত অথবা বেহেশতের বাগান হবে। জেনে রেখো প্রতিটি কবর দৈনিক তিন বার কথা বলে। সে বলে, আমি অন্ধকার, পোকা-মাকড় ও একাকীত্বের ঘর।

৮. সত্য যার কল্যাণ করতে পারে না, মিথ্যা তার অকল্যাণ করবেই। হিদায়াত যাকে সরল পথে আনতে পারে না, গোমরাহী তাকে বাঁকা পথে নিয়ে যাবেই।

৯. দুনিয়া হচ্ছে নগদ পণ্য। পুণ্যবান ও পাপাচারী সবাই তা থেকে খায়।

১০. কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ সৎ ব্যক্তিকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দীর্ঘ কামনা ও আশা মানুষকে আখিরাতের কথা থেকে গাফিল করে দেয়।

১১. ক্ষেত দু'প্রকার: দুনিয়ার ক্ষেত আর আখিরাতের ক্ষেত। দুনিয়ার ক্ষেত হলো ধন-সম্পদ ও তাকওয়া, আর আখিরাতের ক্ষেত হলো জমা থাকা সৎকর্মগুলো। কতেক লোককে মহান আল্লাহ উভয় ক্ষেতের মালিক বানিয়ে দেন।

১২. দুনিয়া হলো গলিত শব এবং একে যারা ভালোবাসে তারা হলো কুকুর। যে কেউ এই দুনিয়া থেকে কিছু পেতে ইচ্ছুক সে যেনো নিজেকে কুকুরদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেয়।

হযরত শায়খ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(জন্ম ২২ হিজরী - মৃত্যু ১১০ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো হাসান ইবনে আবুল হাসান ইয়াসির আবু সাঈদ বসরী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবিঈ, ফকীহ, বসরার ইমাম, সুফিদের সর্দার এবং তাঁর যুগের আলীমদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতার নাম ছিলো ইয়াসির। তিনি ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়িদ ইবনে তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। হযরত হাসান বসরীর মাতার নাম ছিলো খায়রাহ। তিনিও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মুক্তিপ্রাপ্তা ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁর জন্মের পর মাতা খায়রাহ তাঁকে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে যান এবং দু'আ কামনা করেন। তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দিলেন এরপর দু'আ করলেন: "হে আল্লাহ! একে ইসলামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করো, মানুষের নিকট সে হয়ে উঠুক প্রিয়।" তিনি আরো বললেন, "এর নাম রাখো হাসান, কারণ তার চেহারা খুব সুন্দর"।

উম্মত জননী হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নিজেই হযরত হাসান বসরীকে শিশু থাকাকালে লালন-পালনে সহায়তা করেছিলেন। মাতা খায়রাকে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকতে হতো, তখন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হাসান বসরীকে নিজের স্তন্যদান করে শান্তি রাখতেন। এভাবে শিশু হাসান বসরী নবী-পরিবারের একজন নারীর দুধপান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের কঠোর অনুসারী ছিলেন। এছাড়া প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও সাধনার ক্ষেত্রে তিনি সে যুগে খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে সবার নিকট সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি অবশ্য সুফিদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। সারা জীবন একটিমাত্র পশমী জুব্বা পরে কাটিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন: "আমি হাসান ও ইবনে সীরীন এই দু'ব্যক্তির কারণে বসরাবাসীদের প্রতি ঈর্ষা করি!" প্রখ্যাত স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা ও তাবিঈ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। হযরত আবু কাতাদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "আমি যতো ফকীহ ব্যক্তির সঙ্গে বসেছি, তাদের মধ্যে সবার সেরা

হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পেয়েছি। আমার চোখ তাঁকে অপেক্ষা বড় ফকীহ আর দেখে নি।"

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "ইতিহাসবিদগণের মতে, হাসান বসরী ইলম ও আমলের সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি ছিলেন আলিম, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, ফকীহ, নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ, অধিক ইলম ও আমলের অধিকারী, স্পষ্টভাষী, সুশ্রী ও সুদর্শন। একবার তিনি পবিত্র মক্কায় গমন করে মঞ্চে উপবেশন করেন। আলিমগণ তাঁর চারপার্শ্বে বসেন এবং জনতা এসে তাঁর নিকট ভিড় জমায়। তিনি তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন।" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া - বঙ্গানুবাদ)

বাইআত

হযরত আবু যুরআহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্র ১৪ বছর বয়সে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত হন। এরপর তিনি কুফা ও বসরাতে চলে যান।

সালফে সালিহীন মহাত্মনরা হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একজন 'আবদাল' ওলি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একটি হাদীসে আছে: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "পৃথিবীর জমিনে চল্লিশ ব্যক্তি সর্বদাই জীবিত থাকবেন যারা হবেন (ইব্রাহীম) খলীলুল্লাহর মতো। এদের মাধ্যমেই মানুষ বৃষ্টি (অর্থাৎ রাহমাত) এবং সাহায্য পাবে। কেউ মারা গেলে তার বদলে আরেক জনকে আল্লাহ তা'আলা নিযুক্ত করে দেন।" হযরত আবু কাতাদা (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বলেন, "আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, হযরত হাসান বসরী সেই আবদালদের একজন।" (তাবারানী)

তাবিঈনদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এই মহাত্মন ওলিআল্লাহ অন্তত ১৪০০ হাদীসের বর্ণনাকারী। তিনি বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী বিন আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণ মিলে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম সূয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে দলীল

পেশ করে মন্তব্য করেছেন যে, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সরাসরি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "একদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি বিচারকার্যে হাসান বসরীর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন"। (মুসান্নাফ, ৭ : ৪১২)

অলিআল্লাহদের প্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ 'হিলায়াতুল আওলিয়া' এর প্রণেতা আবু নু'আইম ইসফাহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ হযরত ওয়াহিদ ইবনে যায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ: ১৭৭) সর্বপ্রথম আবাদান নামক শহরে সুফিদের 'খানক্বাহ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (হিলায়াতুল আওলিয়া, ৬ : ১৫৫) হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর মুরীদানের ব্যাপক সুনাম তখনকার বসরা ও আশপাশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ কারণেই পরবর্তীতে ইবনে তাইমিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আস-সুফিয়্যা ওয়াল ফুক্বারা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, "তাসাওউফের উৎসস্থল হলো বসরা"। তবে অধিক সত্য কথা হলো, বসরা ছিলো তাসাওউফশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক তথা আত্ম-সংযম, সাধনা, আত্ম-শুদ্ধি এবং অন্যান্য জরুরী মানবিক গুণাবলী অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের স্থান। এর অর্থ এটা নয় যে, অন্যত্র এসব গুণাবলী অর্জনের জন্য মুসলমানরা তখন সম্পূর্ণ গাফিল ছিলেন। কারণ তাসাওউফের যাবতীয় মূলসূত্র পবিত্র কুরআন ও হাদীস ছাড়া আর কিছু নয়।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন, সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তিরা এ পৃথিবীতে দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করেন না। তিনি বলেন, "আমাদের লবণ গায়েব হয়ে গেছে; আমাদের মধ্যে ভালো বলতে কী আর অবশিষ্ট আছে?" (নাসিম আর-রিয়াদ, ৩:৪৬০) উল্লেখ্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার সাহাবীদের তুলনা হলো খাদ্যের মধ্যে লবণের মতো। খাদ্য লবণ ছাড়া মোটেই ভালো নয়।" হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীস শরীফের অনুসরণেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, "আমরা হাসতে আছি, অথচ কে জানে, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের কিছু আমলের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং বলছেন, "আমি তোমাদের পক্ষ থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না।" হে আদম সন্তান! তোমার প্রতি ধিক্কার! তুমি কী কখনো আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া

করতে পারবে? কারণ যে কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে ঝগড়া করে। আল্লাহর শপথ! আমি ৭০ জন বদরী মহাত্মন সাহাবার সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তাঁদের অধিকাংশের পরনে ছিলো পশমী কাপড়ের জুব্বা। তুমি যদি তাঁদের দেখতে তাহলে বলতে, তাঁরা পাগল। কিন্তু তাঁরা যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিটিকেও দেখতেন তাহলে বলতেন, "এই লোকগুলোর জন্য আখিরাতে কোনো হিস্সা থাকবে না!"। আর তোমাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা খারাপ ব্যক্তিটিকে দেখলে তাঁরা বলতেন, "এই লোকগুলো কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না!"। আমি এমন মহাত্মনদের দেখেছি যাঁদের জন্য এই পৃথিবীর মূল্য তাঁদের চরণধূলি থেকেও কম ছিলো। আমি ঐসব ব্যক্তিকে দেখেছি যারা রাতে গৃহে প্রবেশ করে নিজের অল্প খাবার হাতে নিয়ে বলেছেন, আমি এই খাবারের সবটুকু পেটের ভেতর ঢুকাবো না। এ থেকে কিছুটা অবশ্যই আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে দান করবো। এরপর তিনি কিছুটা খাবার দান করে দিলেন, যদিও এর চাহিদা প্রাপ্ত ব্যক্তির তুলনায় নিজের অনেক বেশী ছিলো।" (হিলায়াতুল আওলিয়া, ২:১৩৪)

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন ইমাম আবু হামিদ গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইহ্ইয়া-উলূমিদ্দিন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মানুষের আত্মার মধ্যে দু'টি চিন্তা ঘোরাফেরা করে। এর একটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা থেকে আর অপরটি দুশমন থেকে উদ্ভুত। যে চিন্তাটি আল্লাহর কাছ থেকে আসে, যদি বান্দা তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে সক্ষম হয় তবে তিনি (আল্লাহ) এই বান্দার উপর স্বীয় রহমত নাজিল করেন। এই বান্দা দুশমন থেকে আগত চিন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই দু'টি শক্তিশালী চিন্তার প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'ঈমানদারের হৃদয় মহান দয়ালুর দু'টি অঙ্গুলির মধ্যখানে অবস্থান করে'। অঙ্গুলি অর্থ হৃদয়ের মধ্যস্থ উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা। মানুষ যদি রাগ ও চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে, শয়তানের প্রভাব তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং তার হৃদয় শয়তানের আস্তানা ও পাত্রে পরিণত হয়। শয়তানের খাদ্য হলো 'হাওয়া' বা জাগতিক আকর্ষণ। যদি মানুষ তার জাগতিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে এবং নফসকে তার দ্বারা প্রভাবিত হতে বিরত রাখতে সক্ষম হয় তাহলে, সে ফিরিশতাসূলভ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। তখন তার হৃদয় ফিরিশতাদের বিশ্রামাগারে পরিণত হবে। তাদের নূরে হৃদয়টা আলোকিত হয়ে ওঠবে।"

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উদ্ধৃত অপর একটি বর্ণনা থেকে আমরা হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাহাত্ম্যের প্রমাণ পাই। তিনি বলেন, “গাফিলতা ও আশা হলো আদম সন্তানের উপর দু’টি বিরাট নিয়ামত; এগুলো না থাকলে মুসলমানরা রাস্তায় চলতে অপারগ হতো।”

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

“কখনই নয়, তাঁর উভয় হস্ত প্রশস্তভাবে বিস্তারিত, এবং তিনি ইচ্ছামতো প্রদান করেন..” (৫:৬৪)

-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াত আল্লাহর দয়া ও মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আল্লাহর ‘ক্বদম’ (পা) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো ‘ওরা, যাদেরকে তিনি পাঠিয়েছেন’। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “দোযখের অগ্নি বার বার প্রশ্ন করতে থাকবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত মহান প্রভু তাঁর কুদরতি ক্বদম এতে রাখবেন। তখন দোযখ বলবে, যথেষ্ট! যথেষ্ট! এবং এর সকল অংশ একত্রিত করবে। বেহেশতে তখনো অনেক স্থান বাকী থাকবে। এরপর আল্লাহ পাক একটি নতুন সৃষ্টি শুরু করবেন যা তিনি বেহেশতের বাকী অংশে রাখবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির সুপারিশে রাবি’আ ও মুদার গোত্রের সমপরিমাণ মানুষকে আল্লাহ পাক বেহেশত দান করবেন”। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী বলেন, “এই ভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত ওয়ায়িস কারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি”। (আহমদ)

একবার উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পত্র লিখলেন: দীনার-দিরহামের প্রতি আপনার ভালোবাসা কিরূপ? তিনি জবাব দিলেন: ‘আমি ওসব মোটেই ভালোবাসি না’।

আব্দুল আজিজ পুনরায় লিখলেন: আপনি শাসনভার গ্রহণ করুন। আপনি ন্যায়বিচার করতে পারবেন।

ইয়াযীদ ইবনে হাওশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি হাসান ও উমর ইবনে আব্দুল আজিজ অপেক্ষা চিন্তিত কাউকে দেখি নি। জাহান্নাম শুধু তাঁরা দু'জনের জন্যেই যেনো সৃষ্টি করা হয়েছে!

হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কারামত

১. পবিত্র হজ্জযাত্রায় একদল জ্ঞানী-গুণী মানুষ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। রাস্তার উপর একটি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে যেয়ে দেখা গেল পানির স্তর কূপের তলায়। আশেপাশে কোন দড়ি কিংবা বালতিও চোখে পড়লো না। তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বিষয়টি অবগত করলেন। তিনি বললেন, আমি যখন নামাযে দাঁড়াবো তখন তোমরা সেই কূপের নিকট যাবে।

তিনি কিছুক্ষণ পর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্দেশ মুতাবিক তারাও কূপের নিকট গেলেন। কী আশ্চর্য! সবাই লক্ষ্য করলেন, কূপটি এখন কানায় কানায় পানিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং সবাই ইচ্ছেমতো পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলেন। একজন কিছু পানি তুলে একটি পাত্রে জমা রাখলেন- পরে পান করবেন এই বাসনা নিয়ে। কিন্তু দেখা গেলো পানির স্তর আবার নেমে নীচে চলে গেছে- ঠিক আগের মতো। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো না, তাই এমনটি হয়েছে।

২. কাফিলা পবিত্র বাইতুল্লাহর পথে চলছে। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাস্তা থেকে কিছু খেজুর সংগ্রহ করে অন্যান্য সদস্যদেরকে খেতে দিলেন। তাঁরা তা খেয়ে অবাক দৃষ্টিতে বীচিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এগুলো দেখতে যে ঠিক স্বর্ণের মতো লাগে! ঠিক তা-ই ছিলো। মক্কা শরীফ পৌঁছে স্বর্ণকারের দোকানে যেয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখলেন, এগুলো সত্যিই খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে।

কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা

১. একদিন এক কুকুর দেখে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ইয়া আল্লাহ! পরকালে আমি কি এই কুকুরটির সঙ্গে হাশর করতে পারবো? তাঁর এই কথাটি একজন পথচারী শ্রবণ করে প্রশ্ন করলো, হুজুর! কুকুরটি আপনার চেয়ে উত্তম না অধম?

তিনি জবাব দিলেন, রোজ কিয়ামতে যদি মুক্তি পাই তাহলে নিজেকে কুকুরটির তুলনায় উত্তম বলতে পারি। আর যদি না পাই, তাহলে বুঝতে হবে সে আমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম।

২. একদা তিনি তাঁর এক নিন্দুকের বাড়িতে বেশ কিছু খেজুর তুহফাস্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, দেখুন জনাব! আমি শোনেছি আপনি আপনার আমলনামা থেকে অনেক নেকী আমারটিতে স্থানান্তরিত করছেন। সুতরাং এই কাজের বিনিময় হিসাবে কিছু নিয়ে এসেছি পুরস্কার হিসাবে!

৩. একদিন তিনি এক নপুংসকের কাপড় ধরে টান দিলেন। লোকটি বললো, আমার গোপন রসহ্য এখনো বাইরে প্রকাশ পয় নি- আপনি কি তা প্রকাশ করতে চান?

৪. এক মাতাল মধ্যপানের নেশায় টলতে টলতে রাস্তা অতিক্রম করছিলো। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, আরে মিয়া! সাবধানে পা ফেলো- নইলে আছাড় খাবে! সে জবাব দিলো, আমি আছাড় খেলে কী-ই বা হবে! কারো কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনি সঠিকভাবে চলবেন- আপনার মতো এতো বড় সাধকের চলার পথে বেশকম হলে অসংখ্য মানুষের ক্ষতি হবে কারণ, তারা তো আপনাকে ইত্তিবা করে।

৫. মোমবাতি হাতে নিয়ে চলছে এক বালক। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আলো কোথা থেকে আনলে? সে এক ফুঁৎকারে বাতিটি নিভিয়ে দিয়ে বললো, আগে বলুন এখন এটা কোথায় গেল? এরপর বলবো, তা কোথায় থেকে এনেছি!

অমূল্য উপদেশ বাণী

হযরত হাসান বসরী মানুষের জন্য রেখে গেছেন অসংখ্য উপদেশ বাণী। আমরা বিভিন্ন কিতাব থেকে নিম্নে বর্ণিত বাণীগুলো অত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করলাম। এগুলো পাঠ ও উপদেশ হিসাবে গ্রহণ করলে উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে হিদাআতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

১. কথা কম বলাই উত্তম। এক ব্যক্তি হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট এসে দীর্ঘক্ষণ কথা বললো। তিনি তাকে একটি ঘুষি মেরে বললেন: নিশ্চয় এর মধ্যে ফিতনা আছে।

২. ক্ষমার আশা ও রহমতের প্রত্যাশা একদল মানুষকে উদাসীন করে ফেলে। ফলে তারা কোনো নেক আমল ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তাদের কেউ বলতো: আমি মহান আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করি এবং মহান আল্লাহর রহমতের আশা করি। অথচ সে মিথ্যা বলেছে! যদি সে মহান আল্লাহ সম্বন্ধে ভালো ধারণা করতো, তাহলে অবশ্যই সে মহান আল্লাহর জন্য ভালো আমল করতো। আর যদি সে মহান আল্লাহর রাহমাতের আশা করতো, তাহলে অবশ্যই নেক আমলের মাধ্যমে সে তাঁর অন্বেষণ করতো। পাথেয় ও পানি ছাড়া বিজন মরু এলাকায় প্রবেশ করলে, ধ্বংস অনিবার্য।

৩. নিজের অন্তরের সঙ্গে মত বিনিময় করো। কারণ এগুলো দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমার নফসকে ঘৃণা করো- কেননা, তাকে চরম শোচনীয়ভাবে পাকড়াও করা হবে।

৪. মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম, আলিম যখন দুনিয়াকে ভালোবাসবে তখন তার পরিণতি কী হবে? তিনি জবাব দিলেন: আত্মার মৃত্যু। তার দুনিয়া অন্বেষণ হবে আখিরাতের বিনিময়ে। সুতরাং তার থেকে ইলমের বরকত উঠে যাবে এবং তার নিকট ইলমের বাহ্যিক রূপটাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

৫. রোগ হলো দয়ালু বাদশাহর পক্ষ থেকে একটি বেত্রাঘাত। রুগ্ন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পর হয়তো দ্রুতগামী ঘোড়ায় পরিণত হবে, না হয় পদস্খলিত দংশিত গর্দভে পরিণত হবে।

৬. মানবতা ছাড়া দ্বীন হয় না।

৭. ক্রন্দন মানুষকে রাহমাতের দিকে নিয়ে যায়। কাজেই যদি পারো, জীবনটা ক্রন্দনের মধ্যে কেটে দাও।

৮. মুসলমানের লক্ষণ হলো: দ্বীনে শক্তিশালী হওয়া, কোমলতা প্রদর্শনে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া, ইয়াক্বীনের সঙ্গে ঈমান থাকা, বিদ্যায় প্রজ্ঞাবান হওয়া, কোমল আচরণে কঠিন হওয়া, হকের পথে দান করা, স্বচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, অভাবে ধৈর্যধারণ করা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও অনুগ্রহ করা, আনুগত্যের সাথে হিতকামনা করা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাকওয়া অবলম্বন করা এবং বিপদে পবিত্রতা ও ধৈর্য ধারণ করা। মু'মিনের লক্ষণ হলো: তার উদ্দীপনা তাকে ধ্বংস করে না, তার

জিহ্বা তাকে ছাড়িয়ে যায় না, তার চক্ষু তাকে অতিক্রম করে না, তার গোপনাঙ্গ তাকে পরাজিত করে না, তার প্রবৃত্তি তাকে আকৃষ্ট করে না, তার রসনা তাকে অপদস্থ করে না, তার লোভ তাকে হীন করে না এবং তার নিয়ত ছোট হয় না।

১০. বান্দা যদি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যথাযথ বিশ্বাস লালন করে, তাহলে অবশ্যই সে বিনীত, বিগলিত, দৃঢ়পদ, সরল-সোজা হয়ে যাবে এবং এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে।

১১. আমি বিশ্বাস দ্বারা জান্নাত অন্বেষণ করেছি, বিশ্বাস দ্বারা জাহান্নাম থেকে পলায়ন করেছি, বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণরূপে ফরযসমূহ আদায় করেছি এবং বিশ্বাস দ্বারা সত্যের উপর অবিচল থেকেছি।

১২. বিপদ আসলে বুঝা যায়, কে আল্লাহর দাস আর কে গাইরুল্লাহর দাস।

১৩. তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ! পঁচন যেরূপ মানুষের দেহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গীবতও মু'মিনের দ্বীনের মধ্যে দ্রুত (ফিতনা) বিস্তার লাভ করে। তবে তিন শ্রেণির মানুষের গীবত হারাম নয়: প্রকাশ্য পাপকারী, অত্যাচারী শাসক ও বিদআতী।

১৪. কেউ যদি কোনো পাপ করার পর তওবা করে থাকে, আর অন্য কেউ তার বিরুদ্ধে এই পাপের অপবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে এই অপবাদকারী ঐ পাপ স্বয়ং নিজে না করা পর্যন্ত মরবে না।

১৫. মানুষকে তার আমল দ্বারা যাচাই করো- মুখের কথা দ্বারা নয়।

১৬. যার পরিধেয় পাতলা, তার দ্বীনও পাতলা। যার দেহ (অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের দরুন) মোটা, দার দ্বীন হলো জীর্ণ। যার খাদ্য যতো সুস্বাদু তার উপার্জন ততো গন্ধময়।

১৭. মু'মিনের মূলধন হলো দ্বীন। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন আছে, ততক্ষণ তার পুঁজি আছে। চলার পথে দ্বীন কখনো মু'মিনের বিপক্ষে কাজ করে না।

১৮. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ - "এবং আরোও শপথ তিরস্কারকারী আত্মার!"- এই আয়াতে করীমের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: তুমি এমন মু'মিনের সাক্ষাৎ পাবে না, যে তার আত্মাকে তিরস্কার করে না। সে বলে, আমি তো এ কথা বলতে চাই নি, এ খাবার খেতে চাইনি কিংবা এ মজলিসে বসার ইচ্ছে করি নি। কিন্তু অবিশ্বাসীরা পা পা অগ্রসর হয় কিন্তু স্বীয় আত্মাকে তিরস্কার করে না।

১৯. তাওবার দ্বারা আল্লাহর দরবারে মানুষের মর্যাদা বাড়তে থাকে।

২০. বন্ধু-বান্ধবের জন্য কে কতটুকু খরচ করলো আর নিজের মা-বাবার জন্য কতটুকু খরচ করলো তার হিসাব আল্লাহ তা'আলা খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রাখেন।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন: হাসান ইবনে আবুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একশত দশ হিজরী সনের রজব মাসে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে লোকে দেখলো তিনি মৃদু হাসছেন। এতে সবাই অবাক হলো কারণ তিনি জীবনে কোনদিন হাসেন নি। তিনি বার বার বলছিলেন, সে কোন্ পাপটি, কোন্ পাপটি?

মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে হাসি ও কোন্ পাপটি? এ প্রশ্নের রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুকালে আমি শুনতে পেলাম কে যেনো প্রাণ সংহারকারী ফিরিশতাকে বলছে, একটু কষ্ট দিয়ে তার প্রাণ বের করো। তার একটি গুনাহ রয়েছে। এ কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম এ ভেবে যে, তাহলে আমার বাকী সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। একটি মাত্র বাকী আছে যা মৃত্যুর কষ্ট দ্বারা মুছে যাবে। এজন্যই আমি এভাবে হেসেছিলাম।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অসংখ্য মুরীদান এবং বেশ ক'জন খলীফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শাজারায় হযরত শায়খ হাবিব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম আসে। সুতরাং এখন আমরা তাঁরই জীবনালোচনায় মনোনিবেশ করছি।

হযরত শায়খ হাবিব ইবনে মুহাম্মদ আজমী বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু: ১২০ হিজরি, সমাধি: বাগদাদ, ইরাক্ব।)

তাঁর জন্মস্থান ছিলো পারস্যে। তবে ইরাকের বসরা শহরে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে হাদিস বর্ণনাকারী ও সুফি দরবেশ। স্বীয় শায়খ মহাত্মন হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ ও ইবনে সিরীন রাহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্য হাদিস বিশারদদের থেকে তিনি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। প্রাথমিক জীবনে হযরত হাবিব আজমী ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুদের ব্যবসা করতেন। ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী এ রাস্তা থেকে বিলায়াতের উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হওয়ার এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী বিখ্যাত জীবনীকার হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুদখোর থেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা

সুদী ব্যবসার সাথে জড়িত হাবিব আজমী বসরা শহরের সর্বত্র স্বীয় মক্কেলদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতে প্রায় দিনই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর মক্কেলদের কেউ টাকা দিতে অপারগ হলে জুতো তৈরির চামড়া সংগ্রহ করতেন। একদিন তিনি তাঁরই নিকট থেকে উচ্চ সুদের হারে ঋণগ্রস্ত এক লোকের সাথে দেখা করতে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিলো ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করা। কিন্তু লোকটি বাড়িতে ছিলো না। তিনি ঋণগ্রহিতার স্ত্রীকে কড়া নির্দেশ দিলেন: "জুতার জন্য চামড়া দাও!"

মহিলা জবাব দিলেন: "আমার স্বামী বাড়িতে নেই। আমার নিকট দেবারও কিছু নেই। আমরা একটি বকরি জবাই করেছিলাম। একমাত্র মাথাটা আছে- আপনি পছন্দ করলে এটাই নিয়ে যান।"

হাবিব আজমী ভাবলেন, কী আর করা যায়? অন্তত এ মাথাটার চামড়া নিয়ে যাই। বললেন, "আপনি হাড়িতে আগুন দিন।"

মহিলা বললেন, "আমাদের না আছে রুটি আর না কেনো জ্বালানি কাষ্ঠ।"

তিনি বললেন: "ঠিক আছে। আমি বাইরে যাচ্ছি, নিয়ে আসছি জ্বালানি কাষ্ঠ ও রুটি।"

সুতরাং, হাবিব আজমী বেরিয়ে গেলেন। রুটি ও জ্বালানি কাষ্ঠ নিয়ে আসলেন। মহিলা উনুনে হাড়ি বসাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রান্না প্রস্তুত হওয়ার পরই কিন্তু এক ফকির এসে দরোজার কড়া নাড়লো।
হাবিব দরোজা খুলে ফকিরকে ধমক দিয়ে বললেন, "এ মিয়া! আমাদের নিকট থেকে কিছু তোমাকে দিলে, তুমি তো আর ধনী হবে না- অথচ আমরা কিছুটা গরীব হবো ঠিকই! যাও এখান থেকে!"

ফকির হতাশ হয়ে মহিলাকে আবদার জানালো, "আমার পাত্রে কিছুটা খাবার দিন, মা!"
মহিলা তার হাড়ির ঢাকনা উঠালেন। ইয়া আল্লাহ! একী? হাড়ির ভেতর যে শুধুমাত্র কালো রক্ত! তিনি দরোজার নিকট ছুটে গেলেন। হাবিবকে টেনে হাড়ির কাছে নিয়ে আসলেন। বললেন: "দেখো, দেখো! তোমার অভিশপ্ত সুদী কারবার ও ফকিরের প্রতি দুর্ব্যবহার হেতু আমাদের কী সর্বনাশ হয়েছে!" মহিলা কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "হায়, হায়! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে গেলো!"

ঘটনার আকস্মিকতায় হাবিব আজমীর অন্তরে প্রচণ্ড ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। এর প্রভাব থেকে তিরি আর মুক্ত হতে পারলেন না। মহিলাকে বললেন, "হে নারী! আমি যা করেছি তার জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করলাম।" একথা বলে মহিলার ঘর থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন। তিনি কিন্তু তখনও সুদী ব্যবসার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হন নি।

পরদিন পুনরায় তিনি মক্কেলের খুঁজে বের হলেন। সেদিন ছিলো পবিত্র জুমুআ বার। বসরার রাস্তায় শিশু-কিশোররা খেলাধূলা করছিলো। হাবিবকে দেখেই তারা চিৎকার দিলো: "এই তো আসছে সুদখোর হাবিব! দৌড়ে পালাও। তার পদধূলি আমাদের গায়ে লাগলে সবাই তার মতো পাপী হবো!"

বাচ্চাদের তিরস্কার হাবিবকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতবিক্ষত করলো। তিনি সামনেই স্থাপিত একটি বড়ো কক্ষে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, অনেক লোক এক বুজুর্গের বয়ান শ্রবণ করছেন। কিছুক্ষণ বয়ান শুনার পর হঠাৎ তার মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বয়ানকারী বুজুর্গ ছিলেন বিখ্যাত তাবিয়ী হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি স্বীয়

কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করলেন। এদিকে হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর নজরে পড়লো হাবিব আজমীকে। এগিয়ে এসে তাঁকে হাতে ধরে ওঠালেন। সান্ত্বনা দান করলেন। মুবারক এ সাক্ষাতের পর বাড়িতে ফেরার পথে পথিমধ্যে একজন সুদ গ্রহিতা ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখেই সে ছুটে পালালো। হাবিব লোকটিকে ডাক দিলেন: "থামো! তোমাকে আর আমার কাছ থেকে ছুটে পালানোর প্রয়োজন নেই। এখন সময় এসেছে আমাকে তোমার নিকট থেকে ছুটে পালানোর!"

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন, সে-ই শিশু-কিশোররা তখনও খেলাধূলা করছিলো। তারা আগের মতো চিৎকার দিলো: "এই তো আসছে সুদখোর হাবিব! পালাও, পালাও! আমাদের পদধূলি তার গায়ে লাগলে আমাদের গুনাহ কেটে যাবে।"

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ একথা শুনে বলতে লাগলেন: "হে আমার প্রভু! যেদিন আমি আপনার সকাশে তাওবাহ করতে সক্ষম হলাম, সেদিনই আপনি মানুষের হৃদয়ে বুলন্দ করলে আমার সম্পর্কিত আওয়াজ আমারই উপকারার্থে।" এরপর তিনি বসরা শহরের সর্বত্র ঘোষণা দিলেন: "যে কেউ হাবিবের নিকট থেকে কিছু নিতে ইচ্ছুক, এসো! নিয়ে যাও!"

শহরের মানুষ তাঁর কাছে এসে জড়োত হলো। তিনি টাকা-কড়ি যা-ই তাঁর নিকট রক্ষিত ছিলো সবকিছু বিলিয়ে দিলেন। সুদী কারবারী হাবিব আজমী এভাবে নিঃস্ব এক ফকিরে রূপান্তর হলেন। এরপর একব্যক্তি এসে বললো, আপনি আমার নিকট থেকে অনেক অর্থকড়ি সুদ হিসেবে নিয়েছেন। এবার এসব ফিরিয়ে দিন। হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর নিকট দেবার মতো কিছুই ছিলো না। স্বীয় স্ত্রীর একখানা দামি চাদর ছিলো। তিনি সেটি দাবীদার লোকটিকে দিলেন। আরেক দাবীদার আসলো। তাকে দিলেন নিজের পরনের জুব্বা। এবার তিনি কোনো মতে ছতর রক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর ছুটে গেলেন ফুরাত নদীর তীরে। আল্লাহর ইবাদত ও রিয়াজত-মুরাক্বাবায় নিজেকে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর নিকট বাইআত গ্রহণ করে তাঁর সুহবতে সময় কাটাতে থাকেন।

আজমী পরিচিতি

হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর নিকট কুরআনের দারস নিতে যেয়ে তিনি বেশ সমস্যায় পড়েন। অনারব হিসেবে তিলাওয়াত সহীহ্ হতে বেশ বেগ পেতে হয়। পরবর্তীতে এ কারণেই তিনি 'আজমী' বা অনারব হিসেবে পরিচিত হন।

গায়েবি খাবার

দিন চলতে থাকে। হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন হিসেবে জীবন কাটাতে থাকেন। ভীষণ অভাব-অনটন হেতু জরুরী খাবার-দাবার ও রসদপত্রের জোগান হচ্ছিলো না তাঁর পরিবারে। তাঁর স্ত্রী এসব জোগাড় করে দিতে বার বার তাঁকে আবদার জানাচ্ছিলেন। একদিন তিনি ভোরে ওঠে চলে গেলেন হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায়। বেশ গভীর রাতে বাড়িতে স্ত্রীর নিকট ফিরে আসলেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে? কাজ করে কিছু আয় করেছো? কিছু নিয়ে এসেছো?"
হাবিব আজমী জবাব দিলেন: "আমি যার কাজ করেছি, তিনি খুব দয়ালু। আমি বিনিময়ে তাঁর নিকট কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করি। সঠিক সময় উপস্থিত হলে তিনি প্রতিদান দেবেন। কারণ তিনি বলেছেন, "প্রতি ১০ দিন পর পর আমি বেতন দিই।"

বাস্তবে হাবিব আজমী খানক্বায় যেয়ে ইবাদতে মশগুল হতেন। তিনি কারো কাজ করতেন না। এভাবে দশদিন ইবাদত করলেন। ঐদিন যুহরের নামাজ শেষে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আজ তো দশদিন পূর্ণ হয়েছে। আমি কী নিয়ে বাড়িতে যাবো? স্ত্রীকেই বা কী বলবো? তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেলেন।

কী আশ্চর্য! তাঁর অজান্তেই একব্যক্তি বাড়ির দরোজায় এসে হাজির হলেন। নিয়ে এসেছেন গাধার পিঠে করে কয়েক ব্যাগভর্তি আটা। আরেকজন নিয়ে আসলেন একটি দুম্বা এবং অপর আরেক ব্যক্তি আনলেন তৈল, মধু, মসলাপাতি ইত্যাদি। এসব বস্তু তাঁর ঘরের দরোজার সামনে রেখে সবাই প্রস্থান করলো। এরপর খুব সুদর্শন এক যুবক তিনশত রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘরের দরোজার কড়া নাড়লেন। হাবিব আজমীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে? কেনো এসেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "মালিক এসব বস্তু পাঠিয়েছেন। আপনি আপনার স্বামীকে বলবেন, 'তুমি তোমার কর্ম [নেক-আমল] বাড়াতে থাকো, আমরা তোমার বেতন

বাড়িয়ে দেবো।'" একথা বলেই রৌপ্যমুদ্রা হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে যুবক প্রস্থান করলেন।

এদিকে রাত গভীর হয়ে আসলে হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। ভাবতে থাকেন, স্বীয় স্ত্রীর নিকট যেয়ে কী জবাব দেবেন? তিনি তো কিছুই নিয়ে আসেন নি। অত্যন্ত বিষণ্ন বদনে বাড়ির নিকটে আসলেন।

একী! সুস্বাদু তাজা রুটি ও শুরবার ঘ্রাণ! তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে ছুটে আসলেন। পরনের কাপড়ের আঁচল দিয়ে স্বামীর মুখখানা মুছে দিলেন। নিজের স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র যে একেবারে উল্টে গেছে! এতো হাসিখুশি উজ্জ্বল চেহারায় তাকে তিনি কখনো দেখেন নি। কী ব্যাপার? হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ অবাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে বললেন, "প্রিয় স্বামী! আপনি যে ব্যক্তির জন্য কাজ করছেন তিনি খুবই ভালো লোক। তিনি দয়ালু ও অতীব মেহেরবান এবং উদার। এই দেখো না, তিনি কতো জিনিস পাঠিয়েছেন! একজন সুদর্শন যুবক এসে এসব দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, 'হাবিব যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁকে বলো, তোমার কাজের মাত্রা বাড়াও- আর আমি এর বিনিময় আরো বাড়িয়ে দেবো।'"

স্ত্রীর কথাগুলো শুনে হাবিব আজমীর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিভুত হয়ে পড়লেন। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, "আমার প্রিয়তমা স্ত্রী! দশ দিনের কাজের বিনিময়ে তিনি এতো কিছু পাঠিয়েছেন। এতো দয়ালু তিনি! আমি যদি আরো বেশি করে কাজ করি তাহলে- কে জানে, তিনি বিনিময়ে আরো কতো কিছু দেবেন।"

এদিন থেকে হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ জাগতিক সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালেন।

কারামত

১. দুআর নগদ ফল: একদা এক বৃদ্ধা হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর নিকট এসে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "হযরত! আমার একমাত্র পুত্র দীর্ঘদিন যাবৎ আমাকে একা রেখে কোথায় চলে গেছে। আমি তাকে ছাড়া আর বেঁচে থাকতে

পারবো না। দয়াকরে দুআ করুন আল্লাহর দরবারে। তাকে আমি দেখতে চাই। দয়া করুন। আপনার দুআর বদলৌতে আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমার জাদুকে বুকের মধ্যে আবার তুলে দেবেন।"
হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কোনো টাকা আছে?"
"হ্যাঁ, দুটি দিরহাম আছে", বৃদ্ধা জবাবে বললেন।
"ওগুলো গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দাও।"

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ এরপর দুআ করলেন। তারপর বৃদ্ধাকে বললেন, "ফিরে যাও! তোমার আদরের দুলাল তোমার নিকট ফিরে এসেছে!"
বৃদ্ধা বাড়িতে পৌঁছার পূর্বেই নিজের সন্তানকে দেখতে পেলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, "এই তো আমার আদরের দুলাল! এই তো আমার প্রিয় পুত্র!" তিনি ছেলেকে নিয়ে ছুটে আসলেন হযরত হাবিব আজমীর দরবারে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, "এতো দিন কোথায় ছিলে বাবা?" জবাবে সে এক আশ্চর্য বর্ণনা দিলো।

ছেলে বললো, "আমি দীর্ঘদিন যাবৎ কিরমান শহরে বাস করছিলাম। আমি সেখানে একটি মাদরাসায় পড়াশুনায় ছিলাম। আজ আমার উস্তাদ নির্দেশ দিলেন, বাজার থেকে কিছু মাংস ক্রয় করে নিয়ে আসতে। মাংস ক্রয় করে যখন আমি ফিরতি যাত্রা করি তখন হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বাতাস এসে আমাকে আকড়ে ধরে। আমি একটি গায়েবি আওয়াজ শুনলাম, "হে বাতাস! একে তার বাড়িয়ে নিয়ে চলো! হাবিবের দুআর বরকতে ও দুটি দিরহামের বিনিময়ে সে তার মায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে।" এরপরই দেখতে পেলাম আমি বাড়ির পাশে আমার মায়ের নিকট এসে গেছি।"

২. আগের দিন বাড়িতে পরের দিন আরাফাতে: পবিত্র হজ্জের মওসুম। বসরার লোকজন জিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ হযরত হাবিব আজমীকে শহরের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পেলেন। পরদিন ছিলো ইয়াওমুল আরাফাহ। সেখানে অবস্থানকারী বসরার হজ্জযাত্রীরা দেখলো তিনিও ইহরাম পরে আরাফার ময়দানে উপস্থিত আছেন!

৩. গায়েবী দিরহাম: একদা বসরা শহরের লোকজন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লো। খাদ্যাভাবে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটলো। হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ ধনীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে অভাবী লোকদেরকে খাবার ক্রয় করে দিলেন। ঋণদাতারা যখন তাঁর নিকট এসে টাকা চাইলো, তিনি নিজের বিছানার নীচে থাকা টাকার থলে থেকে মুদ্রা বের করতে লাগলেন ও ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। এই দিরহামগুলো কোত্থেকে আসলো তা কেউই বুঝতে পারলো না।

৪. প্রভুর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পীরসাহেব: হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর বাড়িটি বসরা শহরের দুটি রাস্তার সংলগ্নে ছিলো। তিনি গরম ও ঠাণ্ডা মওসুমে একটি পশুর চামড়ার তৈরি জুব্বা পরতেন। একদিন তিনি অযু করতে যেয়ে জুব্বাটি খুলে রাস্তার মধ্যে রাখলেন। ঘটনাক্রমে হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ এ রাস্তা দিয়েই আসছিলেন। জুব্বাটি রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে দেখে এটির নিকট যেয়ে মন্তব্য করলেন: “কোথাকার আজমী! সে এই জুব্বার মূল্য বুঝে না। এ জুব্বা এখানে থাকা উচিৎ নয়- এটি হারিয়ে যেতে পারে।” একথা বলে তিনি জুব্বাটি পাহারা দিতে লাগলেন। এদিকে হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ অযু সেরে এসে জুব্বার নিকট স্বীয় মুর্শিদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে যেয়ে বললেন, “আসসালামু আলাইকুম হে ইমামুল মুসলিমীন! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?”
হযরত বসরী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “তুমি কী জানো না, এ জুব্বাটি এখানে থাকা উচিৎ নয়? এটা হারিয়ে যেতে পারে। বলো, কার নিকট এটি রেখে গিয়েছিলে?”
হাবিব রাহিমাহুল্লাহ জবাবে বললেন, “তাঁর (আল্লাহর) নিকট রেখে গিয়েছিলাম, যিনি এটি দেখভালের দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছেন!”

৫. জ্ঞানের সঙ্গে ভরসা রাখার গুরুত্ব: একদিন হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর বাড়িতে বেড়াতে আসলেন। হাবিব রাহিমাহুল্লাহ খাবার হিসেবে হযরতের সম্মুখে দুটি রুটি ও সামান্য লবণ এনে দিলেন। হাসান রাহিমাহুল্লাহ খাওয়া শুরু করলেন। ইতোমধ্যে একজন ফকির এসে দরোজার কড়া নাড়লো। হাবিব আজমী মেহমানের সম্মুখ থেকে খাবারের থালাটি তুলে ফকিরের সামনে দিয়ে দিলেন! হযরত বসরী বললেন, “তুমি একজন ভালো লোক। আহ! যদি তোমার কিছুটা জ্ঞান থাকতো। তুমি তোমার মেহমানের সামন থেকে রুটি তুলে নিয়ে ফকিরকে দিয়ে দিলে। উচিৎ ছিলো, এক অংশ ফকিরকে দেবে ও অপর অংশ মেহানের সামনে রাখবে।”

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ কিছুই বললেন না। এরপর একজন খাদিম বড়ো একটি থালা ভর্তি খাবার নিয়ে উভয়ের সামনে হাজির হলো। থালার মধ্যে একটি আস্ত বকরির ভুনা মাংস ছিলো। আরো ছিলো মিষ্টি ভাত, উত্তম রুটি ও পাঁচ শত দিরহাম। খাদিম থালাটি হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর সামনে রেখে চলে গেলো। তিনি দিরহামগুলো গরীবদের জন্য রেখে দিলেন। খাবারটুকু স্বীয় মুর্শিদ হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর সামনে রেখে বললেন, "অনুগ্রহপূর্বক আপ্যায়ন করুন ইয়া শাইখী!" হাসান রাহিমাহুল্লাহ কিছুটা খাওয়ার পর হাবিব রাহিমাহুল্লাহ পুনরায় বললেন, "ইয়া শাইখী! আপনি একজন উত্তম ব্যক্তি। তবে যদি আরো কিছু ভরসা রাখতেন, তাহলে ভালো হতো। জ্ঞানের সঙ্গে ভরসা রাখাও জরুরি!"[১০]

৬. সত্য বলার সুফল: কেনো একদিন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সৈন্যরা হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর সন্ধানে ছুটোছুটি করছিলো। হাসান রাহিমাহুল্লাহ তখন হাবিব আজমীর খানক্বায় লুকিয়ে ছিলেন।
সৈন্যরা হাবিব রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, "আপনি কী আজ হাসানকে দেখেছেন?"
তিনি জবাব দিলান, "আমি তাঁকে দেখেছি।"
"তিনি কোথায়?"
"এই খানক্বায়।"

সৈন্যরা খানক্বায় প্রবেশ করলো। তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলো। হাসান বসরীকে কোথাও পেলো না। পরবর্তীতে হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা সাত বার আমার উপর হাত রেখেছে কিন্তু আমাকে দেখতে পায় নি!

সৈন্যরা প্রস্থান করার পর হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "হে হাবিব! তুমি তোমার মুর্শিদের হক্ব আদায় করো নি। তুমি আমার দিকে তাদেরকে লেলিয়ে দিলে!"

[১০] এখানে কোনো ভুলবুঝাবুঝির সুযোগ নেই। হযরত হাসান বসরী ও তাঁর খলিফা হযরত হাবিব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মধ্যকার এসব ঘটনাবলী দ্বারা কারো মর্যাদা অপরের তুলনায় বেশি- সেটা ভাবা সঠিক হবে না। বাস্তবে উভয় ওলির বরকতেই এসব কারামতের ঘটনা ঘটেছিল। -গ্রন্থকার।

হাবিব আজমী বললেন, "হে আমার শায়খ! আপনি যে এখানে লুকিয়ে আছেন সে সত্যটা আমি ব্যক্ত করেছি মাত্র। মিথ্যা বললে আমরা উভয়েই তাদের হাতে আটক হতাম।"
হাসান রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "তারা যখন আমাকে খোঁজছিলো তুমি তখন কী পাঠ করছিলে?"
হাবিব রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "প্রথমে আমি আয়াতুল কুরসি দশ বার পাঠ করেছি। এরপর দরুদ শরীফ দশ বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- দশ বার পাঠ করার পর দুআ করলাম: 'হে আল্লাহ! আমি আমার শায়খকে আপনার নিকট সোপর্দ করলাম। তাঁকে আপনিই নিরাপদ রাখুন।'"

৭. পানির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন: হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ কোনো এক জায়গায় যেতে ইচ্ছে করলেন। তিনি প্রথমে ফুরাত নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। এখানে দাঁড়িয়ে কী একটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। একটু পরই সেখানে এসে হাজির হলেন হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে ইমাম! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেনো?"
হাসান রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "আমি একটি জায়গায় যেতে চাচ্ছিলাম। নৌকা আসতে দেরি হচ্ছে।"
হাবিব আজমী বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "ইয়া শাইখী! আপনি কী বলছেন? আমি তো আপনার কাছ থেকেই শিখেছি। তোমার হৃদয় থেকে অন্য সকল মানুষের হিংসা মুছে দাও, গাইরুল্লাহর কাছ থেকে নিজের হৃদয়কে দূরে রাখো। জেনে রাখো, ক্লেশ-কষ্ট একটি মূল্যবান নিয়ামত। সবকিছু হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ। এরপর পানির ওপর পা রেখে হাঁটতে থাকো!" এ কথাগুলো বলে হাবিব আজমী নদীর পানিতে পা রেখে হেঁটে চলে গেলেন। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকা হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফেরার পর লোকজন এসে জিজ্ঞেস করলো, "ইয়া ইমামুল মুসলিমীন! আপনার কী হয়েছিলো?"
তিনি জবাব দিলেন, "আমার শাগরিদ হাবিব এইমাত্র আমাকে তিরস্কার করলো! এরপর পানিতে পা রেখে চলে গেলো। এদিকে আমি চেতনহীন অবস্থায় এখানেই রয়ে গেলাম। যদি আগামীকাল আমাকে বলা হয়, অগ্নির উপর দিয়ে হেঁটে যাও এবং আমি এভাবে অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকি- তখন আমার কী হবে?"

পরবর্তীতে হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ শীর্ষস্থানীয় মুরিদকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে হাবিব! তুমি কীভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী হলে?"
"এর কারণ হচ্ছে আমি আমার হৃদয়কে সাদা বানিয়েছি। আর আপনি বানিয়েছেন ভীষণ কালো।"
হযরত হাসান রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করলেন, "আমার শিক্ষা অপরকে উপকৃত করলো আর আমি রয়ে গেলাম বঞ্চিত!"

ইন্তিকাল

সবাই একদিন যেতে হবে অন্ধকার সেই মাটির ঘরে। দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান সকল মানুষের জন্য। ঠিক যেমন একজন মুসাফির কোথাও যেয়ে কিছুদিন অবস্থান করে পুনরায় নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন, আমাদের সবার ক্ষেত্রে তা-ই মহাসত্য। আমাদের মূল চিরন্তন বাসস্থান আখিরাতে অবস্থিত। যেখান থেকে আসা সেখানেই ফের যাত্রা। সুহরাওয়ার্দিয়া ও চিশতিয়া সুফি তরিকার বিখ্যাত ওলি, হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট খলিফা ও তাবিঈ হযরত হাবিব ইবনে মুহাম্মদ আজমী রায়ী বসরী রাহিমাহুল্লাহ ১২০ হিজরি সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বাগদাদেই সমাহিত আছেন।

সুহরাওয়ার্দিয়া শাজারাহ মুবারক অনুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন মহাত্মন শায়খ দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফিক ইনায়েত করুন।

হযরত শায়খ দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১৬০ থেকে ১৬৫ হিজরির মধ্যে, সমাধি- কুফা, ইরাক।)

তাঁর পূর্ণ নাম আবু সুলাইমান দাউদ ইবনে নোসাইর তায়ী কুফী রাহিমাহুল্লাহ। তবে তিনি দাউদ তায়ী নামেই বেশি পরিচিত। ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা [৮০-১৫০ হিজরি] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ ছিলেন। সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমানোর জন্য কামিল মুর্শিদের প্রয়োজন একান্ত জরুরী। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন তাবিঈ হযরত হাবিব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণ

আগেই বলেছি, দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ ইমামে আজম রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর তিনি ইমাম সাহেবের নিকট থেকে শরীয়তের ওপর উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন। এ দুটি দশকেই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে 'হানাফি ফিকাহ' শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়। হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ ইমামে আজমের অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন ছিলেন। তবে শুধুমাত্র শরয়ী বাহ্যিক জ্ঞান দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন ও সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমাতে সর্বদাই উদগ্রীব থাকতেন। একাকী থাকাকে তিনি পছন্দ করতেন। আল্লাহর জিকির-ফিকিরে সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন।

এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি একদা একজন ক্রন্দনরত বৃদ্ধার কণ্ঠে নিম্নোল্লিখিত দুটি পংক্তি শুনতে পেলেন।

তোমার কোন্ কপোলটিতে ক্ষয়ের চিহ্ন দৃশ্যমান হয়েছে,
এবং কোন্ চোখটিতে অশ্রু এসে কপোল বেয়ে ঝরে পড়ছে?[১১]

---

[১১] এ পংক্তি দুটি তাযকিরাতুল আউলিয়ার লেখক শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, পংক্তি দুটি ছিলো: [বঙ্গানুবাদ] "এমন কোনো মুখশ্রী আছে কী- যা ধূলায় পরিণত হয় নি? / এমন কোনো চোখ আছে কী- যার মধ্য থেকে অশ্রু গড়িয়ে মৃত্তিকায় পড়ে নি?"

আহ! কী করুণ আর্তনাদ, ভাবলেন দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ। পংক্তি দুটি তাঁর হৃদয়ে নাড়া জাগালো। ক্ষণকালের জন্য তিনি অপ্রকিতিস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি ছুটে গেলেন স্বীয় উস্তাদ ইমামে আজমের নিকট।

অবস্থাদৃষ্টে ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে, তোমার কী হয়েছে?" দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ সব খুলে বললেন। তিনি আরো বললেন, "ইমাম সাহেব! পৃথিবীর আকর্ষণ আমার মধ্য থেকে বিদায় হয়ে গেছে। আমার ভেতরে কী যে একটা পরিবর্তন এসে গেছে, যার বর্ণনা দিতে আমি অপারগ। আমি এর ব্যাখ্যা কোনো শরয়ী কিতাব বা আইন-কানুনেও খুঁজে পাচ্ছি না।"

হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে উপদেশ দিলেন: "তুমি মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকো। খিলওয়াত অবলম্বন করো।"

সুতরাং হযরত দাউদ তায়ী সেদিন থেকেই মানুষের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে নিজের বাড়ির একটি কক্ষে অবস্থান করতে থাকেন। বেশ কিছুদিন পর ইমামে আজম রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে দেখতে যান। তিনি দাউদ তায়ীকে বললেন, "আরে, নিজের ঘরে এভাবে নিরবে বসে থাকলে তোমার সমস্যা দূর হবে না। তোমাকে বরং উচিৎ হবে ইমামদের মজলিসে যেয়ে নিরবে তাঁদের দারস শ্রবণ করা। এতে তুমি তাঁরা যা বলছেন তার নিগূঢ় মর্ম তাঁদের থেকেও বেশি বুঝতে সক্ষম হবে।"

ইমাম সাহেবের উপদেশ মুতাবিক বেশ কিছুদিন ইমামদের দারসে তিনি যোগ দিলেন। নিরবে কথাগুলো শুনতেন। এক বছরের মধ্যে একবারও একটি শব্দ উচ্চারণ করেন নি। অন্যান্য ছাত্ররা তাঁকে বোবা হয়ে গেছেন ভাবতো। বছর শেষে তিনি মন্তব্য করলেন, "এই একটি বছরে যা শিখেছি, ত্রিশ বছরেও তা শিখতে পারতাম না।" এরপর তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে তরিকতের মুর্শিদ হযরত হাবিব আজমী রায়ী বসরী রাহিমাহুল্লাহর সাথে। হযরত তাঁকে মুরিদ করে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমাতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আত্মশুদ্ধির এ রাস্তায় অসীম সাহসসহ পদার্পণ করলেন।

একদিন অনেক বই নিজের কাঁধে তুলে ফুরাত নদীর তীরে গেলেন। ছুড়ে মারলেন সবগুলো গ্রন্থ নদীর পানিতে। এরপর খিলওয়াত [নির্জনবাস] পালনে নিজেকে

আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কারো ধারে-কাছেই যেতেন না। শুধু ইবাদত-বন্দেগি-রিয়াজত-মুরাক্বাবা-মুশাহাদার মধ্যে দিনরাত নিমগ্ন থাকতেন।[12]

কথিত আছে, হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ উত্তরাধিকার সূত্রে ২০টি দীনারের মালিক হন। দীর্ঘ বিশ বছর এ মুদ্রাগুলো দিয়েই তিনি কালাতিপাত করেন। তাঁর কোনো কোনো পীর ভাই এতে আপত্তি জানালে বলতেন: "এই [সুলুকের] রাস্তার দাবি হচ্ছে অপরকে দান করা আর নিজের জন্য কিছুই না রাখা। আমি এই বিশ দীনারও রাখতাম না- শুধুমাত্র মনকে লালসা থেকে মুক্ত রাখতে এগুলো রেখেছি। আমি এগুলো রেখে রেখেই এ ধরা থেকে বিদেয় হয়ে যাবো।"

তাঁর ফকরের অবস্থা এমন ছিলো যে, সময় সময় শুকনো রুটি পানির মধ্যে ভিজিয়ে শুধু চুষতেন মাত্র। বলতেন, "রুটি ভক্ষণ করার জন্য যেটুকু সময় অতিবাহিত হয়, তার মধ্যে আমি পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারি। আমি কেনো রুটি খেতে খেতে আমার জীবনের মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করে দেবো?"

হযরত আবু বকর আয়াশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি দাউদের খানক্বায় গেলাম। দেখতে পেলাম তাঁর হাতে এক টুকরো শুকনো রুটি। তিনি কাঁদছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে দাউদ! কী হয়েছে, কাঁদছো কেনো?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমি এ রুটির টুকরোটি খেতে চাচ্ছি, কিন্তু জানি না- এটি হালাল না হারাম।'"

অপর এক বর্ণনায় হযরত আয়াশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি একদা দাউদকে দেখতে গেলাম। লক্ষ করলাম একটি পানিভর্তি জগ রৌদ্রের মধ্যে রাখা আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জগটি ছায়ায় রাখলে ভালো হয় না?' তিনি জবাব দিলেন, 'দেখো, এটি আগে ছায়ার মধ্যেই ছিলো- এখন সূর্য কিছুটা হেলে যাওয়ার ফলে রৌদ্রে পড়েছে। আমি মহাপ্রভুর সম্মুখে এতোই লজ্জাবোধ করছি যে, তাঁর হুকুমে যে জগটি ছায়া থেকে রৌদ্রে গিয়েছে, সেটি পুনরায় স্বেচ্ছায় ছায়ায় নিয়ে আসি কীভাবে!'"

---

[12] মনে রাখা জরুরি যে, উত্তম গ্রন্থাদি বিনা কারণে পানিতে ফেলে দেওয়া বা অন্যভাবে ধ্বংস করা বৈধ কাজ নয়। হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ সম্ভবত পুরাতন পাঠযোগ্যহীন বইপত্র নদীর পানিতে ফেলে দিয়েছিলেন। অবশ্যই তরিকতের রাস্তার ভ্রমণে যে, বই-পুস্তকের জ্ঞান যথেষ্ট নয়- এটা যে একটি আধ্যাত্মিক ভ্রমণ, সে কারণেই হয়তো নিজের নফসকে কঠিন সাধনার পথে প্রস্তুত করতে যেয়ে তিনি এ কাজটি করেছিলেন। তবে সবকিছুর সঠিক জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। -গ্রন্থকার।

বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনা

১. হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর বাড়িটি প্রাসাদতুল্য ছিলো। এতে ছিলো অনেকগুলো আলাদা কক্ষ। তিনি যে কক্ষে থাকতেন সেটি নষ্ট হয়ে থাকার অযোগ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্যটিতে যেতেন না। এভাবে একটার পর আরেকটায় যেয়ে থাকতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "আপনি কেনো নষ্ট হয়ে যাওয়া কক্ষগুলো মেরামত করেন না?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি যে, এ দুনিয়ার কিছুই মেরামত করবো না।" দীর্ঘদিন পরে তাঁর পুরো প্রাসাদই ধ্বসে পড়লো। বাকি থাকলো শুধুমাত্র প্রবেশ দ্বারটি। যেদিন হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেলেন সেদিনই ঐ দরোজাটিও ধ্বসে পড়ে।

একজন মেহমান তাঁর থাকার কক্ষে ঢুকে দেখলেন, ছাদটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বললেন, "হে দাউদ! আপনার কক্ষের ছাদটি যে কোনো সময় ধ্বসে পড়বে।" তিনি বললেন, "গত বিশ বছর যাবৎ আমি একবারও আমার কক্ষের ছাদের দিকে তাকাই নি!"

২. কেউ একজন হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, "আপনি কেনো বিবাহ করছেন না?"
তিনি জবাব দিলেন, "আমি একজন ঈমানদার মহিলার সঙ্গে প্রতারণা করতে চাই না।"
প্রশ্নকারী বললেন, "তা কীভাবে হয়?"
তিনি বললেন, "আমি যদি কোনো মহিলাকে বিয়ে করি তাহলে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হবে। সুতরাং বিয়ে করলে পরে, যেহেতু আমি যেভাবে চাই সেরূপ ইবাতদ-বন্দেগী-জিকির-মুরাক্বাবা করতে পারবো না- তাই বিয়ে না করাই আমার জন্য শ্রেয়। একই সময় উভয় দায়িত্ব পালন করার ভান মূলত মহিলার প্রতি প্রতারণার সামিল।"
লোকটি এবার বললেন, "তাহলে, অন্তত নিজের দাড়িগুলো সময় সময় চিরুনি দ্বারা আঁচড়াবেন!"
দাউদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "হু, এজন্য তো অবসর সময়ের প্রয়োজন। তাতো আমার হাতে নেই!"

৩. জ্যোৎস্নায় আলোকিত এক রাতে হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ বাড়ির ছাদে ওঠে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। মহাপ্রভুর সৃষ্টিলীলার ধ্যান তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠলো। গভীর মুরাক্বাবা অবস্থার মধ্যে তাঁর দুটো চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। তিনি আল্লাহর মুশাহাদার মধ্যে এতোই ডুবে গেলেন যে, এক সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে পাশের বাড়ির ছাদে পড়ে গেলেন। ঐ ছাদটি ছিলো তাঁর ছাদের কিছুটা নিচে। আওয়াজ শুনে হযরতের পড়শি ঘুম থেকে উঠলেন। ভাবলেন, তার ছাদে বুঝি চোর ওঠেছে! উন্মুক্ত তরবারি হাতে ছুটে গেলেন ছাদে। কিন্তু ছাদে যেয়ে দাউদ রাহিমাহুল্লাহকে দেখে তিনি হাত ধরে দাঁড় করালেন। বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে দাউদ! তোমাকে কে এখানে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো?" দাউদ রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "আমি জানি না, জানি না। আমি আমার মধ্যে ছিলাম না- আমি কিছুই জানি না।"

৪. একদিন দেখা গেলো হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ নামাযে যেতে দৌড়াচ্ছেন। কেউ একজন জানতে চাইলো, "কী হে দাউদ! কী হয়েছে? এতো তাড়াহুড়ো কিসের?"
তিনি জবাব দিলেন, "শহরের তোরণে একদল সৈন্য আমাকে ধরে নিতে অপেক্ষা করছে!
লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, "কোন্ সৈন্যদল?"
তিনি বললেন, "এরা হচ্ছে কবরস্থানের লোকজন!"

৫. তখন বাগদাদের মসনদে বাদশাহ হারুন-অর-রশীদ [৭৬৬-৮০৯ ঈ / ১৪৮-১৯৩ হিজরি, শাসনকাল: ৭৮৬-৮০৯ ঈসায়ী]। ইমামে আজম রাহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত শিষ্য ইমাম ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম আনসারী আবু ইউসুফ [১১৩/১১৭-১৮১ হিজরি] রাহিমাহুল্লাহ কাজি হিসেবে কর্মরত। বাদশাহ একদিন কাজি সাহেবকে বললেন, "চলুন, আমরা দাউদ তায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।"

হযরতের বাড়ির প্রবেশদ্বারে উভয় ব্যক্তি আগমনের পর প্রথমে ইমাম ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ভেতর-বাড়ি গেলেন। যে কক্ষে হযরত দাউদ রাহিমাহুল্লাহ থাকতেন সে কক্ষের দরোজার কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে জবাব আসলো, এখানে কারোর প্রবেশের অনুমতি নেই। ইমাম সাহেব হযরত দাউদের মাতার নিকট অনুরোধ

জানালেন। বললেন, “দেখুন, বাদশাহ হারুন-অর-রশিদ বাইরে অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।”

দাউদ রাহিমাহুল্লাহর মাতা বললেন, “দাউদ বাবা! ভেরতে প্রবেশের অনুমতি দাও। দরোজা খুলো। ইমাম ইউসুফ ও বাদশাহ হারুন-অর-রশীদ এসেছেন তোমাকে দেখতে।”

হযরত জবাব দিলেন, “মা-গো, দুনিয়াদার ও শাসকদের সাথে দেখা করার আমার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?”

মা বললেন, “দাউদ! আমি তোমার দুগ্ধ মাতা হিসেবে দাবি জানাচ্ছি, তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে দাও।”

দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহ এবার বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি যখন বলেছো, ‘তোমার মায়ের হক্ব আদায় করো, কারণ আমার [আল্লাহর] সন্তুষ্টি তোমার মায়ের সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত’। সুতরাং আমি মায়ের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অন্যথায় এদের সঙ্গে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই।” তিনি দরোজা খুলে দিলেন।

ইমাম ইউসুফ ও বাদশাহ হারুন-অর-রশিদ কক্ষে ঢুকে দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর সম্মুখে আদবসহকারে বসলেন। হযরত নসিহত করা শুরু করলেন। হারুন-অর-রশিদ কাঁদতে লাগলেন।

বিদায়ের সময় বাদশাহ একখণ্ড স্বর্ণ হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহকে হাদিয়া হিসেবে তাঁর সম্মুখে পেশ করলেন। বললেন, “এটি একটি পবিত্র বস্তু। হালাল উপায়ে প্রাপ্ত।”

হযরত দাউদ বললেন, “আমার এটার প্রয়োজন নেই। নিয়ে যান। আমি একটি বাড়ি বিক্রি করেছি যেখানে পবিত্র ব্যক্তিগণ ভাড়াটে হিসেবে থাকতেন। বিক্রির অর্থ দ্বারা আমার খরচপাতি চলছে। আমি আল্লাহর নিকট আবদার জানিয়েছি, ‘এই পবিত্র হালাল অর্থ যখন শেষ হয়ে যাবে, তিনি যেনো আমার আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যান। এতে করে আমার প্রয়োজন পূরণে কারোর দয়ার দানের দরকার পড়বে না। আমি আশাবাদী যে, আমার প্রভু আমার এ প্রার্থনা কবুল করেছেন।”

হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

উক্ত সাক্ষাতের কিছুদিন পর ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ হযরত দাউদ তায়ী রাহিমাহুল্লাহর গৃহে ফিরে আসলেন। হযরত তায়ীর মুদ্রাথলে রক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, "দাউদ তায়ীর থলের মধ্যে কটি দিরহাম বাকি আছে?" রক্ষক জবাব দিলেন, "দুটি দিরহাম বাকি আছে।" ইমাম সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "প্রত্যহ তিনি কটি রৌপ্যমুদ্রা খরচ করেন?" রক্ষক জবাব দিলেন, "একটি করে রৌপ্যমুদ্রা খরচ করেন।" ইমাম সাহেব হিসেব করে চলে আসলেন।

একদিন হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, আজই হযরত দাউদ তায়ী মায়াবী এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। উপস্থিত মুসল্লিরা প্রশ্ন করলেন, "আপনি এ সংবাদটি কীভাবে জানলেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি তাঁর দৈনিক খরচের হিসেব করে দেখেছি। আজ তাঁর নিকট আর কোনো দিরহাম অবশিষ্ট নেই। তাঁর দুআ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন।" ইমাম সাহেবের এ ঘোষণা শুনে সবাই ছুটে চললো যুগের এক শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত দাউদ তায়ীর বাড়ির দিকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দা ও ওলির দারাজাত বুলন্দ করুন। সংরক্ষণ করুণ তাঁর সকল গোপন রহস্য।

সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকানুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত মা'রুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনায় নিমগ্ন হবো। আমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করছি। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া একটিও অক্ষর লিখার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হযরত শায়খ আবুল হাসান সিররি ইবনে মুগলিস সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত্যু- ২৫৩ [মতান্তরে ২৫১ বা ২৫৭] হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

তিনি ছিলেন তাঁর যুগের বাগদাদের ইমাম। তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। যুগের আরেক শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত মা'রুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তাঁর তরিকতের শায়খ।

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর একজন সাথী ছিলেন হযরত বিশর হাফি রাহিমাহুল্লাহ। এছাড়া তাঁরই ভাগিনা ও তরিকতের খলিফা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি হাদিসেরও রাবী ছিলেন। তিনি হযরত ফাজিল থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী ও হযরত আবুল আব্বাস বিন মাশরুক্ব। হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি 'হাক্বাইক্ব' ও 'ইশারাত' সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাথমিক জীবন

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর পিতার নাম ছিলো হযরত মুগলিস। তাঁর জন্ম হয় ইরাকের রাজধানী বাগদাদে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে তিনি ১৫৫ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন তাবে-তাবিঈ ছিলেন।

পরিণত বয়সে হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। বাগদাদের এক সরু রাস্তায় তাঁর একটি দোকান ছিলো। তিনি সময় পেলেই দোকানের সম্মুখে একখানা পর্দা টেনে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। প্রত্যহ অনেক রাকাআত [নফল] নামায পড়তেন।

একদিন লুকাম পাহাড় থেকে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাতে আসলেন। তখন হযরতের দেকানের সামনে পর্দা টাঙ্গানো ছিলো। আগন্তুক পর্দা তুলে হযরতকে

সালাম জানালেন। বললেন, “লুকাম পাহাড়ের অমুক শায়খ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।”
হযরত সাক্বাতী বললেন, “তিনি তো পাহাড়ে বসে ইবাদতে মশগুল আছেন। তাঁর চেষ্টা-সাধনা কিছুই নয়! মানুষের মধ্যে থেকেও যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির-ফিকির নিয়ে থাকতে সক্ষম, এক মুহূর্তের জন্যই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল নয়- সে-ই তো সত্যিকার ইবাদতকারী।” আগন্তুক তাঁর কথা শুনে নিরব হয়ে গেলেন।

বলা হয়ে থাকে হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ ব্যবসা থেকে ৫ শতাংশের বেশি লাভ কখনো করেন নি। একদা তিনি ষাট দিনারের বিনিময়ে কিছু কাঠবাদাম ক্রয় করেন। এরপরই বাজারে কাঠবাদামের ঘাটতি পড়ে যায়। একজন দালাল হযরতের নিকট ছুটে আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘এগুলো বিক্রি করবেন?’
হযরত সাক্বাতী বললেন, ‘অবশ্যই!’
দালাল: ‘দাম কতো?’
হযরত সাক্বাতি: ‘তেষট্টি দিনার।’
দালাল: ‘কিন্তু হযরত! বর্তমানে এই কাঠবাদামের বাজারমূল্য তো নব্বই দিনার!’
হযরত সাক্বাতি: ‘আমার একটি আইন হলো ৫ শতাংশের বেশি লাভ না করা। আমি এ আইনকে ভঙ্গ করবো না।’
দালাল: ‘কিন্তু আমি মনে করি, কম দামে আপনার পণ্য বিক্রি করা ঠিক হবে না।’
সুতরাং দালাল ব্যক্তি চলে গেলো। হযরত সাক্বাতির কাঠবাদাম বিক্রি হলো না।

সুলুকের রাস্তায়

হযরত সাক্বাতির দোকানে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য বিক্রি হতো। একদিন বাগদাদের বাজারে আগুন লাগলো। মানুষ ছুটে এসে হযরত সাক্বাতি রাহিমাহুল্লাহকে বললো, “হযরত! বাজারে আগুন লেগেছে।” তিনি মন্তব্য করলেন, “তাহলে আমিও মুক্ত হলাম!” আগুন নিভে যাওয়ার পর দেখা গেলো একমাত্র তাঁর দোকান ছাড়া বাকি সবগুলো জ্বলেপুড়ে ছাই। তিনি তখন দোকানের সবকিছু গরিব-দুঃখিদের মধ্যে বণ্টন করে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালেন।

দীর্ঘদিন পরে একবার তিনি উক্ত ঘটনার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, “ত্রিশ বছর অতিবাতি হয়ে গেছে, আমি এখনও তাওবাহ করে যাচ্ছি আল্লাহর দরবারে- কারণ, আমি একটি ব্যাপারে ‘আল্লাহর শুকুর’ বলেছিলাম।” লোকজন ব্যাপারটি সম্পর্কে

আরো একটু ব্যাখ্যা চাইলো। তিনি বললেন, "বাজারের দোকানগুলো একদা জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু আমারটি রক্ষা পেলো। এ খবর শ্রবণ করে আমি বলেছিলাম, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এর পর থেকেই আমি তাওবাহ করতে থাকি। কারণ, নিজের দুনিয়াবী সম্পদ সংরক্ষিত থাকায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেই আমার মুসলিম ভাইদের ক্ষতি হওয়াতে আমি তখন আক্ষেপ বা দুঃখবোধ করি নি- এটা আমার পক্ষ থেকে গাফিলতি হিসেবে ধরা পড়ে যায়।"

হযরত সাক্বাতি রাহিমাহুল্লাহকে কেউ একজন প্রশ্ন করলো, "সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণের শুরুটা কীভাবে হয়েছিলো?"
তিনি জবাব দিলেন, "একদিন হযরত হাবিব আজমী রায়ী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আমার সক্ষাত ঘটে। আমি তাঁর হাতে কিছু দিরহাম দিয়ে বললাম, আপনি এগুলো গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। তিনি দুআ করলেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় হোন।' তাঁর এ দুআর পরই আমি দুনিয়ার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলি। এর পরের দিন আসলেন মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর সাথে ছিলো একটি ইয়াতীম ছেলে। হযরত বললেন, 'এই শিশুটিকে বস্ত্র দান করুন।' আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলাম, ছেলেকে বস্ত্র দিলাম। তিনি দুআ করলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করুন। আপনাকে এই কাজ [দোকানদারী] থেকে মুক্ত করে দিন।' এ দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। আমি দুনিয়াবী সবকিছু বিসর্জন করলাম। উভয় বুজুর্গের দুআর বরকতেই সবকিছু হয়েছে। আমি তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।"

হযরত সিররি সাক্বাতি রাহিমাহুল্লাহ ও সভাসদ ইয়াজিদ

একদিন হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদের একটি খোলা ময়দানে ওয়াজ-নসিহত করছিলেন। শহরের বিশিষ্ট সভাসদ ও অনুলেখক আহমদ ইয়াজিদ সভাস্থলের নিকট দিয়ে গোলাম ও ক্রীতদাসসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "ও হে, তোমরা থামো! শুনে নেই এ বক্তা কী বলছেন? আমরা ইতোমধ্যে বেশ কটি উত্তম স্থানে গিয়েছি, যেখানে যাওয়ার কথা ছিলো না। আমি ওসব স্থানে বসে কিছু শুনি নি। এখন শুনবো।"

সুতরাং তিনি সভাস্থলে ঢুকে এক জায়গায় বসে ওয়াজ শুনতে লাগলেন। এসময় হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ বলছিলেন, "আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে

কেউই মানুষ থেকে দুর্বল নয়। অথচ আল্লাহর সৃষ্ট সকল প্রাণীর চেয়ে সর্বাধিক বেশি প্রভুর আদেশ-নিষেধ অমান্যকারী হচ্ছে মানবজাতি। কেউ যদি উত্তম আমল করে তাহলে সে এতোই মর্যাদাশীল হয় যে, সকল ফিরিশতাও তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে। আর সে যদি খারাপ আমল করে তাহলে এতোই নিকৃষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং শয়তানও তার সাথী হতে লজ্জাবোধ করে। কী আশ্চর্য এ পৃথিবীর মানবকূল! সে এতো দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাফরমানী করে!”

এ কথাগুলো সভাসদ আহমদ ইয়াজিদের অন্তরাত্মায় যেনো হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লার ধনুক থেকে ছুড়ে মারা তীরের মতো আঘাত করলো। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফেরার পরও ক্রন্দন থামলো না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। বাড়িতে পৌঁছুনোর পরও তিনি আঘাতের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। এ রাতে তিনি খানা-পিনা পরিত্যাগ করলেন। কারো সাথে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি।

পরের দিন তিনি পায়ে হেটে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর ওয়াজ মাহফিলে যোগ দিলেন। আরো অনেক কথা শ্রবণ করে বাড়িতে ফিরে গেলেন। তৃতীয় দিনও তিনি হযরতের ওয়াজ মাহফিলে আসেন। এদিন তিনি একাই পায়ে হেটে এসেছিলেন। ওয়াজ শেষ হওয়ার পর হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর কাছে আসলেন।

হযরতের সম্মুখে হাজির হয়ে বললেন, “ইয়া শায়খ! গতকালকের আপনার কথাগুলো আমাকে আড়ষ্ট করে নিয়েছে। এ বাক্যগুলো আমার হৃদয়কে দুনিয়াবিমুখ করে ফেলেছে। আমি সবকিছু পরিত্যাগ করে মানবসমাজ থেকে দূরে সরে যেতে চাই। আপনি আমাকে আধ্যাত্মিক রাস্তার সন্ধানী হতে সাহায্য করুন।”
হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কোন রাস্তায় ভ্রমণে যেতে আগ্রহী- সুলুক না শরীয়তের রাস্তায়?”
ইয়াজিদ বললেন, “উভয়টি।”
হযরত সাক্বাতী বললেন, “সাধারণ্যের রাস্তা হচ্ছে এই: তুমি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইমামের পেছনে আদায় করবে, জাকাত দেবে, রমজানের ফরয রোযা রাখবে, মক্কা শরীফ যেয়ে হজ্জ আদায় করবে। হালাল-হারাম বুঝে চলবে ইত্যাদি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাস্তা হচ্ছে এই: প্রথমোক্ত আমলগুলো সঠিকভাবে পালন করা

ছাড়াও তুমি সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াকে পেছনে ফেলে দেবে, দুনিয়ার কোনো জালে আটকা পড়া থেকে মুক্ত থাকবে, তোমাকে এটি [দুনিয়া] গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে না। এ হচ্ছে উভয় রাস্তার স্বরূপ।" কথাগুলো শুনে আহমদ ইয়াজিদ চলে গেলেন। তিনি মরুভূমির দিকে পা বাড়ালেন।

বেশ কিছুদিন পর জঠলাকেশী, কপোলে আঁচড়ের চিহ্নযুক্ত এক বৃদ্ধা হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। বললেন, "হে মুসলমানদের ইমাম! আমার একটি নওজোয়ান, সুদর্শন পুত্রসন্তান ছিলো। একদিন সে আপনার ওয়াজ-মাহফিলে আসলো, হাসিখুশি ও প্রফুল্লচিত্তে। এরপর যখন সে ফিরলো, তার চোখে-মুখে ভীষণ বেদনার ছাপ, ক্রন্দনরত ও আহাজারি করতে করতে সে বেহুশ বেকরার। এখন, বেশ কদিন চলে গেছে- সে নিরুদ্দেশ, কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তো তার মা! তার অনুপস্থিতিতে আমার হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন।"

বৃদ্ধার এরূপ আবদারে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। অনুকম্পা ও সহমর্মিতা হেতু তিনি আপ্লুত হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "হে মা! ক্রন্দন করো না। ধৈর্যধারণ করো। যেদিন সে ফিরে আসবে আপনার কোলে তখন শুধুমাত্র উত্তম জিনিস দেখতে পাবে। আমি তোমাকে তার আগমনের বার্তা দেবো। সে তো দুনিয়াকে বিজর্সন দিয়েছে। সে সত্যিকার তাওবাকারী- তাওবাতুন নাসুহার অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।"

বেশ কয়েকদিন পরে এক রাতে আহমদ ইয়াজিদ কোত্থেকে এসে হাজির হলেন হযরত সিররি সাক্বাতীর দরবারে। হযরত সিররি সাথে সাথেই তাঁর খাদিমকে বললেন, "ছুটে যাও। এক্ষুণি সেদিনের বৃদ্ধাকে গিয়ে বলো, তার আদুরে সন্তান ফিরে এসেছে।" তিনি এবার সম্মুখে উপস্থিত আহমদ ইয়াজিদের দিকে তাকালেন। তাঁর দেহ জরাজীর্ণ। কপোলে বিবর্ণের ছাপ। দীর্ঘকায় দেহখানায় একাধিক বক্রতা। তিনি যেনো এক নির্জীব নিস্ফলা কায়া! হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহকে একান্ত কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, "ইয়া শায়খী! আপনি যখন আমাকে প্রশান্তির দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন, তাহলে এবার আমাকে আরো দিকনির্দেশনা করুন। ... "

উভয়ে বাক্যালাপ করাকালেই ইয়াজিদের মাতা এসে উপস্থিত হলেন। তার সাথে ছিলো ইয়াজিদের স্ত্রী ও ছোট পুত্র। আহমদ ইয়াজিদের ওপর যখনই মায়ের দৃষ্টি পড়লো তখন তিনি চমকে ওঠলেন। এরূপ শুকনো জরাজীর্ণ কায়ায় তিনি তার সন্তানকে কখনও দেখেন নি। তিনি পুত্রকে বুকে জিড়য়ে ধরলেন। আহমদ ইয়াজিদের স্ত্রী এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখের অশ্রু ঝরাচ্ছেন। অপরপাশে পুত্রও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। এতে পরিবেশটাই ভারী হয়ে ওঠলো। হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহও নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাঁরও চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। পুত্র তার পিতার পায়ে জড়িয়ে ধরলো। সবাই মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করলো ইয়াজিদকে বুঝাতে। নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে আকুল আবেদন জানালেন তার মাতা, স্ত্রী ও পুত্র। এমনকি শায়খ সাক্বাতীও আবদার জানালেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না।

আহমদ ইয়াজিদ হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “ইয়া ইমামুল মুসলিমীন! আপনি কেনো এদেরকে আমার আগমনের সংবাদ দিলেন? এখন দেখছি এরাই হবে আমার জন্য বিপদের কারণ।” হযরত সাক্বাতী বললেন, “হে আহমদ! তোমার মাতা বার বার আমাকে আকুতি-মিনতি করায় আমি তোমার সন্ধান দিতে তার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম।”

যা হোক, আহমদ ইয়াজিদ পুনরায় মরুভূমির দিকে যাত্রা করতে প্রস্তুতি নিলেন। মা, স্ত্রী ও পুত্রের অনেক আকুতি-মিনতি কাজে আসলো না। তার স্ত্রী বললেন, “আপনি জীবিত থাকতেই আমাকে বিধবা করলেন এবং নিজের সন্তানকে ইয়াতীম বানালেন। ছেলেটি যখন বার বার আপনার কথা জিজ্ঞেস করবে তখন আমি কী জবাব দেবো? অন্তত ছেলেটিকে সাথে করে নিয়ে যান। আহমদ জবাব দিলেন, “ঠিক আছে। আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি।” তিনি তখন ছেলের জামা ছিড়ে ফেললেন। তাকে পরালেন চামড়ার তৈরি কুর্তা। হাতে দিলেন একটি চামড়ার থলে। এরপর মা ও স্ত্রীকে বললেন, “এবার তোমরা চলে যাও।” স্ত্রী চিৎকার দিলেন, “আমি এসব আর সহ্য করতে পারছি না। তিনি ছেলেটিকে নিজের নিকট টেনে নিয়ে গেলেন। আহমদ বললেন, “আমার ব্যাপারেও তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। তুমি চাইলে আমাকে মুক্ত করে দিতে পারো।” এরপর তিনি শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

দীর্ঘদিন পর এক রাতে ইশার নামায শেষে এক ব্যক্তি হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় প্রবেশ করলেন। হযরতকে বললেন, "আহমদ ইয়াজিদ আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমার অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমাকে সাহায্য করার জন্য শায়খকে অনুরোধ জানাবে।"

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "চলো। আমাকে নিয়ে যাও আহমদের কাছে।" তিনি আহমদকে বাগদাদের বিখ্যাত সুনিজিয়া কবরস্থানে যেয়ে দেখতে পেলেন মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। তার জিহ্বা তখনো নড়াচড়া করছিলো। কি যেনো বলতে চাচ্ছেন। হযরত সাক্বাতী কান পেতে কথাগুলো শুনতে থাকেন: "এরূপ অবস্থার জন্য আমলকারীকে আমল করতে দাও।" হযরত সাক্বাতী আহমদের মাথা তুলে ধূলোবালি ঝেড়ে-মুছে তাঁর কোলে রাখলেন। আহমদ চোখ খুলে তাঁর প্রিয় শায়খের উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখতে থাকেন। ক্ষীণ সুরে বললেন, "অহ, আমার শায়খ! আপনি সময়মতো এসেছেন। আমার জীনবের ইতিক্ষণ উপস্থিত।" এরপর তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। হযরত সাক্বাতীর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

তখন ভোর হয়ে গেছে। হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ আহমদ ইয়াজিদের কাফন-দাফনের আয়োজন শুরু করেন। এসময় দেখতে পেলেন অসংখ্য মানুষ কবরস্থানের দিকে ছুটে আসছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এদিকে কোথায় যাচ্ছো?" তারা বললো, "ইয়া শায়খ! আপনি জানেন না, গত রাতে শহরের সকল মানুষ একটি গায়েবি আওয়াজ শুনেছেন: 'যে কেউ আল্লাহর এক নির্বাচিত বন্ধুর জানাযায় শরীক হতে আগ্রহী সে যেনো সুনিজিয়া কবরস্থানে চলে যায়।' এ গায়েবী সংবাদ শ্রবণ করে আমরা ছুটে এসেছি।"

তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা

১. হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ নিচের ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন:
"একদিন আমি হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহকে দেখতে যাই। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি জানতে চাইলাম, "কী হয়েছে শায়খ?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার মধ্যে একটি বিশেষ চিন্তা জাগ্রত হয়েছে। আজ রাত আমি পানির জগটি টাঙ্গিয়ে রাখবো ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য। একটি স্বপ্ন দেখলাম, একজন হুর আমাকে এ কথাটি বলছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার সাথী? সে বললো, 'আমি

ঐ ব্যক্তির সাথী যে পানি ঠাণ্ডা করার জন্য জগ টাঙ্গিয়ে রাখে না। এর পর আমার টাঙ্গানো জগটি সে টেনে মাটিতে ফেলে দিলো। এই দ্যাখো সে জগটি!' হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি দেখলাম, জগের ভাঙ্গা টুকরোগুলো মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এই টুকরোগুলো সেখানে এভাবেই ছিলো।”

২. নিচের বর্ণনাটিও হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন:
“এক রাতে আমি শান্তিমতো ঘুমোচ্ছিলাম। জেগে ওঠার পর আমার গোপন আত্মা আমাকে নির্দেশ দিলো সুনিজিয়া কবরস্থানে যেতে। আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম এক ব্যক্তি উপস্থিত আছে। তাঁর চেহারা ভয়ঙ্কর। আমি ভয় পেলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, “হে জুনাইদ! তুমি কী আমাকে ভয় পাচ্ছো?”
জবাব দিলাম, “জী, ভয় পাচ্ছি।”
সে বললো, “তুমি যদি আল্লাহকে জানার মতো জানতে তাহলে একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে না।”
আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কে?”
জবাব দিলো, “ইবলিস!”
আমি বললাম, “আমি তোকে দেখতে চেয়েছিলাম।”
সে বললো, “যে মুহূর্তে তুমি আমাকে দেখেছো, সে মুহূর্তে নিজের অজান্তেই আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে। তুমি কেনো আমাকে দেখতে চেয়েছিলে?”
আমি বললাম, “আমি জানতে চাচ্ছি, ফকরদের [দুনিয়াবিমুখদের] ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা আছে কী না?”
সে বললো, “না!”
জিজ্ঞেস করলাম, “কেনো নয়?”
সে বললো, “আমি যখনই তাদেরকে দুনিয়াবী বিষয়ে জড়িয়ে দিতে চাই, তখনই তারা পরকালের দিকে পাড়ি জমায়। আর যখন আমি পরকালীন বিষয়ে তাদেরকে জব্দ করতে চাই তখনই তারা প্রভুর দরবারে ছুটে যায়। আর ওখান পর্যন্ত যাওয়া আমার জন্য সম্ভব নয়।”
পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি যেহেতু তাদেরকে জব্দ করতে অপারগ, তুমি কী তাদের দেখতে পাও?”
সে জবাব দিলো, “আমি দেখতে পাই। যখন তারা সা'মায় যেয়ে ওয়াজদের [আধ্যাত্মিক পরমানন্দ] অবস্থায় পড়ে। আমি তাদের পরমানন্দ ও বিরহ-বেদনার চিৎকারের সূত্র দেখতে পাই।” একথা বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমি মসজিদের ভেতর প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম সেখানে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ হাটুর উপর মাথা রেখে [মুরাক্বাবার অবস্থায়] বসে আছেন। [আমি কিছু বলার পূর্বেই] তিনি আমাকে বললেন, "সে [ইবলিস] মিথ্যাবাদী! সে হচ্ছে আল্লাহর দুশমন।" মাথা উত্তোলন করে বলতে থাকেন, "তাঁরা [ফকরকারীরা] আল্লাহর নিকট এতো বেশি মূল্যবান যে, তাঁদেরকে তিনি কখনো ইবলিসকে দেখতে দেন না।"

৩. হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর একজন বোন ছিলেন। তিনি ভাইয়ের নিকট অনুমতি চাইলেন: "আমাকে আপনার কক্ষটি ঝাড়ু দেওয়ার সুযোগ দিন।" হযরত সাক্বাতী এতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "আমার জীবন এতটুকু মূল্যবান নয়।"
একদিন তাঁর এ বোন হযরতের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধা ঝাড়ু দিচ্ছেন। ভাইকে অভিযোগের সুরে বললেন, "আপনি নিজের বোনকে ঝাড়ু দিতে অনুমতি দিলেন না। এখন দেখছি একজন বেগানা বৃদ্ধাকে অনুমতি দিয়েছেন, যে আপনার পরিবারের কেউ নন?"
হযরত সিররি সাক্বাতী বোনকে বুঝিয়ে বললেন, "বোনটি আমার! রাগ করো না। এই মহিলা আমার প্রতি আসক্ত ছিলো, কিন্তু আমি তাকে আশ্রয় দিই নি। সে তখন আল্লাহর দরবারে আবদার জানালো, আমার কক্ষটি ঝাড়ু দেওয়ার অনুমতি চেয়ে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ কাজে নিয়োজিত হতে অনুমতি দান করেছেন।"

৪. একদিন হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ কোথাও যাচ্ছিলেন। লক্ষ করলেন রাস্তার পাশে মদ্যপ এক ব্যক্তি 'আল্লাহ! আল্লাহ!' বলছে। হযরত এগিয়ে গিয়ে তার মুখমণ্ডল ভালো করে ধুয়ে দিলেন। এরপর মন্তব্য করলেন, "লোকটি জানে না, অপবিত্র মুখে সে সর্বাধিক পবিত্র নামটি উচ্চারণ করছে!" হযরত চলে যাওয়ার পর মদ্যপ লোকটির হুশ ফিরে আসলো। উপস্থিত লোকজন হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর হাতে তার মুখমণ্ডল ধৌত করার ব্যাপারটি তাকে বললো। সে লজ্জিত হলো। নিজের নফসকে সে ধিক্কার দিতে লাগলো। বললো, "হে আমার দুষ্ট নির্লজ্জ নফস! হযরত সিররি সাক্বাতী তোকে মদ্যপ অবস্থায় দেখে গেছেন। এবার তুই আল্লাহকে ভয় ও তাঁর দরবারে তাওবাহ কর!" সুতরাং সে মদপানের নেশা ছেড়ে ইবাদতের নেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো।

এদিকে ঐদিন রাতে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ একটি গায়েবি আওয়াজ শ্রবণ করলেন:

"তুমি আমার সম্মানে তার মুখমণ্ডল ধুয়ে দিয়েছো।
আর আমি তার অন্তরকে ধুয়ে দিয়েছি তোমার সম্মানে।"

হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর চরিত্র-মাধুর্য

তিনি ছিলেন আহলে তাসাওউফের ইমাম। শরীয়ত ও তরিকতের ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। এতো বড় মাফের জ্ঞানবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো অনন্যসাধারণ।

মানুষের প্রতি তাঁর দয়া-মুহাব্বাতের উপমা পাওয়া যায় সমসাময়িক ওলিআল্লাহ হযরত বিশরে হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেন, "আমি কখনো কারোর নিকট থেকে কোনোকিছু চাইতাম না। তবে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর নিকট আবদার জানাতাম। কারণ আমি জানতাম তিনি হচ্ছেন উচ্চমানের একজন পরগেজগার ওলিআল্লাহ এবং দাতা।"

ইবাদত

কথিত আছে, হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ দৈনিক এক হাজার রাকাআত নফল নামায পড়তেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হযরত সাক্বাতীর মতো বড়ো কোনো আবিদ [উপসনাকারী] ও জাহিদ [কঠোর সাধক] দেখি নি। তাঁর দীর্ঘ জীবনভর নিজের মধ্যে ইবাদত ও জুহদের মাক্বাম সমুন্নত ছিলো। এমনকি ৯৮ বছর বয়সেও তিনি ক্ষান্ত হন নি। যে সময় এগুলোর সমাপ্তি ঘটে তা ছিলো হযরতের মৃত্যুর ক্ষণটি।"

সবর অবলম্বনের ব্যাখ্যা

একদিন হযরত সিররি সাক্বাতীর একজন মুরিদ প্রশ্ন করলেন, "ইয়া শায়খী! আমাদেরকে সবর সম্পর্কে উপদেশ দিন।" হযরত সাক্বাতী সবরের ওপর বেশ দীর্ঘ আলোচনায় নিমগ্ন হলেন। এক পর্যায়ে দেখা গেলো একটি বিচ্ছু এসে তাঁর পায়ে কামড়াতে লাগলো। তিনি সম্পূর্ণ অনড় থেকে বয়ান অব্যাহত রাখলেন। একজন মুরিদ বললেন, "হযরত! একটা বিচ্ছু আপনার পায়ে কামড় দিচ্ছে। এটিকে সরিয়ে

দিন!” তিনি বললেন, “আমি সবর সম্পর্কে বয়ান করছি, সুতরাং কীভাবে এ কাজটি করি?”

উপদেশমূলক বাণী

১. তিনি বলেন, “সত্যিকার মা’রিফাতলাভকারী তাওহীদের মধ্যে অবস্থান করেন।
২. আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বাধিক বড়ো শাস্তি হচ্ছে, বান্দাকে তাঁর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত রাখা।
৩. তিনি দুআ করতেন, “হে আল্লাহ! যাকিছু শাস্তি আপনি আমাকে দেন না কেনো আমি মাথা পেতে গ্রহণ করতে রাজী। কিন্তু দয়া করে আমার থেকে আপনি পর্দার আড়ালে থাকার শাস্তি দিয়ে বেইজ্জত করবেন না।”
৪. যুবক বয়সে তিনি বলতেন, “যুবক অবস্থায় আল্লাহর উপসনায় লেগে থাকো।”
৫. ঐসব ব্যক্তির সংসর্গ পরিত্যাগ করো যে ধনী প্রতিবেশী, ধনী বুদ্ধিজীবী ও কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণকারী।
৬. সমগ্র পৃথিবী মূল্যহীন শুধুমাত্র ৫টি জিনিস ছাড়া: (১) বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাবার, (২) পিপাসা নিবারণের জন্য পানি, (৩) শরীর ঢাকার জন্য বস্ত্র [সতর], (৪) থাকার জন্য কুঠির ও (৫) নেক আমলের জন্য যথেষ্ট জ্ঞান।
৭. প্রয়োজনের তাগিদে গোনাহের কাজ ক্ষমাযোগ্য হতে পারে। কিন্তু আত্ম-গরিমা ও ফখর ক্ষমার অযোগ্য। এগুলো পরিত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই।
৮. যে কেউ নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সে কীভাবে অপরের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে? [অর্থাৎ নফসের তাবেদার পীর তাঁর মুরীদের কোনো উপকার করতে পারেন না। -গ্রন্থকার]
৯. ঐশি নৈকট্যশীলতার মাত্রাই নির্ধারণ করে আধ্যাত্মিক ফিরাসাতের [ধীশক্তির] স্তর।
১০. যে কেউ পবিত্র কুরআনের রহস্য সম্পর্কে ধ্যান-ফিকির করে, সে-ই হাক্বিক্বাতের প্রাজ্ঞতা লাভে ধন্য হতে পারে।
১১. আ’রিফের আধ্যাত্মিক স্তর উন্নত। তিনি অল্প খাবার ভক্ষণ করেন, অল্প নিদ্রা যান ও অল্প বিশ্রাম করেন। তিনি হচ্ছেন, রাতের উজ্জ্বল চাঁদের মতো। যার থেকে জ্যোৎসার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নূর মানুষকে দেখায় সীরাতুল মুস্তাক্বীম। ভাগ্যবান হৃদয়ে এ আলো যেনো নতুন জীবনের পানীয়।
১২. তাঁর [আল্লাহর] মধ্যে ফানার মাধ্যমে আ’রিফ প্রশান্ত হন।

১৩. সর্বাধিক উত্তম আচরণ হলো মানুষের নিপীড়নকে ধৈর্যসহ মুকাবিলা করা। অন্যায়কারীর মতো নিজেও তার প্রতি অন্যায় না করা।

১৪. আমি দৈনিক অনেকবার নিজের নাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আমার ভয় হয় মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় কী না।

১৫. সকল মানুষের দুঃখকষ্ট নিজে বহন করতে আমি ইচ্ছে পোষাণ করি।

১৬. যে কেউ আল্লাহর আনুগত্য করে ইখলাসের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্ব তার প্রতি আনুগত্যশীল হবে।

১৭. জিহ্বা ও চেহারা হৃদয়ের অবস্থা উন্মোচন করে। তবে হৃদয় হচ্ছে তিন ধরনের: (১) প্রথমটি যেনো একটি বড়ো পর্বত যা সম্পূর্ণ ধীর-স্থির। (২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৃক্ষের মতো যার মূল শক্ত হলেও কাণ্ড, ডাল-পালা ও পত্রগুলো বাতাসে আন্দোলন করে। (৩) তৃতীয়টি হচ্ছে পাখিদের মতো যা আকাশে এদিক-সেদিক উড়ে চলে।

১৮. সিদক্ব [সত্যবাদিতা] ঐ ব্যক্তি অর্জন করে না, যে মানুষের সঙ্গে অতিবেশি মেলামেলা করে।

১৯. আল্লাহর একান্ত নৈকট্যশীল ক্ষণে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ প্রায়ই বলতেন, "হে আল্লাহ! আপনার মাহাত্ম্য আমাকে যাচঞা থেকে বিরত রেখেছে। আপনার মা'রিফাত আমাকে নৈকট্যের মর্যাদা দান করেছে ও জিহ্বা দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনায় অপারগতা সৃষ্টি করেছে। আমি কখনো চেষ্টা করবো না জিহ্বা দ্বারা আপনার গুণগাণ করতে! কারণ আপনার মহান ও অসীম গুণাবলী প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার জিহ্বায় নেই।"

২০. যে কেউ প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাউকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।

২১. তিনি একদা বললেন, "মানুষের শান্তির মূলে আছে ৫টি বিষয়: (১) দুষ্ট লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা। (২) ভালো লোকের সঙ্গ লাভ করা। (৩) সাধারণ মানুষ থেকে পারতপক্ষে দূরে থাকা। (৪) নিজের আমলের প্রতি খেয়াল রাখা। (৫) অপরের দোষত্রুটি অন্বেষণ থেকে বিরত থাকা।" তিনি আরো বললেন, "মানুষকে ৫টি নাফসানী রোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। এগুলোর চিকিৎসক হচ্ছেন কামিল পীর। (১) মুনাফিকী, (২) ঝগড়া-ফাসাদ, (৩) শাহওয়াত [অবৈধ যৌনাকর্ষণ], (৪) লোকদেখানো আমল বা দর্শনেচ্ছু ও (৫) প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনোলোভ।" আরো বললেন, "৫টি বিষয় থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়া চাই: (১) কৃপণতা, (২) উচ্চাকাঙ্ক্ষা, (৩) রাগ-গোস্বা, (৪) লালসা ও (৫) অতিভক্ষণ।"

২৯. হযরতের প্রধান খলিফা জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ একদিন ভোরে তাঁকে দেখতে গেলেন। হযরত বললেন, "আবুল ক্বাসিম! আজ আমাকে কিছুটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার আত্মাকে বলা হলো, 'হে সিররি! আমি মানুষকে সৃষ্টি করার পর তারা আমার দিকে ধাবমান ছিলো। তারা আমার দিকে আসছিলো। আমি যখন তাদেরকে দুনিয়া দেখালাম, তখন দশ জনের নয় জনই দুনিয়ামুখী হয়ে গেলো। দশ জনের একজন মাত্র আমার সঙ্গে রইলো। এরই [যে দশ জনের একজন আল্লাহর সঙ্গে রইলো- সেই দলের] মধ্যে তাদেরকে যখন আমি বেহেশতের কথা বললাম, তখন দশ জনের ১ জন আমার সঙ্গে রইলো আর বাকীরা বেহেশত লাভের আশায় নিমগ্ন হলো। যখন আমি [যে একজন আল্লাহর সাথী -সেই দলের] সকলের ওপর কিছুটা দুঃখ-ক্লেশ-যাতনা [পরীক্ষা করতে] আপতিত করলাম তখন দশ জনের একজন কষ্ট সহ্য করেও [পরীক্ষায় পাশ করে] আমার সঙ্গে থাকলো আর বাকিরা অধৈর্য হয়ে দূরে সরে পড়লো। আমি তখন [এখনও] সঙ্গে থাকা সাথীদের বললাম, "তোমরা না দুনিয়াকে চেয়েছো না চেয়েছো বেহেশত। না তোমরা আমার থেকে পতিত [পরীক্ষাস্বরূপ] ক্লেশ-কষ্ট থেকে পালিয়ে গিয়েছো। তোমরা কী চাও?" তারা বললো, "আপনি জানেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা কী?" আমি বললাম, "আমি তোমাদের উপর এমন ভারী বিপদ-বিপর্যয় পতিত করবো যে, এর ভর পাহাড়-পর্বতও বহন করতে পারবে না।" তারা জবাব দিলো, "হে প্রভু! যদি তা একমাত্র তোমার পক্ষ থেকে আসে তাহলে আমরা তা মাথাপেতে বরণ করবো!" [এ দলটিই হচ্ছেন মহাত্ম আউলিয়ায়ে কিরাম- গ্রন্থকার।]

মৃত্যুকালীন অবস্থা

হযরত সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর প্রধান খলিফা ও ভাগিনা যুগশ্রেষ্ঠ শায়খ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, "হযরত সিররি সাক্বাতী যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমি তাঁকে দেখতে যাই। তাঁর নিকটেই একটি পাখা ছিলো। আমি সেটি হাতে নিয়ে তাঁকে বাতাস দিতে থাকি। তিনি তখন বললেন, "হে জুনাইদ! পাখাটি রেখে দাও। আগুন বাতাস থেকেও শক্তিশালী।" আমি তাঁর অবস্থা জানতে চাইলাম। এরপর বললাম, 'আমাকে নসিহত করুন।' তিনি বললেন, "মানুষের সংসর্গ হেতু আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত থেকে নিজেকে দূরে ঠেলে দেবে না।" এর পরই তিনি এ মায়াবী পৃথিবী থেকে চলে গেলেন তাঁর প্রভুর দরবারে।" ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হিজরি ২৫৩ সনে তিনি

ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ মহান ওলির মাক্বামাতকে উন্নত করুন। সংরক্ষণ করুন তাঁর গোপন রহস্যাবলী।

সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকানুযায়ী হযরত সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং এখন আমরা এ মহাত্মন ওলিআল্লাহর জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনা করবো। হে প্রভু! আমরা আপনার পক্ষ থেকে তাওফিক কামনা করছি। আপনার ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া একটি অক্ষরও লেখার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হযরত শায়খ আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু - ২৯৮ হিজরি, সমাধি - বাগদাদ, ইরাক)

মহাত্মন এই যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহর পূর্ণ নাম হলো আবুল ক্বাসিম জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ খাজ্জাজ নাহাওয়ান্দী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর পিতা হযরত মুহাম্মদ খাজ্জাজ ছিলেন কাচ ব্যবসায়ী। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর ভাগিনা ছিলেন। তিনি হযরত হারিস মুহাসিবী রাহিমাহুল্লাহর সাথী এবং অন্যান্য সমসাময়িক ওলিদের শায়খ ছিলেন। হযরত বিশরে হাফি, হযরত আবু বকর শিবলী, হযরত মনসুর হাল্লাজ প্রমুখ বিখ্যাত ওলিগণ তাঁরই যুগে বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সুফিকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর উপাধি ছিলো, "সাঈদুত তায়িফা" [সুফি-দরবেশ দলের নেতা]। তিনি বাগদাদে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন এবং এখানেই ইন্তিকাল করেন।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম সন নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য আছে। তিনি যে ২১০ থেকে ২১৫ হিজরি সনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে তাঁর মৃত্যুসন যে ২৯৮ হিজরি তা অনেকটা নিশ্চিত। হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক স্ব-প্রণীত ওলিদের জীবনীগ্রন্থ 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'য় লিপিবদ্ধ করেছেন।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর জন্ম বাগাদাদে হলেও তাঁর পূর্বপূরুষ ছিলেন পারস্য অধিবাসী। আধুনিক যুগের ইরানের নিহাওয়ান্দ ছিলো তাঁদের বাসস্থান। অল্প বয়সে পিতৃহারা ইয়াতীম জুনাইদকে স্বীয় মামা হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ লালন-পালন করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু সওর, হযরত আবু উবাইদ, হযরত হারিস মুহাসিবী এবং তাঁর মামা সিররি ইবনে মুগাল্লিস সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর ফিকাহ ও হাদিস শাস্ত্রের উস্তাদ ছিলেন হযরত হারিস মুহাসিবী রাহিমাহুল্লাহ। কথিত আছে জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ এ উস্তাদের নিকট পাঠ

গ্রহণে যাত্রার সময় স্বীয় মামা সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ উপদেশ দেন, "যাও! তাঁর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো, আল্লাহ তোমাকে একজন ফকীহ সুফিতে পরিণত করুন, সুফি ফকীহতে নয়।"

তাসাওউফের উস্তাদবৃন্দ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর তাসাওউফ শাস্ত্রের একাধিক উস্তাদ ছিলেন। অবশ্য সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন স্বীয় মামা ও মুর্শিদ হযরত সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আরো যাঁদের সুহবত থেকে তিনি উপকৃত হন তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন: হযরত আবু আবদুল্লাহ হারিস ইবনে আসআদ মুহাসিবী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২৪৩ হিজরি], হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ আলী কাসসাব রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২৭৫ হিজরি], আবু জাফর কারানবী বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম [মৃ. ২৬০ হিজরি], আবু হাফস আমর ইবনে সালামা হাদ্দাদ নিশাপুরী [মৃ. ২৬০ হিজরি], আবু জাফর ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ ইবনে জাফর রাজী [মৃ. ২৫৮ হিজরি] ও আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন হুসাইন ইবনে আলী রাজী [৩০৪ হিজরি]।[১৩]

অল্প বয়সে প্রভুপ্রেমের আকর্ষণ

হযরত জুনাইদ যখন বালক মাত্র তখনই প্রভুপ্রেমের বিরহ-যন্ত্রণা অনুভব করেন। এরপরও তিনি খুব সহজে ও দ্রুত যে কোনো বিষয়ের মর্মার্থ অনুধাবক করতে পারতেন। এছাড়া ছোট থেকেই তিনি অত্যন্ত শাণিত ও উজ্জ্বল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর মামা হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। বালক জুনাইদের মধ্যে যে উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান তা তাঁর উচ্চ ফিরাসাতের অধিকারী মামা সহজেই অনুধাবন করেছিলেন।

বাল্যকালীন হজ্জপালন

নিজের তত্তাবধানে থাকা এ মূল্যবান রত্ন জুনাইদকে নিয়ে হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ পবিত্র হজ্জ পালনে মক্কা মুকাররমায় ভ্রমণে যান। তখন জুনাইদের বয়স মাত্র ৭ বছর। হজ্জ পালন শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় যেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু

[১৩] The Life, Personality and Writings of Al-Junayd by Ali Hassan Abdul Kadir, Islamic Book Trust 2013.

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের নিকট দাঁড়িয়ে বালক জুনাইদ ভক্তিভরে সালাম পেশ করেন। একদিন মসজিদে নববীতে প্রায় ৪ শত শায়খ জমায়েত হলেন। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে 'শুকুর' এর সংজ্ঞার ওপর বক্তারা বিভিন্ন মতামত দিতে থাকেন। সবাই নিজ নিজ অভিমত পেশ করার পর হযরত সিররি সাক্বাতী ৭ বছর বয়সের ভাগিনা জুনাইদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা জুনাইদ! শুকুর সম্পর্কে তোমার মতামত কী বলো?"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে প্রথমে বালক জুনাইদ লজ্জাবোধ করলেন। উপস্থিত অন্যান্য এক-দু'জন শায়খ তাঁকে অভয় দান করে বললেন, "বলো, তুমি কী মনে করো? আমরা নিরবে শুনবো। ভয় করো না।"

হযরত জুনাইদ সাহস সঞ্চার করে বললেন, "সত্যিকার শুকুর হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত অসংখ্য যেসব নিয়ামত আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলোর দ্বারা আপনি তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হবেন না। না আপনি তাঁর দয়ার দানসমূহকে নাফরমানীর সূত্রে পরিণত করবেন।" এ কথাটি শ্রবণ করে সবাই একযোগে বললেন, "শুকুরের সংজ্ঞা এর চেয়েও উন্নতমানের হতে পারে না!" হযরত সিরসি সাক্বাতী জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভাগিনা! তুমি এসব কোত্থেকে শিখলে?" তিনি জবাব দিলেন, "আপনার সুহবতে বসে!"[১৪]

আধ্যাত্মিক ভ্রমণ

পবিত্র হারামাইন শরিফাইন ভ্রমণ শেষে বাগদাদে ফিরে এসে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ দ্বীন শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। তবে এ অল্প বয়সেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন ইবাদত-বন্দেগী করে। অন্যান্য সমবয়সী বালকদের সাথে খেলাধূলায় মেতে ওঠতে তিনি আনন্দবোধ করতেন না। প্রায়শই দেখা যেতো, স্বীয় অভিভাবক মামার বাড়ির একটি কক্ষে বসে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আছেন। জাগতিক বিষয়-আশয় তাঁর পীড়া দিতো। তাই এসব থেকে দূরে সরে থাকতে ভালোবাসতেন।

[১৪] তাজকিরাতুল আউলিয়া, হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ।

পরিণত বয়সে তিনি কাচ বিক্রির ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। এরপরও ইবাদত-বন্দেগী, জিকির-ফিকির থেকে তিনি একেবারেই গাফিল হন নি। হযরত মুহাম্মদ আবদুল হক আনসারী হযরত জুনাইদ বাগদাদীর উদ্ধৃতি দিতে যেয়ে লিখেছেন, "আল্লাহর বান্দাকে বর্জন করতে হবে স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষাকে, মুছে দিতে হবে মানবিক গুণাবলীকে, পরিত্যাগ করতে হবে স্বার্থপর প্রবৃত্তিকে, আবাদ করতে হবে আধ্যাত্মিক গুণাবলী, অনুরক্ত হতে হবে হাক্বিক্বাতের জ্ঞানের প্রতি, চিরন্তন জীবনের জন্য উপকারী আমল করতে হবে, উত্তম কামনা করতে হবে সমগ্র উম্মাহর জন্য, আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ভরসা রাখতে হবে, আর শরীয়ত অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে।"[১৫]

মহাত্মন ওলিআল্লাহ ও নিজের মামা হযরত সিররি সাক্বাতীর হাতে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ অল্প বয়সেই বাইআত গ্রহণ করে মুরিদ হয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ ৪০ বছর তাঁরই সুহবতে থেকে কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা-জুহদ-খিলওয়াত-জিকির ইত্যাদি আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলার সুদৃষ্টির ফলে আধ্যাত্মিক সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হন। তিনি পরবর্তীতে বলেন, "দীর্ঘদিন সাধনার পর একদা আমি ভাবলাম, এবার বুঝি কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে উপনিত হয়ে গেছি। সাথে সাথে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ইলহাম হলো: 'জুনাইদ! এখন আমার সময় হয়েছে তোমাকে তোমার কোমরবন্দ [অমুসলিমদের পরিচিতির জন্য সে যুগে ব্যবহৃত কোমরবন্ধ] উন্মোচন করে দেখানো!' একথা শ্রবণ করে আমি অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "হে প্রভু! জুনাইদ কোন্ পাপটি করলো?" শুনতে পেলাম এই কথাটি: 'নিজের অস্তিত্ব থাকার মতো কঠিন কোনো পাপ আছে বলে তুমি মনে করো কী?' তিনি আরো বলেন, "আমি সাথে সাথে মাথানত করলাম। নিজে নিজেই মৃদু স্বরে বললাম, যে কেউ আল্লাহর মধ্যে ফানার যোগ্যতা লাভ করে নি, তার সকল ভালো আমল মূল্যহীন!"

যুগের অনেক বাহ্যিক আলিম ও হিংসুক দ্বারা তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দুকরা স্বয়ং খলিফার নিকট সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত অভিযোগ উত্তাপন করে।

---

[১৫] Ansari, Muhammad Abdul Haq. "The Doctrine of One Actor: Junaid's View of Tawhid." The Muslim World 1(1983): 33–56. Electronic. Source: en.wikipedia.org/

তবে খলিফা তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন: "কোনো প্রমাণ ছাড়া তাঁকে বলপূর্বক বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।"

তারা বললো, "তাঁর কথা ও উপদেশ দ্বারা অনেক লোক বিভ্রান্ত হচ্ছে।"

খলিফা তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন এক পরমাসুন্দরী তরুণী খাদিমাহ হিসেবে। এই মেয়েটিকে তিনি ৩ হাজার দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। খলিফা ক্রীতদাসী মেয়েকে বললেন, "খুব উত্তম ও মনোমুগদ্ধকর বস্ত্র ও অলঙ্কার পরে সাজগোজ করো। এরপর অমুক জায়াগায় চলে যাও। হযরত জুনাইদ বাগদাদীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের মুখের পর্দা উন্মোচন করবে। নিজের বাহার প্রদর্শন শেষে তাঁকে বলবে, "আমি অনেক সম্পদের মলিকা। কিন্তু আমার অন্তর দুনিয়াদারিত্বের প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে। আমি আপনার দরবারে এসেছি যাতে আপনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন এবং গ্রহণ করে নেবেন। আমি বাকি জীবন আপনার খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করবো আল্লাহর ওয়াস্তে। আমার অশান্ত হৃদয় আপনি ছাড়া কারোর নিকট শান্তি খুজে পাচ্ছে না।" এরূপ বলে নিজেকে খোলামনে প্রদর্শন করতে থাকবে। যাকিছু সম্ভব তা-ই করেও তাঁকে প্ররোচিত করবে।"

তরুণী একজন পুরুষ ভৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর নিকট উপস্থিত হলো। উপরে উল্লেখিত নির্দেশনা মুতাবিক সবকিছু বললো। যে কোনো মানুষ সামনে আসলে সম্ভাবতই দৃষ্টি পড়ে। এভাবে দৃষ্টি পড়লো তরুণীর প্রতি হযরত জুনাইদের। তিনি দৃষ্টি সরে নিয়ে নিরব রইলেন। কোনো জবাব দিলেন না। তরুণী তার আবদার পুনরায় ব্যক্ত করলো। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ উপরের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন। এরপর "আহ!" বলে একটি শ্বাস তরুণীর দিকে ছুড়ে দিলেন। সাথে সাথে তরুণী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণ পরই সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

দাসীর সঙ্গী ভৃত্য খলিফার নিকট দ্রুত ফিরে এসে যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিলো। মনে হলো খলিফার অন্তরে আগুন লেগেছে! তিনি কতো বড়ো পাপ করেছেন তা অনুধাবন করে বার বার তাওবাহ করতে লাগলেন। নিজে নিজেই বলতে থাকেন: "যে কেউ অপরের প্রতি আচরণ করে যা করা উচিৎ নয়, দর্শন করে যা সে দেখার

কথা নয়।” আরো বললেন, “এরূপ মহাত্মন ব্যক্তিকে আমার নিকট ডেকে পাঠানো বে-আদবি হবে।” তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে চললেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বার দিকে।

খলিফা হযরত বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম জানিয়ে বললেন, “ইয়া শায়খ! আপনার অন্তর এরূপ একটি সুন্দরী নারীকে ধ্বংস করে দিতে কীভাবে রাজী হলো?”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, “হে আমীরুল মু'মিনীন! নিন্দুকদের প্রতি আপনার দয়ার মাত্রা এতোই বেশি হয়ে গেলো যে, তাঁদের কিছু অভিযোগের বদলা হিসেবে আমার চল্লিশ বছরের সাধনাকে ধূলিস্মাৎ করতে উদ্যোত হলেন! কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি কে বিচার করার? আপনিও যে অনুরূপভাবে ধরাশায়ী হতে পারেন, তার কী কোনো নিশ্চয়তা আছে?” খলিফার মাথা নিন্মমুখী হয়ে পড়লো। বার বার ক্ষমা চেয়ে হযরতের নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।[১৬]

এ ঘটনার পর তাঁর সুনাম দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শরীয়ত ও তরিকতের উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জনসমক্ষে ওয়াজ-নসিহত করা থেকে বিরত থাকেন। মানুষ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবে ভেবে একদা যুগের ৩০ জন বিশিষ্ট ওলিআল্লাহ তাঁকে ওয়াজ-নসিহত করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি বললেন, “আমার শায়খ [হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ] জীবিত থাকতে ওয়াজ-নসিহত করা ভীষণ বে-আদবি হবে।”

এরপর একদিন স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন: “হে জুনাইদ: তুমি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান

---

[১৬] হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর জীবদ্দশায় [৮২৫-৯১০ ঈসায়ী] বাগদাদের মসনদে যে কজন আব্বাসী খলিফা উধিষ্ঠিত ছিলেন তারা হলেন: আল-মামুন [৮১৩-৮৩৩], আল-মু'তাসিম বিল্লাহ [৮৩৩-৮৪২], আল-ওয়াসিক্ব বিল্লাহ [৮৪২-৮৪৭], আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ [৮৪৭-৮৬১], আল-মুনতাসির বিল্লাহ [৮৬১-৮৬২], আল-মুসতা'ইন বিল্লাহ [৮৬২-৮৬৬], আল-মু'তাজ বিল্লাহ [৮৬৬-৮৬৯], আল-মুহতাদি বিল্লাহ [৮৬৯-৮৭০], আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ [৮৭০-৮৯২], আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ [৮৯২-৯০২], আল-মুকতাফি বিল্লাহ [৯০২-৯০৮] এবং আল-মুক্বতাদির বিল্লাহ [৯০৮-৯২৯]। উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর বয়স উল্লেখ করেন নি। তবে যদি আমরা ধরে নিই হযরতের বয়স চল্লিশ বা এর উপরে ছিলো, তাহলে যে খলিফা এ ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত তিনি মুসতা'ইন বিল্লাহ থেকে মুক্বতাদির বিল্লাহ পর্যন্ত যে কোনো ব্যক্তি হতে পারেন। সঠিক কথা একমাত্র আল্লাহ ত'আলা জ্ঞাত। - গ্রন্থকার।

জানাও।” ভোর জেগে ওঠে তিনি চলে গেলেন হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর সম্মুখে। শায়খ তখন একটি দরোজার সামনে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি তাঁর খলিফাকে দেখে বললেন, “এ পর্যন্ত তুমি অপেক্ষায় ছিলে কেউ তোমাকে নির্দেশ না দিলে জনসমক্ষে ওয়াজ করবে না। এবার তো নির্দেশ পেলে! সুতরাং ওয়াজ করো- কারণ তোমার বয়ান দ্বারা সমগ্র বিশ্ব বহুদিন যাবৎ উপকৃত হবে। খুঁজে পাবে পথভ্রষ্ট মানুষ সীরাতুল মুস্তাক্বিম। তবে তোমার মুরিদান যখন তোমাকে নসিহত করার অনুরোধ জানিয়েছে তখন তুমি কিছু বলো নি, বাগদাদের বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম অনুরোধ করেছেন, তখনও তুমি রাজী হও নি, এমনকি আমার অনুরোধেও তুমি ওয়াজ করতে নারাজ ছিলে। এবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তোমাকে বয়ান করতেই হবে।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ অবাক হয়ে বললেন, “আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন! ইয়া শায়খী! আপনি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার স্বপ্নযোগে জিয়ারতের সংবাদ জানলেন কী করে?”

সিররি সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন, “আমি স্বপ্নযোগে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের দীদার লাভ করেছি। তিনি আমাকে জানালেন, ‘আমি আমার রাসূলকে পাঠিয়েছি, জুনাইদকে বলো- সে যেনো মিম্বরে বসে মানুষকে নসিহত করে।”

এবার হযরত জুনাইদের অন্তরাত্মায় ইশকে ইলাহীর স্পর্শ লাগলো। রোমাঞ্চকর শিহরণে যেনো ভিজে গেলো তাঁর তনু-মন-প্রাণ প্রেমাগ্নির উষ্ণতা ও অনুরাগের শীতল সুধার মিশ্রণে। তিনি বলে ওঠলেন, “আমি কথা বলবো- বলবো, তবে একটি শর্ত আছে হযরত! তাহলো আমার শ্রোতাদের সংখ্যা চল্লিশের বেশি হবে না।”

লেখক হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ খুব বেশি গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে তাঁর রচিত নিচের কটি কিতাব সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। এগুলো হলো:

১. কিতবুল আমছালুল কুরআন।

২. কিতাবুর রাসাঈল।

৩. শরহে শাতিয়াত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী।

৪. আল-মুনাজাত।

৫. তাশিহুল ইদারা।

জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর বয়ান

১. ইশকের প্রাবল্য: শর্ত মুতাবিক এক ওয়াজ মাহফিলে ৪০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কথিত আছে হযরত বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর এদিনকার বয়ানে 'ইশকে ইলাহীর' প্রভাব এতোই বেশি ছিলো যে, বয়ানের সময় ১৮ ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং আরো ২২ জন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এদেরকে মানুষ কাঁধে তুলে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছুয়ে দেয়।[১৭]

২. সাধনার উপমা: এক বয়ানে তিনি বলেন, "দীর্ঘ ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে নিজের ক্বলবের প্রতি পাহারাদার হিসেবে। এরপর আরো দশ বছর চলে যায় যখন আমার ক্বলব আমাকে পাহারা দেয়। আর এ পর্যন্ত বিশ বছর গত হয়ে গেছে, আমি নিজের ক্বলব সম্পর্কে কিছুই জানি না এবং ক্বলবও আমার সম্পর্কে কিছু জানে না।" এরপর আবার বললেন, "ত্রিশ বছরব্যাপী আল্লাহ জুনাইদের সঙ্গে কথা বলেছেন জুনাইদের জিহ্বা ব্যবহার করে। তখন জুনাইদ সেখানে ছিলোই না- না এ ব্যাপারে কোনো মানুষ অবগত ছিলো।"

৩. আল্লাহর নূরে অবলোকন: একদিন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ জামে মসজিদের মিম্বরে বসে ওয়াজ-নসিহত করছিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন যুবক এগিয়ে এসে হযরতকে বললো, "রাসূলুল্লাহর হাদিস শরীফে আছে, 'ঈমানদারের অন্তরের ব্যাপারে শতর্ক থেকো। কারণ সে আল্লাহর নূরে দেখতে পায়।"

হযরত জুনাইদ যুবকের দিকে ক্ষণকাল তাকালেন। এরপর বললেন, "এরূপ ফিরাসাত [অন্তরদৃষ্টি] লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে তোমাকে মুসলমান হতে হবে। সুতরাং, হে যুবক! তুমি তোমার খ্রিস্টান কোমরবন্ধ কেটে ফেলো! এখন হচ্ছে মুসলমানদের যুগ।"

---

[১৭] Sells, Michael A.. Early Islamic Mysticism: Sufi, Koran, Mi'raj, Poetic and Theological Writings. Mahwah, New Jersey: Paulist Press, 1996. ফরিদুদ্দীন আত্তার [রা.]- তাজকিরাতুল আউলিয়া।

হযরতের এ বক্তব্যের পরই সবাই দেখলো যুবকটি আবেগপ্রবণ অবস্থায় হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পদতলে যেয়ে বসে বললো, "খ্রিস্টবাদের সকল বিশ্বাস এ মুহূর্তে আমার অন্তর থেকে মুছে গেছে। হযরত! অনুগ্রহ করে আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন।" সে তার জুব্বার নিচে পরিহিত কোমরবন্ধ খুলে ফেললো।

ওয়াজ-নসিহতের সাময়িক সমাপ্তি ও শুরু

বেশ কিছুদিন ওয়াজ-নসিহত শেষে মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুললো। এর মূল কারণ ছিলো, শরীয়ত ও তাসাউফের ওপর তাঁর সূক্ষ্ম ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এবং বিশেষকরে খোদাপ্রেমের উচ্চমার্গের কথাবার্তা অধিকাংশ মানুষের জন্য বোধ ও অনুধাবনের বাইরে ছিলো। তারা তাঁর কথার মর্মার্থ সঠিকভাবে গলদ্ধকরণ করতে পারতো না। সুতরাং হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ ওয়াজ-নসিহত ছেড়ে দিলেন। তিনি স্বীয় খানক্বায় যেয়ে অবসর নেন। তবে সঙ্গী-সাথী যুগের উলামা ও সুফি-দরবেশগণ পুনরায় ওয়াজ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। তিনি জবাব দেন, "দেখুন, আমি আভ্যন্তরীণভাবে পরিতৃপ্ত আছি। আমি তো আর আমার নিজের ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট হতে পারি না!"

কিছুদিন পরই কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাপ্রোণিদিত হয়ে মিম্বরে আরোহণ করেন এবং ওয়াজ-নসিহতে পুনরায় লেগে যান। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "এরূপ করার মধ্যে রহস্যটা কী?" জবাবে তিনি বললেন, "আমি একটি হাদিস পাঠ করেছি। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শেষ যুগে মানুষের ভাষ্যকার হবে ঐ ব্যক্তি যে হচ্ছে উম্মার মধ্যে সর্বাপেক্ষ নিকৃষ্ট। সে সবাইকে নসিহত করবে।' আমি জানি আমিই হচ্ছি মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্য আমি ওয়াজ-নসিহত করছি, আমি তো আর রাসূলুল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে পারি না।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর দুআ

তিনি দুআ করতেন: "হে আল্লাহ! আমার যেসব আমল দ্বারা আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমি সেগুলো থেকে বাঁচতে আপনারই আশ্রয় কামনা করি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবদার জানাচ্ছি, আমাকে দান করুন বিশুদ্ধ হালাল- জরুরি খাবার ও পানীয়। হে প্রভু! আমাকে এতোই ব্যস্ত করবেন না যার ফলে আমি ওদের সাথে সামিল হয়ে যাই যারা আপনার জিকির থেকে গাফিল। হে আল্লাহ! আপনার

সন্তুষ্টি লাভের জন্য যোগ্য বান্দাহ হিসেবে আমাকে যোগ্যতা দান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে আপনার বান্দাহ হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন একমাত্র আপনার প্রতি ভালোবাসা দ্বারা। হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে আপনার প্রেমের ছোঁয়া দ্বারা সিক্ত করুন। আমার জিহ্বাকে আপনার জিকির দ্বারা পবিত্র করুন। আমার হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আপনার সন্তুষ্টির অনুকুলে পরিচালনা করুন। হে আল্লাহ আমার থেকে সকল স্মরণশক্তি, স্মৃতি ও অনুভুতি মুছে ফেলুন যা আপনার সন্তুষ্টির কারণ নয়।"

বিভিন্ন ঘটনা

১. খ্রিস্টান ডাক্তার মুসলমান হওয়া: একদিন হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর চোখে ব্যথা পেলো। একজন ডাক্তার আসলেন। পরীক্ষা করে বললেন, "আপনার চোখের ব্যথা অব্যাহত থাকলে ভেতরে যাতে পানি ঢুকে না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।"

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ ইশার নামাযের জন্য ওযু সেরে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লেন। ওযুর সময় চোখের ভেতর পানি ঢুকেছিল। কিন্তু জেগে ওঠার পর লক্ষ করলেন, চোখের ব্যথা সেরে গেছে। তাহাজ্জুদ শেষে গভীর মুরাক্বাবায় থাকাবস্থায় এক গায়েবি আওয়াজ শুনলেন, "জুনায়েদ চোখের ভেতর পানি দিয়েছে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে। সে যদি একই নিয়তে দোযখের সকল [ঈমানদার ও পাপী] মানুষের মুক্তির জন্য আমার নিকট ভিক্ষা চাইতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করে নিতাম।"

পরদিন ডাক্তার এসে দেখলেন হযরতের চোখ ভালো হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "শায়খ! আপনি কী করেছেন গতরাতে?"

হযরত জবাব দিলেন, "আমি নামাযের জন্য ওযু করেছি।" একথা শুনে খ্রিস্টান ডাক্তার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই এটা ছিলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নিরাময় দান। কোনো মানুষের পক্ষ থেকে নয়। ইয়া শায়খী! বাস্তাবে আমার চোখ রোগাক্রান্ত ছিলো আপনার নয়। আপনি ছিলেন [আমার অন্তরচোখের] চিকিৎসক, আমি নয়।"

২. কার গুনাহের বোঝা কে নেবে: হযরতের সামনে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন, “আজকাল সত্যিকার ঈমানদার ভাইদের খুঁজে পাওয়া কঠিন। এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, “আপনি যদি কাউকে খুঁজে থাকেন, যে আপনার [গুনাহের] বোঝা বহন করবে তাহলে অবশ্যই তাকে পাওয়া কঠিন হবে। অপরদিকে আপনি যদি অপরের [গুনাহের] বোঝা বহন করতে আগ্রহী হন তাহলে, আমার সঙ্গেই এরূপ অনেককে পাবেন।”

৩. আল্লাহর উপস্থিতির মধ্যে ‘আল্লাহ’ বলা অশ্রদ্ধা: হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ যখনই তাওহিদ সম্পর্কে আলোচনা করতেন, তখন প্রত্যেকবার ভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতেন। এর ফলে শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য বুঝতে বেগ পেতো। একদিন হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ “আল্লাহ!” বলে মৃদু চিৎকার দিলেন। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, “আল্লাহ যদি অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে গায়েব একককে [আল্লাহকে] উল্লেখ করা হচ্ছে অনুপস্থিতির নিদর্শন। এবং অনুপস্থিতি হচ্ছে একটি জিনিস যা নিষিদ্ধ।” তিনি আরো বলেন, “আল্লাহ যদি উপস্থিত থাকেন, তাহলে ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁর নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে শ্রদ্ধাহীনতা!”[১৮]

৪. হাদিয়ার টাকা দানকারীকে প্রদান: একব্যক্তি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর নিকট ৫০০ দিনার নিয়ে আসলো। সে বললো, শায়খ এ দিনারগুলো হাদিয়া হিসেবে অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।
হযরত তাকে প্রশ্ন করলেন, “এ দিনারগুলো ছাড়াও তোমার নিকট আরো ধন-সম্পদ আছে নাকি?”
সে বললো, “জী হুজুর! অনেক আছে।”
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কী আরো বেশি ধন-সম্পদের প্রয়োজন আছে?”
সে বললো, “জী হা, প্রয়োজন আছে।”

---

[১৮] আমরা যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত থাকি, তখন তাঁকে নাম ধরে ডাক দেই না এ কারণে যে, এতে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা হবে। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত তথা মুশাহাদার অবস্থায় তাঁর জাত নাম বলে ডাক দেওয়াটা অশ্রদ্ধা বলেছেন। তাঁর উক্তির ব্যাখ্যা এটিই। -গ্রন্থকার

তিনি বললেন, "তাহলে তোমাকে আমার এই ৫০০ দিরহামও হাদিয়া দিলাম। নিয়ে যাও। তোমার প্রয়োজন বেশি। আমার যা আছে তা-ই যথেষ্ট। বেশির দরকার নেই।"[১৯]

৫. ভাবনার মাধ্যমে গীবত: একদিন হযরত বয়ান করছিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করা শুরু করলো। হযরত জুনাইদ লোকটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন, "এ লোকটি তো স্বাস্থ্যবান। সে তার গতর খাঁটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। সে কেনো ভিক্ষা করবে ও নিজের ওপর অবমাননা ডেকে আনবে?"

এ রাতে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ একটি স্বপ্ন দেখেন: তাঁর সম্মুখে ঢাকনাসহ একটি থালা দেওয়া হয়েছে। কেউ বললো, "ভক্ষণ করুন!"

তিনি ঢাকনা তুলে দেখেন থালার মধ্যে ঐ ভিক্ষুক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে! বললেন, "আমি মানুষের মাংস ভক্ষণ করি না।"

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "তাহলে আজ মসজিদে থাকাকালে কেনো তুমি তা ভক্ষণ করেছিলে?" স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ আস্তাগ্ফিরুল্লাহ! আস্তাগ্ফিরুল্লাহ! বলতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারলেন, নিজের অজান্তে অন্তরের মাধ্যমে গীবত করে ফেলেছেন। তিনি বলেন, "আমি ভীষণভাবে ভয় পেলাম। সাথে সাথে ওযু সেরে দুরাকাআত নামায আদায় করলাম। এরপর ঐ ভিক্ষুকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে দজলা নদীর তীরে যেয়ে পেলাম। নদীর তীরে মানুষের ফেলে-যাওয়া শাক-সবজি তুলে তিনি ভক্ষণ করছিলেন। মাথা তুলে আমার দিকে

---

[১৯] লক্ষণীয় যে, 'আমার এই ৫০০ দিরহাম' কথাটির অর্থ হলো হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করার পর এ অর্থের মালিক হয়ে যান হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ। এ অধম লেখক একবার আল্লাহর এক ওলিকে লজ্জা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অনুরূপ একটি কাজ করি। বেশ কিছু টাকা তিনি আমার নিকট থেকে কর্জ নিয়েছিলেন। অভাব-অনটন থাকায় তিনি তা ফেরৎ দিতে পারছিলেন না। লজ্জাবোধে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতও অল্প করতেন। আমি ভাবলাম, এই কর্জের টাকা তাঁর থেকে গ্রহণ করবো না। কিন্তু 'মাফ করে দিয়েছি' বা 'আপনাকে হাদিয়া দিলাম' বললে তিনি মনের মধ্যে আঘাত পাবেন। আমি সমপরিমাণ টাকাসহ তাঁর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলাম। পকেট থেকে টাকা বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'হযরত! এই টাকাগুলো আপনাকে হাদিয়া দিলাম'। তিনি এতো টাকা হাদিয়া দিয়েছি দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন। আমি বললাম, আপনার নিকট আমি এ পরিমাণ টাকা পাবো- দয়াকরে আমাকে তা ফেরৎ দিন! তিনি হাতের টাকা আমার হাতে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্যস, তাঁর ঋণ মুক্ত হয়ে গেলো সসম্মানে।

তাকিয়ে বললেন, 'জুনাইদ! আমার ব্যাপারে আপনি যে ধারণা করেছিলেন, সেজন্য কী তাওবাহ করেছেন?' জবাব দিলাম, 'করেছি।' তিনি বললেন, 'তাহলে চলে যান! ইনি হচ্ছেন তিনি যিনি তাঁর গেলামদের তাওবাহ কবুল করেন। তবে এখন থেকে আপনি কী ভাবেন সে ব্যাপারে সকর্ত থাকুন।'"

৬. নাপিতের কাছ থেকে ইখলাস শিক্ষা: তিনি বলেন, "আমি একজন নাপিতের কাছ থেকে 'ইখলাস' শিখেছি।" এরপর একটি ঘটনার কথা স্মরণ করলেন। বললেন, "মক্কা মুকাররমায় আমি একবার ভ্রমণে যাই। সেখানে একটি দোকানে একজন নাপিত এক ভদ্রলোকের চুল কাটছিলো। আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমার মাথা মুণ্ডন করে দেবে?"

সে জবাব দিলো, "আমি পারবো।" তার চোখে পানি এসে গেলো। ভদ্রলোকের চুল কাটার কাজ শেষ না করেই তাকে বললো, 'উঠে যান। যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ হয়েছে তখন সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে।'

সে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে মাথার মধ্যে চুমো খেলো। মাথা মুণ্ডন শেষে আমাকে এক টুকরো কাগজে মুড়ে কয়েকটি ছোট্ট মুদ্রা দিল। বললো, 'এগুলো আপনি প্রয়োজন মেটাতে খরচ করবেন।'

এরপর আমি বেরিয়ে আসলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, পরবর্তীতে যে হাদিয়া আমার হাতে আসবে তা সবই সাদক্বা করবো। বেশিক্ষণ যায় নি, বসরা থেকে এক ব্যক্তি হাদিয়া হিসেবে এক থলে স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন। আমি সাথে সাথে এটি নিয়ে নাপিতের নিকটে উপস্থিত হলাম। আমি থলেটি তার হাতে তুলে দিলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কী?'

বললাম, 'আমি আমার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি। প্রথম হাদিয়া যা-ই আসবে তা তোমাকে দেবো। এটা কিছুক্ষণ পূর্বে এসছে।'

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "হে পুরুষ! আপনি কী আল্লাহর সম্মুখে লজ্জাবোধ করেন না? আপনি আমাকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমার মাথা মুণ্ডন করে দাও'। এখন আপনি আমাকে হাদিয়া এনে দিচ্ছেন। আপনি কী

কখনও কাউকে দেখেছেন, যে আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো কাজ করার পর বিনিময় গ্রহণ করেছে?"

৭. চোরের মরদেহে চুমো: এক চোরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বাগদাদেরে একটি চত্তরে রাখা হয়েছিল। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ চোরের ঝুলন্ত মরদেহে চুমো খেলেন। লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, "ইয়া শায়খুল মাশাইখ! আপনি এ কাজ কেনো করলেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "তার ওপর বর্ষিত হোক হাজার সমবেদনা! তার পেশায় সে নিজের পুরুষত্বের প্রমাণ করেছে। সে এমন দক্ষতার সাথে তার কাজটি করেছে যে, এজন্য তাকে জীবন দিতে হলো।"

৮. চোরের জন্য সাক্ষ্যদান: কোনো এক রাতে হযরতের থাকার কক্ষে এক চোর প্রবেশ করলো। মূল্যবান কিছু না পেয়ে একটি জুব্বা নিয়ে সে পালিয়ে গেলো। পরদিন হযরত বাজারে গেলেন। দেখলেন এক দালাল তার ঐ চুরি যাওয়া জুব্বাটি একজন খদ্দেরের নিকট বিক্রি করছে। তবে খদ্দের ব্যক্তিটি জুব্বার সত্যিকার মালিক সম্পর্কে জানতে চাইলো, "আমি একজন সাক্ষী দেখতে চাই যে সাক্ষ্য দেবে যে, এ জুব্বাটি তোমার সম্পদ। প্রমাণ না করতে পারলে আমি এটি ক্রয় করবো না।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ এগিয়ে যেয়ে লোকটিকে বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। এটির মালিক দালাল লোকটিই!" এরপর খদ্দের জুব্বাটি ক্রয় করে নিয়ে গেলো। এদিকে দালাল [চোর] হতবাক হয়ে হযরতের দিকে তাকিয়ে রইলো।

৯. বাধ্য হয়ে আল্লাহকে ডাকলে সুফল আসে: এক বৃদ্ধা হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় এসে আবদার জানালেন, "আমার পুত্র হারিয়ে গেছে। দুআ করুন যাতে সে ফিরে আসে।"
তিনি বললেন, "সবর করো।"

মহিলা কিছুদিন সবর করলেন। এরপর পুনরায় এসে আবদার জানালেন, "হযরত! আমার পুত্র আসে নি। দুআ করুন।"
তিনি এবারও বললেন, "সবর করো।"

আরো কদিন পর মহিলা এসে বললেন, "আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। দয়া করে আল্লাহর দরবারে আমার ছেলেটি ফিরে আসার জন্য দুআ করুন।"

এবার হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "তুমি যদি সত্যি কথা বলে থাকো তাহলে তোমার পুত্রটি ফিরে এসে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, বাধ্য হয়ে যে কেউ তাঁকে ডাক দেয়, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।" এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন। বৃদ্ধা বাড়িতে যেয়ে দেখলেন তার সন্তান ফিরে এসেছে।

১০. সুহবত ছেড়ে দেওয়ার কুফল: তাঁর একজন মুরিদ ভাবলেন, "আমি তো সুলুকের শেষ মাক্বামে পৌঁছুয়ে গেছি। তাহলে হযরতের সুহবতে থাকার আর প্রয়োজন কিসের!" সুতরাং তিনি একটি গৃহে একা একা বসে মুরাক্বাবা করতে লাগলেন। দেখা গেলো প্রত্যহ রাতে কেউ একজন একটি উট নিয়ে এসে বলে, "আপনি আসুন, আপনাকে বেহেশতে নিয়ে যাবো।" সুতরাং তিনি উটে বসে একটি মনোরম স্থানে যেতে থাকেন। সেখানে হুর-পরি ও সুদর্শন বালকদের সাথে তিনি ফূর্তি আমোদে লিপ্ত হন। তার সম্মুখে পরিবেশিত হয় উত্তম মজাদার খাবার ও পানীয়। প্রত্যহ ভোর পর্যন্ত এই 'বেহেশতে' অবস্থান করেন। এরপর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ও জেগে ওঠে দেখতে পান নিজের গৃহে ফিরে এসে গেছেন। বেশ কিছুদিন এভাবে চলে যাওয়ার পর তিনি গৌরববোধ করতে থাকেন। মনে মনে ভাবেন, "আমি তো বেশ বড়ো ওলি হয়ে গেছি!"

তার এ 'প্রত্যহ বেহেশতে গমনের' সংবাদ ধীরে ধীরে লোকজনের নিকট জানাজানি হয়ে গেলো। তিনি নিজেই প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন, "আমি দৈনিক একবার বেহেশতে যাই"। অবশেষে এ খবরটি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পৌঁছুলো। তিনি সাথে সাথে চলে আসলেন মুরিদের গৃহে। দেখতে পেলেন, মুরিদ সবেমাত্র বেহেশত থেকে ফিরে এসেছেন। তাকে প্রশ্ন করলে, তিনি হযরতকে পুরো ব্যাপারটি অবগত করলেন।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "আগামীকাল রাতে যখন তুমি বেহেশতে যাবে তখন তিনবার বলবে: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ [আল্লাহ ছাড়া কারোর ক্ষমতা ও শক্তি নেই, যিনি মহিমান্বিত, সর্বশক্তিমান।]

ঐ রাতে মুরিদকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হলো যথারীতি। শায়খ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে যা বলতে বলেছিলেন, তিনি এতে খুব একটা আস্থাশীল ছিলেন না। যাক, ঐ 'বেহেশতে' পৌঁছুয়ে তিনি তার শায়খের কথামতো তিনবার উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করলেন।

ইয়া আল্লাহ! এ কী? সব সুদর্শন বালক-বালিকা ও সাথীরা যে ছুটে পালাচ্ছে! ছি! ছি! তিনি যে গোবরের স্তুপের ওপর পড়ে আছেন। চুতুর্দিকে মানুষ ও জানোয়ারের কঙ্কাল। মুরিদের ভুল ভেঙ্গে গেলো। 'বেহেশত' থেকে ছুটে সোজা চলে আসলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায়। তওবাহ করে পুনরায় আত্মনিয়োগ করলেন ইবাদত-বন্দেগীতে। তিনি এবার বুঝতে সক্ষম হলেন যে, মুরিদের জন্য সুহবত ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে "বিষপানের" সমান।

১১. মুরিদের প্রতি খেয়াল: হযরতের একজন মুরিদ বসরা শহরে নির্জনে বসবাস করতেন। এক রাতে একটি কুধারণা তার মনের মধ্যে উঁকি দিলো। তিনি আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেছে! আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তিনি সব ধরনের চেষ্টা চালালেন পরিত্রাণ পেতে। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তিনি লজ্জায় কারো সম্মুখে গেলেন না। এভাবে তিনদিন চলে গেলো। এরপর ধীরে ধীরে কালো রং চলে যেতে লাগলো। হঠাৎ কে এসে তার কক্ষের দরোজায় কড়া নাড়লেন।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

জবাব আসলো, "আমি একজন বার্তাবাহক। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেক প্রেতির একটি পত্র আপনার হাতে পৌঁছুয়ে দিতে এসেছি।"

মুরিদ পত্রটি পাঠ করলেন। হযরত লিখেছেন, "নূরোজ্জ্বলের উপস্থিতির মাঝে তুমি কেনো নিজেকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করছো না? তোমার মুখমণ্ডল থেকে কালো রং মুছতে যেয়ে তিনদিন ও তিন রাতব্যাপী আমাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হলো!"

১২. মুরিদের প্রতি মুর্শিদের দরদ: হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় অবস্থানকারী এক মুরীদ কোনো এক অন্যায় কাজের জন্য ভীষণভাবে লজ্জিত

হলেন। নিজেকে আর কারোর সামনে মুখ দেখাতে পারলেন না। তিনি চুপি চুপি খানক্বাহ থেকে পালিয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পর শায়খ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ শাগরিদদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। বাগদাদের একটি বাজার অতিক্রমকালে তাঁর চোখে পড়লো ঐ পালিয়ে যাওয়া মুরিদকে। তিনি তার দিকে অগ্রসর হলেন। মুরিদ টের পেয়ে আগে পা বাড়ালেন। হযরত তাঁর সাথীদেরসহ দ্রুত তার দিকে হাটতে লাগলেন। ধরে ফেলবেন ভেবে মুরিদ একরূপ দৌড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার- একটি সরু রাস্তা ধরে হেটে অপরপ্রান্তে যেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তার সম্মুখে একটি উঁচু দেওয়াল। রাস্তার সমাপ্তি এখানেই। আর কোথাও পালাবার পথ নেই। হযরত জুনাইদ তার দিকে ধেয়ে আসছেন। তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার চোখ দুটো নিজের পায়ের দিকে পতিত হলো।

হযরত অন্যান্যদের থেমে যেতে বললেন। মন্তব্য করলেন, “আমাদের একটি পাখি পিঞ্জিরা থেকে উড়ে চলে গেছে।” তিনি একাকী মুরিদের নিকট আসলেন। মুরিদ মাথা নতো করে প্রশ্ন করলেন, “আপনি কোথায় যাচ্ছেন, ইয়া শাইখী!”

হযরত বললেন, “যখন কোনো মুরিদের পিঠ দেওয়ালে লেগে যায় তখন তার পীর উপকারে আসতে পারেন।” এরপর তিনি ভীষণভাবে লজ্জিত এ মুরিদকে আদর করে খানক্বায় নিয়ে আসলেন। মুরিদ হযরতের পায়ে জড়িয়ে ধরলেন। নিজের কৃতকর্মের কারণে ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে মহান দয়ালু আল্লাহ তা’আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উপস্থিত অন্যান্য মুরিদান এ ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখে সত্যিই গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হন এবং বার বার তাওবাহ করতে থাকেন প্রেমময় মহাপ্রভু আল্লাহ তা’আলার নিকট।

১৩. পীর চিনেন তাঁর মুরিদের মূল্য: শায়খুল মাশাইখ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন বিশিষ্ট মুরিদ ছিলেন। তিনি সকলের তুলনায় তাকে বেশি ভালোবাসতেন। এতে মুরিদদের মধ্যে কিছুটা হিংসার উদ্রেক হয়। ব্যাপারটি হযরতের নিকট উন্মোচন হলো। একদিন সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, “দ্যাখো, আচার-আচরণ ও প্রজ্ঞায় সে হচ্ছে তোমাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” মুরিদরা এ ব্যাখ্যায় বেশি প্রভাবিত হলো না। তিনি আবার বললেন, “তাহলে এক কাজ করা

যায়। সবাই মিলে একটি পরীক্ষা হয়ে যাক- কেমন? তোমরা তখনই আমার ধারণাটি অনুধাবন করবে।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর খাদিমকে নির্দেশ দিলেন, ২০টি কবুতর নিয়ে আসো। খাদিম কবুতরগুলো নিয়ে আসলো। হযরত ঐ বিশেষ মুরিদসহ সকলের হাতে একটি করে কবুতর দিলেন। বললেন, “যাও! যেখানে কেউ দেখাতে পায় না, এরূপ জায়গায় যেয়ে কবুতর জবাই করে আমার নিকট নিয়ে আসো।”

নির্দেশ পেয়ে সবাই চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে একজন ব্যতিত সকলেই ফিরে আসলেন যারতার হাতের কবুতর জবাই করে। এরপর দেখা গেলো হযরতের ঐ প্রিয় মুরিদ ফিরে আসলেন- কিন্তু তার হাতের কবুতরটি জীবিত! অন্যান্য মুরিদরা ভাবলো, এবার বেঠা আটকা পড়েছে! হযরতের নির্দেশ অমান্য করে বসেছে! তারা অপেক্ষা করতে লাগলো কীভাবে তাকে শায়খ ধিক্কার দেন, সেটা দেখবে।

শায়খ ঐ মুরিদকে বললেন, “কী হে? সবাই নির্দেশ মুতাবিক কবুতর জবাই করে নিয়ে আসলো, আর তোমার হাতেরটি এখনো জীবিত! ব্যাপার কী?”
মুরিদ ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, “আপনার নির্দেশ আমার শিরোধার্য ইয়া শায়খী! কিন্তু তা পূরণ করতে আমি অপারগ। এ জন্য কবুতরটি জবাই না করেই ফিরে এসেছি।”
শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, “কেনো তুমি নির্দেশ পালনে অপারগ হলে?”
মুরিদ বললেন, “হযরত! আপনি বলেছিলেন, এমন জায়গায় যেয়ে কবুতর জবাই করবে যেখানে কেউ তা দেখতে পাবে না। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এরূপ কোনো জায়গার সন্ধান পাই নি। কারণ আল্লাহ তা’আলা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি দেখেন না- এমন কোনো স্থান বিশ্বজগতের কোথাও নেই। আমি যেখানেই গিয়ে কবুতর জবাই করতে চেয়েছি, সেখানেই আল্লাহকে উপস্থিত দেখেছি।”

হযরত জুনাইদ বললেন, “কী সুন্দর বললে! হে আমার প্রিয় শাগরিদগণ! তোমরা এবার বুঝলে তো কোন্ কারণে আমি তাকে অধিক ভালোবাসি? তার প্রজ্ঞা ও আচার-আচরণের সঙ্গে এবার তোমাদেরটি যাচাই করে দেখো।” সকল মুরিদ হযরতের নিকট এবার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, “আমরাও আপনার এই বিশিষ্ট মুরিদকে এখন থেকে আরো বেশি ভালোবাসবো।”

১৪. জিহাদের ময়দানে কাফির বীর যোদ্ধার ইসলামগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ: হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর ৮ জন বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন যাঁরা তাঁর প্রতিটি নির্দেশ বিনাবাক্যে পালন করতেন। একদিন হযরত নির্দেশ দিলেন, "তোমাদেরকে আমার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে।" তাঁরা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সম্মুখে মুজাহিদ বাহিনী সারিবদ্ধভাবে তাদের মুকাবিলা করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন শত্রুসেনা এগিয়ে এসে হাঁক ছাড়লো, "হে মুসলমানরা! কার সাহস আছে আমার সঙ্গে লড়বে?" হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গী ৮ জনের সকলেই একে একে ঐ কাফির সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হেয়ে গেলেন। হযরত জুনাইদ সঙ্গীদের শাহাদাতের এই ঘটনাপ্রবাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, "এরা শহীদ হওয়ার সময় আমি উপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম ৯টি রূহবাহী খাট আকাশে ঝুলন্ত আছে। আমার সাথীরা একে একে শহীদ হলেন। সাথে সাথে তাদের রূহকে একেকটি খাটে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো। খালি থাকলো একটি খাট। ভাবলাম, নিশ্চয় এটি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং আমিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম। যে বীর যোদ্ধা আমার সাথীদেরকে শহীদ করেছিলো সে আমাকেও ডাক দিলো, 'হে আবুল ক্বাসিম! ঐ নবম রূহ বহনকারী খাটটি আমার জন্য! আপনি বাগদাদে ফিরে যান। ইসলামের খিদমত করতে থাকুন। তবে যাওয়ার পূর্বে আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন!'"

তিনি আরো বলেন, "সুতরাং ঐ বীর যোদ্ধা আমার হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর হাতের যে তরবারী দ্বারা আমার প্রিয় ৮ জন শাগরিদকে শহীদ করেছিলেন, সে-ই তরবারি দ্বারাই ৮ জন কাফিরকে হত্যা করলেন। এরপর তিনি নিজেই শহীদ গয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, সত্যিই তাঁর রূহটি ঐ অপেক্ষারত রূহবাহী খাটে তুলে নেওয়া হলো। এরপর উর্ধ্বাকাশের দিকে সবগুলো খাট এ নয়জন শহীদের লাশ নিয়ে আরোহণ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো।"

১৫. বক্ষদেশ হচ্ছে আল্লাহর অবস্থানস্থল: একদা শায়খ নাসিরী নামক সাইয়্যিদ বংশের এক ব্যক্তি হজ্জের ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাফেলা যখন বাগদাদে পৌঁছুলো তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

হযরত জুনাইদ সাইয়্যিদ নাসিরীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া সাইয়্যিদী! আপনি কোথেকে ভ্রমণ শুরু করেছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "জিলান থেকে।"

হযরত আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনি কার বংশধর?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি আমিরুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর।"

শায়খ জুনায়েদ বললেন, "আপনার মহাত্মন পূর্বপুরুষ দুটি তরবারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। একটি দ্বারা তিনি কাফির-বেইমানদেরকে শায়েস্তা করেছেন আর অপরটি দ্বারা তিনি শাহাদতের সুধা পান করেছেন। এবার বলুন, হে সাইয়্যিদী! আপনি তাঁরই সম্মানিত বংশধরদের একজন। আপনি এ দুটো তরবারির কোনটি ধারণ করেন?"

এ প্রশ্নে সাইয়্যিদ নাসিরীর অন্তরে এক অপূর্ব ভাবাবেগের সঞ্চার হলো। তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, "হে মহাত্মন শায়খ! আমার হজ্জপালনে যাত্রা এখানেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে আল্লাহপ্রাপ্তির রাস্তা বাতলে দিন।"

হযরত জুনাইদ বললেন, "আপনার বক্ষদেশ হচ্ছে আল্লাহর একান্ত অবস্থানস্থল। যেটুকু সম্ভব আপনাকে এ অবস্থানস্থলে অন্য কোনো বস্তুকে প্রবেশাধিকার দেবেন না।"

সাইয়্যিদ নাসিরী বললেন, "ওহ শাইখী! আমি এটুকুই জানতে চেয়েছিলাম।"

কুস্তিগীর জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ও এক বৃদ্ধ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী কুস্তিগীর হিসেবেও বাগদাদে পরিচিত ছিলেন। একদিন কুস্তি খেলার প্রতিযোগিতায় নিয়মমাফিক বাগদাদের শাসক ঘোষণা দিলেন, "আজ

কুস্তিগীর হিসেবে হযরত জুনাইদ বাগদাদী সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছেন। কেউ আছে কী তাঁর এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার?"

প্রথমে কেউ সাড়া দিলো না। এরপর এক বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালেন। তাঁর সরু দীর্ঘ গলা হেতু মস্তকটি এদিক-সেদিক দোল খাচ্ছিলো। তিনি বললেন, "আমি তাঁর সঙ্গে কুস্তি করবো।" উপস্থিত দর্শকরা উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো। সাথে সাথে সবাই হাততালিও দিলো।

আইন মুতাবিক শাসক এ বৃদ্ধকে কুস্তি করতে নিষেধ করতেও পারেন না। নিজের ইচ্ছে কেউ যদি রিংয়ের ভেতর ঢুকে কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চায়, তাহলে তার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষিত। সুতরাং বৃদ্ধকে রিংয়ে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হলো। তার বয়স ছিলো প্রায় ৬৫ বছর। এরপর 'পহেলওয়ান' নামে খ্যাত হযরত জুনাইদ বাগদাদী রিংয়ে প্রবেশ করলেন। প্রতিযোগী হিসেবে ক্ষীণকায়, দুর্বল বৃদ্ধকে দেখে তিনি তো একেবারে অবাক! তিনি ভাবলেন, "ইয়া আল্লাহ! এ বৃদ্ধ লোকটি কোন সাহসে রিংয়ে প্রবেশ করলেন? কেনো?" অনুরূপ শাসকসহ সকল দর্শকের মনেও প্রশ্ন ও কৌতুহল, "এ বৃদ্ধ লোকটি কীভাবে কুস্তি করতে সক্ষম হবেন?"

কুস্তি লড়াই শুরুর পূর্বে বৃদ্ধ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "আপনার কানটি আমার মুখের কাছে আনুন।" তিনি তা-ই করলেন। বৃদ্ধ কানকথায় তাঁকে বললেন, "হযরত! আমি জানি আপনার বিরুদ্ধে কুস্তি করে কখনো জয়লাভ করতে পারবো না। তবে আমি একজন সাইয়্যিদ [হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর]। আমার সন্তানরা বাড়িতে উপোস আছে। আপনি জানেন, সাইয়্যিদ বংশের কাউকে ভিক্ষা করা কিংবা সাদক্বা গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং আমি আশা করছি আপনি কুস্তিগীর হিসেবে নিজের সুনাম, মর্যাদা ও উচ্চাবস্থানকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসায় একটি সাইয়্যিদ বংশের পরিবারকে সসম্মানে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবেন। আমি জিতলে যে টাকা উপহার পাবো তার দ্বারা আমার পরিবারকে ক্ষুদা থেকে অন্তত এক বছরের জন্য রক্ষা করতে পারি এবং আরো এক বছরের কর্জ পরিশোধও করার সুযোগ পাবো। সর্বোপরি দুজাহানের সর্দার আপনার প্রতি খুব সন্তুষ্টও হবেন। হে মহাত্মন জুনাইদ! আপনি কী রাসূলের বংশধরদের জন্য এটুকু কুরবানী করতে প্রস্তুত?"

জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ভাবলেন, “আজ আমার সম্মুখে একটি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে!” কুস্তি শুরু হলো।

দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য কয়েকবার তিনি বৃদ্ধকে ধরাশায়ী করলেন। আবার তাকে উঠে দাঁড়ানোরও সুযোগ দিলেন। তাঁর নিজের শক্তিপ্রর্দশনে যাতে কেউ সন্দেহ করে না- সেটা নিশ্চিত করার পর, দেখা গেলো এক পর্যায়ে বৃদ্ধ তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। হযরত জুনাইদ আর উঠতে পারলেন না। বৃদ্ধ বিজয়ী হলেন! তিনি বুক টুকে বিজয়ীর বেশে পেশী দেখাতে লাগলেন। দর্শকরা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে হাততালি দিতে থাকে। বৃদ্ধ শাসকের কাছ থেকে পুরস্কারের টাকা সংগ্রহ করলেন। এদিকে জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ নতমাথায় রিং থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এ রাতে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নযোগে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে জুনাইদ! তুমি তোমার মর্যাদা, সুনাম, অবস্থান বিসর্জন দিয়েছো আমার ক্ষুদার্ত বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা হেতু। আজ থেকে তোমার নাম আউলিয়াদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হলো।” হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর কাঁদতে থাকেন। অঝোর ধারায় চোখের পানি পড়ে তার দাড়ি পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গেলো।[২০]

মহামূল্যবান বাণী

১. সুফিদের হৃদয়ের প্রশস্ততা: তিনি বলেন, একজন সুফি হচ্ছেন উর্বর জমির মত; এর ওপর যদি নির্জীব বীজও বপন করা হয়- তা থেকেও গজে ওঠে সবুজ বৃক্ষরাজি।

২. সুফিদের আখলাক্ব: সুফিদের হৃদয় হচ্ছে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের মতো: যা দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত, সর্বদা আল্লাহর যে কেনো নির্দেশ মানতে প্রস্তুত। সুফিদের ঈমানী শক্তি হচ্ছে হযরত ইসমাঈল আলাইহিসসালামের মতো। তাঁদের ক্রন্দন হচ্ছে হযরত দাউদ আলাহিসসালামের মতো। তাঁদের সবর হযরত আইউব আলাইহিস সালামের মতো। তাঁদের প্রভুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হযরত

[২০] হযরত শায়খ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রাহিমাহুল্লাহ - ‘তাজাল্লিয়াতে জযব’; সূত্র: islamcan.com

মূসা আলাহিসসালামের মতো। তাঁদের দুআর মধ্যে থাকে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ইখলাস।

৩. তাসাওউফ কী: তাসাওউফ হচ্ছে সেটি যা তোমাকে হত্যা করে নিজে নিজেই বেঁচে থাকে। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বান্দার সর্বাধিক শক্তিশালী সম্পর্ক হচ্ছে, যখন সে তাওহিদের রহস্য উন্মোচনে অগ্রসর হয় তখন দেখতে পায় সৃষ্টি থেকে সৃষ্টিকর্তার সকল রাস্তা বন্ধ- শুধুমাত্র একটি ছাড়া। সেটি হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত রাস্তা।[২১]

৪. মা'রিফাতের স্তর: একদা হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ দজলা নদীর তীরে আসলেন। 'ইয়া আল্লাহ!' বলে জিকির শুরু করলেন। এরপর তিনি পানির উপর দিয়ে হেটে নদী পার হয়ে গেলেন। নদী পার হওয়ার পূর্ব থেকে এক ব্যক্তি খেয়া নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শায়খ জুনাইদ 'ইয়া আল্লাহ!' জিকির করে করে পায়ে হেটে নদী পার হয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনিও অগ্রসর হলেন, বললেন, "ইয়া শায়খ! আমিও নদী পার হবো।"

শায়খ জুনাইদ তাকে বললেন, "ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ! বলতে বলতে আমাকে অনুসরণ করো।"

ঐ ব্যক্তি তা-ই করলেন ও পানির ওপর দিয়ে হাটতে থাকেন। নদীর মাঝখানে পৌঁছুনোর পর শয়তান এসে তাকে ওয়াসওয়াসা দিলো। বললো, "কে বড়ো, আল্লাহ না শায়খ জুনাইদ? শায়খ নিজেই বলছেন, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! কিন্তু তোমাকে নির্দেশ দিলেন ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ! বলতে। এটা তো শিরক! এটা বলা বন্ধ করো। বলো, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!"

শয়তানের এ ওয়াসওয়াসায় তিনি বিভ্রান্ত হলেন। তাকে অনুসরণ করে বলতে লাগলেন, "ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!" সাথে সাথে তিনি পানিতে নিমজ্জিত হলেন। চিৎকার দিলেন, 'বাচাঁও! বাঁচাও!'

[২১] অর্থাৎ সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ পেছন ফিরে বললেন, “আমার নির্দেশ মতো বলো, ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ!” লোকটি তাই করলেন। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, তিনি ভেসে ওঠেছেন ও পানির উপর দিয়ে পুনরায় হাটতে পারছেন। এরপর উভয়ে নিরাপদে নদীর ওপর পারে উপনীত হলেন।

লোকটি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে ঘটনার রহস্য কী জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “হে শায়খ! আমি এর রহস্য বুঝতে পারলাম না। আপনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! এবং নিরাপদে নদী পার হলেন। আর আমি যখন তাঁর [সুবহানাহু তাআলা] নাম উচ্চারণ করলাম, তখন তলিয়ে যেতে থাকি নদীর পানিতে। এর কারণ কী?”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “হে বোকা! তুমি এখনও জুনাইদকেই চিনতে পারো নি, অথচ স্বয়ং আল্লাহকে চেনার [মা’রিফাতুল্লাহর] স্বপ্ন দেখছো!”[২২]

৫. আল্লাহপ্রেমের উচ্চমার্গের ব্যাখ্যা: পবিত্র হজ্জের মওসুমে মসজিদুল হারামে একদা যুগের আউলিয়ায়ে কিরামের একটি জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মন এসব ওলির মধ্যে সর্বাধিক কম বয়সের ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

উক্ত জমায়েতে ‘আল্লাহপ্রেম’ এবং ‘আল্লাহর প্রেমিক কারা’ এ দুটো সম্পর্কিত [relatated] বিষয়ের ওপর আলোচনা শুরু হলো। প্রায় সব ওলি এ ব্যাপারে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করলেন। অবশেষে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, “হে জুনাইদ! আপনি তো বেশ নিরব আছেন। আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।”

[২২] এখানে ভুলবুঝাবুঝির অবকাশ নেই। মা’রিফাতের উচ্চস্তরে আরোহণকৃত হযরত শায়খ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ যখন ইসমে যাতের জিকির করছিলেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মুশাহাদার [আল্লাহ তা’আলার উপস্থিতির] স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর এ জিকির ও অপর ব্যক্তির জিকিরের মধ্যে আধ্যাত্মিক দিক থেকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। বাস্তবে কারামতটি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিলো আর এর প্রভাব পড়ছিলো অনুসরণকারী ব্যক্তির ওপর হযরতের ওয়াসিলায়। তাই তাকে ‘ইয়া জুনাইদ!’ বলার অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ তোমার ওলি জুনাইদের ওয়াসিলায় আমাকেও পায়ে হেটে নদী পার হওয়ার ক্ষমতা দান করুন। এরূপ করা মোটেই শিরকের অন্তর্ভুক্ত আমল নয়, যা মরদূদ শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছিলো। -গ্রন্থকার।

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ মাথা নতো করলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। বললেন, "আল্লাহর প্রেমিক তিনি, যিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। শুধুমাত্র জিকরুল্লাহর মধ্যে ঢুবে থাকেন। জিকিরের সকল অবস্থা তার মধ্যে বিরাজ করে; হৃদয়নেত্রে আল্লাহর দর্শন করেন, ঐ হৃদয় [ক্বলব] আল্লাহভীতির তাজাল্লি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে; আল্লাহর জিকির তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যেরূপ এক কাপ সুরা করে থাকে, তিনি আল্লাহর কথা উচ্চারণ করেন, যেমন স্বয়ং আল্লাহই তার মাধ্যমে কথা বলছেন; তিনি যদি নড়েন তাহলে তা হয় আল্লাহর নির্দেশে; তিনি মানসিক সান্ত্বনা লাভ করেন শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে; এবং যখন এরূপ স্তর লাভ হয় তখন, তার খাওয়া, পান করা, নিদ্রা, সজাগ হওয়া- এবং মোদ্দাকথা তার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ হয়ে যায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত; তিনি না কোনো জাগতিক কৃষ্টির প্রতি কর্ণপাত করেন, না তিনি মানুষ কর্তৃক তার প্রতি কোনো তিরস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।"

৬. আল্লাহর জিকিরই মূখ্য: তিনি বলেন, "যে চক্ষু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সৌন্দর্যের স্বরূপ দেখতে অপারগ সে চক্ষু অন্ধ হয়ে যাওয়াই উত্তম; যে জিহ্বা তাঁর [আল্লাহর] জিকির থেকে গাফিল সেটি বোবা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়; যে কর্ণ তাঁর [আল্লাহর] মাহাত্মের গুণগান শুনে নি, সেটি বধির হয়ে যাওয়াই ভালো; এবং যে শরীর আল্লাহর ইবাতদ করে না, সেটি মরে যাওয়াই উচিৎ।"

৭. দৃষ্টিপাতের গভীরত্ব: একব্যক্তি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে বললো, "আমার দিকে তাকান।" তিনি জবাব দিলেন, "গত ২০ বছর যাবৎ আমার হৃদয় দিয়ে আল্লাহর দিকে তাকাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তাহলে তোমার দিকে সফলভাবে তাকাবো কী করে?"

৮. পবিত্র হজ্জের হাক্বিক্বাত: একব্যক্তি পবিত্র হজ্জ পালন করে বাগদাদে এসে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হযরত তাকে প্রশ্ন করলেন: "যে মুহূর্তে আপনি বাইতুল্লাহর হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে যান, সে সময় আপনি কী সকলপ্রকার পাপকর্ম থেকেও দূরে সরার নিয়ত করেছিলেন?"
হাজী সাহেব জবাব দিলেন, "না-তো, এমন কোনো নিয়ত করি নি।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি কোনো ভ্রমণই করেন নি। আচ্ছা বলুন, যাত্রার সময় প্রতিটি স্থানে যেখানে আপনি রাত্রিযাপনের জন্য থেকেছিলেন, আপনি কী আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার একেকটি স্তর অতিক্রম করছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না হযরত! এরূপ কিছু তো বুঝি নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি [সুলুকের] রাস্তায় পদার্পণই করেন নি। আরো বলুন, মিক্বাতে পৌঁছুয়ে যখন ইহরাম পরেছিলেন, তখন কী আপনি মানবিক সকল স্বভাব-চরিত্রকে বিসর্জন দিয়েছিলেন ঐ দুটুকরো কাপড় পরার সময়?”
হাজী সাহেব: “না হযরত! এটাও করি নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি হজ্জের জন্য ইহরামও পরেন নি। আচ্ছা বলুল তো, আপনি যখন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেছিলেন, তখন কী এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তা’আলার মুশাহাদার মধ্যে ছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি উকুফে আরাফাহ করেন নি। যখন আপনি মুজদালিফায় যেয়ে নিজের ইচ্ছে পূরণ করেছিলেন, তখন কী যাবতীয় দৈহিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না হযরত! এরূপ কিছু হয় নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি উকুফে মুজদালিফা পালন করেন নি। আরো বলুন, আপনি যখন তাওয়াফে জিয়ারত করেন তখন আপনি কী নিরাকার আল্লাহ তা’আলার সৌন্দর্য পবিত্রতার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করে দর্শন করেছেন?”
হাজী সাহেব: “না, এরূপ কিছু দেখি নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি তাওয়াফে জিয়ারতও করেন নি। এবার বলুন, আপনি যখন সাঈ করেন, সে সময় আপনি কী পবিত্রতা [সাফা] ও সদগুণ [মারওয়াহ] অর্জন করেছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না, তা-ও হয় নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি সাঈ করেন নি। আরো বলুন, আপনি যখন মীনায় ফিরে আসলেন তখন কী আপনার যাবতীয় ইচ্ছার সমাপ্তি [মুনা] ঘটেছিল?
হাজী সাহেব: “জী না। ঘটেনি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে আপনি মীনায়ও অবস্থান করেন নি। বলুন, আপনি যখন কুরবানীর স্থানে যেয়ে পশু জাবই করেছিলেন, তখন কী আপনি যাবতীয় দুনিয়াবী খাহিশাতকেও কুরবানী দিয়েছিলেন?”
হাজী সাহেব: “জী না, দেই নি।”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে তো আপনি কুরবানীও করেন নি। আপনি যখন জামারাতে যেয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন কী ক্বলবের যাবতীয় ঐচ্ছিক কু-ধারণাকে বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়েছিলেন?”
হাজী সাহেব: “না-তো, এমনটি করি নি।”
হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ: “তাহলে আপনি কঙ্করও নিক্ষেপ করেন নি। বাস্তবে আপনি হজ্জও করেন নি। আবার হজ্জে চলে যান।”

৯. আত্মপরিচিতি থেকে বিস্মৃত হওয়া: হযরত জুনাইদ বাগাদাদী রাহিমাহুল্লাহ স্বরচিত ‘কিতাবুল ফানা’ [আত্মবিলুপ্তির গ্রন্থ] নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন: “নির্বাচিত এবং নির্বাচিতের নির্বাচিতদের ব্যাপার হচ্ছে, তারা নিজেদের অবস্থার বিস্ময়করতা হেতু আত্মপরিচিতি হারিয়ে ফেলেন। তাদের জন্য ‘উপস্থিতি’ অবশিষ্ট থাকে না। হাক্বিক্বাত তাদেরকে করায়ত্ব করেছে, মুছে দিয়েছে, আত্মবিলুপ্ত করেছে তাদের নিজস্ব সকল গুণাবলী থেকে। সুতরাং হাক্বিক্বাত তাদের মধ্য দিয়ে ও উপর দিয়ে কাজ করে। হাক্বিক্বাত তাদের মধ্যে সকল অভিজ্ঞতায়ও উপস্থিত থাকে।”

১০. আল্লাহর পথে সাধনায় আত্মনিয়োগের সুফল: পবিত্র কিতাবুল্লাহর আয়াতে করীম:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا * وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

-“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” [আনকাবুত: ৬৯]

-এর ব্যাখ্যায় হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যারা স্বীয় খাহিশাতের বিরুদ্ধে কঠোর সাধনা করে এবং আল্লাহ রাহে তাওবাহ করে, তাদেরকে আমি [আল্লাহ] ইখলাস অর্জনের রাস্তায় নিয়ে যাবো। কেউ কারো দুশমনের বিরুদ্ধে বাহ্যিক জিহাদ করতে পারবে না, যদি না সে এ দুশমনের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ জিহাদে লিপ্ত হয়। আর যাকে এ দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করা হবে, সে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। আর যাকে এ দুশমনদের বিরুদ্ধে পরাজিত করা হবে, সে তাদের বিরুদ্ধে পরাজয়বরণ করবে।"

১১. সাধনার কাঠিন্যতা: তিনি বলেছেন, "ঈমানদারদের জন্য ইহলোক থেকে পরলোকে ভ্রমণ [জাগতিক সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আধ্যাত্মিক অবস্থায় পরিবর্তন] সহজ। সৃষ্ট প্রাণী থেকে সৃষ্টিকর্তার নিকট ভ্রমণ কঠিন। নফস থেকে আল্লাহ পর্যন্ত ভ্রমণ খুব কঠিন। আর আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান কঠিন থেকেও কঠিন।"

১২. আল্লাহ থেকে মুখ ফেরানোর খেসারত: তিনি বলেন, "যদি কেউ হাজার বছরব্যাপী আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে, এরপর সে একটি মুহূর্তের জন্য তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে ঐ মুহূর্তে যেটুকু সে হারাবে তার পরিমাণ [হাজার বছরের ইবাদতে] যাকিছু সে অর্জন করেছিলো তার থেকেও বেশি হবে।"[২৩]

১৩. জুহদের অর্থ: জুহদের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "জুহদ হচ্ছে, হৃদয়কে সার্বক্ষণিক চাওয়া থেকে মুক্ত করা।"[২৪]

১৪. সবর কী: তিনি বলেন, "সবর হলো, তিক্ততাকে ভ্রূকুঞ্চন [বা অভিযোগ] ছাড়া গিলে ফেলা।"[২৫]

---

[২৩] হিলায়াতুল আউলিয়া- হযরত আবু নুয়াইম ইসফাহানী রাহিমাহুল্লাহ, খ. ১০, পৃ. ২৭৮।

[২৪] মাদারিজুস সালিকীন।

[২৫] প্রাগুক্ত।

১৫. সালিক হওয়ার যোগ্যতা: "যে কেউ কুরআন শরীফ [কিছুটাও] মুখস্ত করে নি, কিংবা হাদিস শরীফ [একটুও] জনে না- সে এ আমাদের রাস্তার লোক নয়। কারণ তাসাওউফ মূলত কুরআন ও সুন্নাহর অভ্যন্তরে- বাইরে নয়।"২৬

১৬. আন্তরিকতা একটি সূক্ষ্ম বিষয়: তিনি বলেন, "আন্তরিকতা [ইখলাস] হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর গোলামের মধ্যকার একটি সূক্ষ্ম বিষয় [সির]। এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না- এমনকি কিরামান কাতিবীন ফিরিশতারাও তা অজ্ঞাত। সুতরাং এটি কখনো লিপিবব্ধ হয় না বান্দার আমলনামায়। অপরদিকে মরদূদ শয়তানও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং সে এর বিরুদ্ধে ওয়াসয়াসা দিতেও অপারগ। এছাড়া মানবাকাঙ্ক্ষা [হাওয়া] এ থেকে মুক্ত। সুতরাং এটা একে প্রভাবান্বিত করতে পারে না।"২৭

১৭. আত্মশুদ্ধির জিহাদ: "একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য যে কেউ তাওবাসহ কঠিন মুজাহাদা করবে, তাকেই ইখলাসের রাস্তার দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।"

১৮. ওলি না শয়তান: "যদি কেউ পানির ওপর দিয়ে হেটে যেতে সক্ষম হয়, কিংবা বাতাসে ভাসমান জায়নামাযে সিজদা দেয় আর সে রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ না করে, তাহলে সে ওলিআল্লাহ নয়- বরং সে হচ্ছে শয়তান।"

১৯. শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে পাপকামনা আরো মারাত্মক: "শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম' পাঠ করে বিতাড়িত করা যায়। কিন্তু মনের মধ্যে নিজ থেকে উদ্বুদ্ধ কুমন্ত্রণাকে বিতাড়ন খুব কঠিন। এজন্য প্রয়োজন হয় মুর্শিদের সুহবত ও কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা।"

২০. বহিরাঙ্গ থেকে ব্যক্তিত্বের পরিচয় মিলে না: "ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র কখনো মানুষের বাহ্যিক রূপ দ্বারা বুঝা যায় না। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে উন্নত স্তরে পৌঁছুয় উত্তম চরিত্র দ্বারা।"

---

২৬ প্রাগুক্ত।

২৭ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০।

২১. দুর্নীতির মূল: “নফসের প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে সকল দুর্নীতির মূল।”

২২. আল্লাহর গোলাম কারা: “যে কেউ নিজের নফসকে দুশমন মনে করে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা দেয়, সে-ই হচ্ছে আল্লাহর গোলাম।”

২৩. দ্বীনের পাহারাদার কারা: “যে ব্যক্তি তার হৃদয়ের পাহারাদার সে দ্বীনেরও পাহারাদার।”

২৪. ফিরিশতার মাধ্যমে রূহানী শক্তি অর্জন: তিনি বলেন, “একদিন নিয়মিত ওয়াজিফা পাঠ করছিলাম। কিছুটা তন্দ্রা এসে গেলো। অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেলাম একজন ফিরিশতা আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি নিজের রূহানী তাজাল্লি দ্বারা আমার হৃদয়কে আলোকিত করে বললেন, ‘দাঁড়াও আবুল ক্বাসিম! কথা বলো। তোমার অন্তরে রূহ প্রবেশ করেছে’, একথা শুনার পর আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলো। আমি কাঁদতে থাকি।”

২৫. সুফিদের কথাবলা: কেউ একজন তাঁকে সুফিদের কথাবলা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি জবাব দিলেন, “সুফিদের কথন নেই।” অন্য আরেক ব্যক্তি এ জবাব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন, “আবুল ক্বাসিম [তিনি নিজে] যা বলেছে সত্য বলেছে। একজন সুফির বিচরণ ক্ষেত্র শুধুমাত্র অদৃশ্য জগতে। তাঁর জিহ্বা যখন শিথিল হয় এবং আল্লাহ তা’আলা তাঁকে কথা বলতে অনুমতি দেন, তখনই তিনি কথা বলেন। অন্যথায় তিনি নিরব থাকেন।” তিনি আরো বলেন, “আপনারা আমাকে পূর্বে কথিত বাক্য পুনরাবৃত্তি করতে বলবেন না- কারণ আমি তা পারবো না। আল্লাহ তাআলা ঐ কথাগুলো বলতে আমার মুখে রেখেছিলেন এবং জিহ্বাকে নাড়িয়েছেন। এগুলো কোনো কিতাব বা দারস থেকে প্রাপ্ত হই নি- বরং আল্লাহর অনুগ্রহ বৈ নয়।”

২৬. তাসাওউফের সংজ্ঞা: (১) তাসাওউফ এমন একটি চেষ্টা যেখানে মানব বাস করে। (২) তাসাওউফ বাস্তবে আল্লাহর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে দৃশ্যত এটি হচ্ছে মানবের গুণ।[২৮]

---

[২৮] প্রথম সংজ্ঞা দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্যে যে, দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করতে গাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে প্রভুর নৈকট্য অর্জন। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, যখন দূরত্ব মিটিয়ে নৈকট্যের স্তরে উপনীত হবে, তখন সালিকের নিকট উন্মোচন হবে যে, যাবতীয় গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর। তার নিজস্ব গুণাবলী মূলত হাক্বিক্বাতের

২৭. ফানা [বিলুপ্তি] ও বাকা [স্থিতি] সম্পর্কে হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর একটি (বঙ্গানূদিত) কবিতা:

আমার মাঝে আছে যা উপলব্ধি করেছি তা,
আমার জিহ্বা তব সাথে গোপনে বলেছে কথা।
আমরা একীভূত হয়েছি একদিকে,
অপরদিকে পড়ে আছি দূরত্ব রেখে।
সম্ভ্রম হেতু যদিও তুমি আমার চোখের দৃষ্টির আড়ালে,
পরমানন্দে দেখিয়েছে তব রূপলাবণ্য মমো অন্তরতম স্থলে।

২৮. ফানার অবস্থা: তিনি বলেন, "কিছুদিনের জন্য আমার হতভম্বতা হেতু ইহ-পরলোকের সবাই ক্রন্দন করেছে। এরপর তাদের অনুপস্থিতি হেতু আমিও ক্রন্দনে রত হই। এখন আমার অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, আমার না আছে তাদের সম্পর্কে জ্ঞান, না আছে নিজের সম্পর্কে জ্ঞান।"

২৯. দেখা দুধরনের: "কেনো বস্তু দেখার স্বরূপ দুটি: (১) প্রথমটি হচ্ছে অস্তিত্বের [বাকী] চোখে দেখা। (২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিলুপ্তির [ফানী] চোখে দেখা। প্রথম ধরনের চোখে দেখা হলে, দর্শক প্রত্যক্ষ করবে- সমগ্র মহাবিশ্ব নিজের অস্তিত্বের [আল্লাহতে বাকীর অবস্থা] অবস্থাভেদে অসম্পূর্ণ আছে। কারণ সে ইন্দ্রিয়লব্ধ ঘটনাকে স্ব-অস্তিত্বশীল মনে করে না। অপরদিকে যখন বিলুপ্তির [আল্লাহতে ফানী অবস্থার] চোখে দেখা হয় তখন, সে উপলব্ধি করবে সমগ্র সৃষ্ট বস্তু অ-বিদ্যমান। শুধু আল্লাহ তা'আলা চির-অস্তিত্বশীল। উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু, দর্শক সৃষ্ট বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ কারণেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন: 'হে আল্লাহ! বস্তু যেরূপ আছে সেরূপই আমাদেরকে দেখান। কারণ যে কেউ এরূপ দেখেবে সে সান্ত্বনা পাবে।'"[২৯]

প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এ স্তরে সে নিজের সকল গুণাবলী থেকে বিলীন হয়ে যায়। হযরত হাজবেরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাওহিদের হাক্বিক্বাতে বাস্তবে কেনো মানবিক গুণাবলী নেই। এর কারণ হলো মানবিক গুণাবলী স্থায়ী নয়- এগুলো ছবি ও ছাপের মতো। এতে স্থায়িত্ব নেই, কারণ এগুলোর আসল সূত্র স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং বাস্তবে সব গুণাবলীর একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলা।" -গ্রন্থকার

[২৯] জানা থাকা প্রয়োজন যে, বাকা ও ফানা এ উভয় অবস্থা সাধারণ মানুষের স্তর নয়। উভয়টিই ওলিদের স্তরের [বা হালের] অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটিকে 'ওয়াদাতুশ শুহূদ' ও দ্বিতীয়টিকে 'ওয়াদাতুল উজূদ' তত্ত্ব ধারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। -গ্রন্থকার

৩০. আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান [মা'রিফাত]: তিনি বলেন, "মা'রিফাত বা আল্লাহপরিচিতি যখন উচ্চস্তরে আরোহণ করে। যখন তোমার হৃদয় এ জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তুমি তাঁর আনুগত্যে শান্তি অনুভব করো। তোমার মন-মানসিকতা তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণের কারণে স্পষ্ট হয় এবং তোমার বুঝ তাঁর ওপর নির্ভর করে। তখন তোমার মানবিক অস্তিত্ব আর থাকবে না। তোমার স্ব-ইচ্ছে বিলুপ্ত হবে। তোমার জ্ঞান আলোকিত হবে- কারণ এটি আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর হাক্বিক্বাতের ভাণ্ডার তোমার মাঝে উন্মোচন হবে।"

৩১. সিদক্ব [সত্যবাদিতা] ও ইখলাসের [আন্তরিকতা] মধ্যে পার্থক্য: তিনি বলেন, "ইখলাস সিদক্বকে ছাড়িয়ে গেছে। সিদক্বের স্তর ইখলাস থেকে উন্নত।"

৩২. সালিক তিন প্রকারের: "জেনে রাখো, সালিক তিন ধরনের: (ক) প্রথম সালিক অন্বেষাকাঙ্ক্ষী ও অনুসন্ধানী। সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় শরীয়তের জ্ঞান আহরণ ও অনুসরণ করে। সে সকল আইন-কানুন মানে, সকল প্রকার উপাসনায় লিপ্ত থাকে ও হালাল-হারাম বুঝে চলে। (খ) দ্বিতীয় সালিক [প্রথমজনের সকল আমল করেও] আভ্যন্তরীণ পবিত্রতাসহ অগ্রসর হয়। দরোজায় পৌঁছুয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। (গ) তৃতীয় সালিক কাঙ্ক্ষিত কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে সেখানেই থাকে।"

৩৩. আল্লাহর ওপর ভরসার ব্যাখ্যা: "যদি কেউ দাবি করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন তার আশ্রয়স্থল ও ভরসাস্থল, এবং একইসময় সে অপরদের কাছেও আশ্রয় ও সান্ত্বনা কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবেন। তার অন্তর থেকে জিকরুল্লাহ বিলুপ্ত করবেন। তাকে শুধুমাত্র জিহ্বার জিকিরে লিপ্ত রাখবেন। সে যদি তার এ নির্বুদ্ধিতা অনুধাবন করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, তাহলে তিনি তার ওপর থেকে বিপর্যয় ও বিপদাপদ আবার তুলে নেবেন। কিন্তু সে যদি গাইরুল্লাহর প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত রাখে কট্টরভাবে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর স্বীয় রহমত নাজিল করা থেকে বিরত হবেন। সে বঞ্চিত হবে তাঁর সৃষ্টির উপকার থেকে। এর বদলে তার মধ্যে পয়দা হবে অতিলোভ। ফলাফলস্বরূপ, মানুষ তার ওপর নিজেদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য চাপ দেবে। একই সময় এদের অন্তরে তার প্রতি কোনো দয়ার উদ্রেক হবে না। এর ফলে, তার জীবনটি বরবাদ

হয়ে যাবে। তার মৃত্যুতে দুঃখ-বেদনা ছাড়া আর কোনো মূল্য থাকবে না। তার আখিরাতের জীবন হবে অনুতাপ-পরিতাপ ও অনুশোচনার।"

আল্লামা শাহ'রানী রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরার পর বলেন:
نحن نعوذ بالله من الرُّكون إلى غير الله تعالى
[নাহনু নাউ'যুবিল্লাহি মিনার-রুকূনি ইলা গ্বাইরিল্লাহি তা'আলা]
-"আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, তাঁকে ছাড়া অন্য কারোর প্রতি ভরসা করা থেকে।"৩০

৩৪. উত্তম নিয়তের উপকারিতা ও পাপের নিয়তের অপকারিতা: "যখন কেউ তার উত্তম নিয়তের একটিমাত্র দরোজা খুলে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাওফিকের ৭০টি দরোজা উন্মুক্ত করেন। অপরদিকে কেউ যখন পাপের নিয়তের একটি দরোজা খুলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ৭০টি লজ্জা ও অসম্মানের দরোজা উন্মুক্ত করেন। সে এ ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারে না।"৩১

৩৫. জ্ঞানের মূল্য: তিনি বলেন, "জ্ঞানের মূল্য আছে। এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ না করে একে কাউকে দেবে না।" কেউ একজন প্রশ্ন করলো, "হযরত! এর মূল্যটা কী?" জবাব দিলেন, "যে কেউ একে ভালো ও উত্তম আচরণের দ্বারা অনুধাবন করে এবং তা নষ্ট করে না- তাকে দেওয়াই এর মূল্য।"৩২

৩৬. সুন্নাতের অনুসরণই একমাত্র উন্মুক্ত পথ: "সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সব রাস্তা বন্ধ হয়েছে একটিমাত্র পথ ছাড়া। এ পথটি হলো রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্ন [সুন্নাতের] অনুসরণ।"

৩৭. যারা জাহান্নামে চলে গেছে: হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, "হযরত! একদল লোক বলে থাকে শরীয়তের অনুসরণ তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, তারা মনে করে শরীয়ত হচ্ছে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুনোর মাধ্যম মাত্র।

---

[৩০] 'আক্বাওয়ালে সালাফ' [ইংরেজি অনুবাদ] - শায়খ কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী, খ. ২, পৃ. ৬৮১-৬৮২।

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪।

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৫। লক্ষ করুন, এ কারণেই ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অপরিপক্ক ব্যক্তির নিকট জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাও এখানে একই কথা বলেছেন।

ইতোমধ্যে শরীয়তের অনুসরণ করে আমরা কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছুয়ে গেছি, সুতরাং শরীয়ত অনুসরণ আমাদের জন্য আর জরুরী নয়। এদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

তিনি জবাব দিলেন, "তারা পৌঁছুনোর ব্যাপারে যে দাবি করছে তা সত্য- কিন্তু তারা পৌঁছুয়েছে জাহান্নামে! যে ব্যক্তি চুরি কিংবা জিনা করে, তারাও এরূপ দাবীদারদের চেয়ে উত্তম। আমি যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকি তথাপি শরীয়তের অনুসরণ তো বটেই, এমনকি [নফল] ইবাদত থেকেও গ্রহণযোগ্য কৈফিয়ত ছাড়া কখনো গাফিল হবো না।"

৩৮. সত্যিকার সাদিক্বের [আল্লাহ তা'আলার বান্দা] পরিচয়: তিনি সত্যিকার সাদিক্ব কারা তার পরিচয় দিতে যেয়ে বলেন, "একজন সাদিক্ব দৈনিক চল্লিশবার অস্থিরতা বোধ করেন। তিনি সর্বদা অনুসন্ধানে থাকেন উত্তম আমলের জন্য এবং কোথায় তিনি সর্বোচ্চ প্রতিদান পেতে পারেন। যেখানেই উত্তম প্রতিদান মিলবে সেখানেই তার বিচরণস্থল। অপরদিকে মুনাফিক ব্যক্তি একই অবস্থায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত অতিবাহিত করবে। সে কখনো নিজেকে পরিবর্তন করে না। এ লোকদেখানো আমলের নাম 'প্রশংসা কুড়ানোর জন্য দর্শন'। আহলুল্লাহগণ এ ব্যাপারে সতর্ক।"

৩৯. মুক্তির কারণ: কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "উত্তম আমল ছাড়া মুক্তি লাভ কী সম্ভব?" তিনি জবাব দিলেন, "বাস্তবে উত্তম আমলগুলোই হচ্ছে মুক্তিলাভের প্রকাশ বা নিদর্শন।"৩৩

৪০. অন্তঃসারশূন্য সুফি: তিনি বলেছেন, "তুমি যদি দেখো, একজন সুফি বাহ্যিক দিকে খুব সুবেশ [স্মার্ট], তবে নিশ্চিত জেনে রেখো, তার অভ্যন্তর ফাঁকা।"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর খুলাফাবৃন্দ

তাঁর খলিফাদের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে বিখ্যাত কজন হলেন: হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩৩৪ হি.], হযরত ইবনে হুসাইন জুরাইরী

৩৩ 'নাফাহাতুল উন্স', পৃ. ২৪৫, আক্বওয়ালে সালাফ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৮৮। লক্ষ করুন: উক্ত বক্তব্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে যখন উত্তম আমল করার তাওফিত দেন, তখন ধরে নিতে হবে তাকে মুক্তি দেওয়াই প্রভুর উদ্দেশ্য। -গ্রন্থকার।

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩১১ হি.], হযরত আবুল মুগিত হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, ৩০৯ হি.], আবু আলী আহমদ রুজবারী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২২ হি.], আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে কিত্তানী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২২ হি.], আবু হাসান ইবনে মুহাম্মদ মুজাইয়্যিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২৮ হি.], আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩২৮ হি.] ও আবু ইয়াকুব ইসহাক্ব ইবনে মুহাম্মদ নাহরাজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ. ৩৩০ হি.]।

মৃতুকালীন অবস্থা

মহাত্মন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবনের ইতি হতে যাচ্ছে, তখন তিনি উপস্থিত খাদিমকে বললেন, 'আমাকে উযু সারতে সাহায্য করো।' উযু করানের সময় খাদিম তাঁর দাড়ি খিলাল করতে ভুলে গেলেন। তিনি তাকে এ ব্যাপারে অবগত করেন। এরপর তিনি সিজদাবনত হয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকেন। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, "হে শায়খ! সারা জীবনভর এতো ইবাদত-বন্দেগী করার পরও আজ আপনি এতো বেশি কাঁদছেন কেনো?"

তিনি জবাব দিলেন, "এখন থেকে কী কোনো উত্তম সময় আর বাকি আছে? আমার আমলনামার হিসাব-নিকাশ তো শীঘ্রই বন্ধ হবে।"

এরপর তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকেন। হযরত জুরাইরী রিাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমি হযরতকে বললাম, হে শায়খী! নিজেকে কিছুটা স্বস্থি দিন।" তিনি বললেন, "ওহে আবু মুহাম্মদ! এ মুহূর্তে আপনি কী কাউকে জানেন, যার কুরআনের প্রয়োজন আরো বেশি আছে? আমার আমলনামা তো ভাঁজ করা হচ্ছে। আমি আমার আমলমানা দেখতে পাচ্ছি আকাশে ঝুলন্তাবস্থায়। খুব সরু একটি সূতা দ্বারা বেধে রাখ হয়েছে। বাতাসে এটি দুলছে। আমি জানিনা, এ বাতাস মিলনের না পাপমুক্তির ঘোষণা। একদিকে আমি দেখতে পাচ্ছি জান কবজের ফিরিশতা আর অপদিকে আমি দেখতে পাচ্ছি পুলসিরাত। ঐ তো রাজাধিরাজ বিচারক! রাস্তাটি সেদিকে, আমি জানি না কোন রাস্তা দিয়ে আমাকে গমন করতে হবে।"

এরপর তিনি এক খতম কুরআন তিলাওয়াত শেষ করেন। আবার শুরু করে সূরা বাক্বারার ৭০ নাম্বার আয়াতে পৌঁছেন। তাঁর জবান বন্ধ হয়ে যায়। আঙ্গুলে গুণে তাসবীহ্ জপতে লাগলেন নিরবে। তারপর শাহাদাত অঙ্গুলি খাঁড়া করলেন। জবান থেকে বেরিয়ে আসলো: "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" কালামটি। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো। তাঁর রূহ মাটির কায়া থেকে বের হয়ে ইল্লিয়্যিনে আরোহণ করলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

যুগের শ্রেষ্ঠ এই ওলি রজব মাসের ২৭ তারিখ, ২৯৮ হিজরি সনের শুক্রবার দিন ইন্তিকাল করেন। তাঁর মরদেহ গোসল দেওয়ার সময় চোখের মধ্যে পানি ঢালতে উদ্যোত হতেই এক গায়েবী আওয়াজ শোনা গেলো: "আমার প্রিয় বান্দার চোখে হাত দেবে না। আমার স্মরণের মাঝে এ দুটো চোখ বন্ধ হয়েছে। আর এগুলো পুনরায় খুলবে আমাকে দর্শনের মাধ্যমে।" গোসল দেনেওয়ালা ব্যক্তিগণ তাঁর অঙ্গুলিগুলো [খিলাল করার জন্য] খুলতে হাত দিতেই আবার আওয়াজ উঠলো: "থামো! ঐ অঙ্গুলিগুলো বন্ধ হয়েছে আমার নামের মাধ্যমে, আর এগুলো পুরনায় খুলবে আমার নির্দেশে।"৩৪

হযরতের ইন্তিকালে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে হযরত ইমাম হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা যদি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গুণাগুণ বর্ণনা করতে যাই তাহলে অনেক খণ্ড কিতাব রচনা করেও পারবো না।"

হযরতের দাফন শেষে এক ওলিআল্লাহ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া শায়খ! মুনকার ও নকীর ফিরিশতাদের জবাবদিহি কিরূপ ছিলো?" তিনি জবাব দিলেন, "ফিরিশতারা আমার সম্মুখে এসে প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রভু কে? [من ربك] আমি মুসকি হেসে জবাব দিলাম, আমার প্রভু তিনি যাঁর প্রশ্নের [أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ] জবাবে আমি বলেছিলাম, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। [قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا] এখন তাঁর বান্দাহ ফিরিশতাকে জবাব দেওয়ার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? আমি তো বাদশাহদের বাদশাহর সম্মুখে জবাব দিয়ে ফেলেছি! ফিরিশতাদ্বয় আর কিছু না বলে, একে অন্যের সঙ্গে একথা বলাবলি করে চলে গেলেন: 'তিনি তো দেখছি এখনও গভীর প্রভুপ্রেমে ডুবন্ত আছেন!'" আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন

[৩৪] মাসালিকুস সালিকীন, খ. ১।

ওলির মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন এবং সংরক্ষণ করুণ তাঁর সকল গোপন রহস্যাবলী।

সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকা মুতাবিক শাইখুল মাশাইখ হযরত আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা হযরত শায়খ আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হচ্ছেন পরবর্তী শায়খ। সুতরাং, আমরা এখন তাঁর মহামূল্যবান জীবন ও সাধনার ওপর যেটুকু সম্ভব আলোচনা করবো। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এমনভাবে আলোচনার তাওফিক দিন যা আপনার সন্তুষ্টির অনুকুলে। কারণ আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন।

হযরত শায়খ আবু আলী আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত্যু- ৩২২ হিজরি, সমধি- মিশর।)

তিনি ছিলেন সুফিকুল শিরোমণি, মহাপ্রভুর প্রিয়জন, শরীয়ত ও তরিকতের দিশারী। তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুল ক্বাসিম। তবে তিনি আবু আলী রুজবারী নামে অধিক পরিচিত। তিনি বর্তমান ইরানের ইসফাহান প্রদেশের রুজবার নামক স্থানে ২৩৫ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে অল্প বয়সেই পরিবারের সঙ্গে বাগদাদে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর পিতা বাগদাদের আব্বাসী খলিফাদের একজন উজির ছিলেন।

রিসালাতুল কুশাইরী গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশাইরী [৩৭৬-৪৬৫ হি.] রাহিমাহুল্লাহ হযরত আবু আলী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখেন: "হযরত আবু আলী আহমদ ইবনে রুজবারী বাগদাদী [শেষ জীবনে] মিশরের অধিবাসী ছিলেন। ৩২২ হিজরি সনে সেখানেই ইন্তিকাল করেন। হজরত জুনাইদ, হযরত নূরী, হযরত ইবনুল জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ সুফি-মাশাইখের সুহবত লাভ করেন। মাশাইখের মধ্যে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং এই [তরিকতের] রাস্তা সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন হযরত রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত রুজবারী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, যে ব্যক্তি গান-বাজনা শুনে বলে, এটা আমার জন্য বৈধ, আমি যে স্তরে উপনীত হয়েছি, আমার জন্য তা মোটেও অবৈধ নয়। এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সে ঠিকই স্তরে পৌঁছুয়ে গেছে, পৌঁছুয়েছে সে জাহান্নামে!' তাসাওউফ শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, 'এটা হলো বাস্তবতার পথ। সুতরাং অহেতুক একে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে মিশ্রণ করো না। তিনি আরো বলেন, 'প্রতারিত হওয়ার নিদর্শন হলো, তুমি পাপ করবে, আর আল্লাহ তোমাকে করুণা করবেন। তাঁর করুণা দেখে তুমি তাওবাহ ও অনুশোচনা থেকে গাফিল থাকবে। কারণ তুমি ভাববে তিনি [আল্লাহ] তো তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন, এটা তোমার প্রতি তাঁর করুণা।' তিনি বলেন, 'জুনাইদ হলেন আমার তাসাওউফের উস্তাদ, আবুল আব্বাস

ইবনে শুরায়হ্ হলেন ফিকহের উস্তাদ, সাহিত্যের উস্তাদ সা'আলাব এবং ইব্রাহিম হারবী হলেন হাদিসের উস্তাদ।"[৩৫]

তরিকতের সালিক

শুধু বাহ্যিক শরীয়তের জ্ঞান দ্বারা উচ্চতর ওলির মর্যাদা লাভ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এর কারণ হচ্ছে, আভ্যন্তরীণ 'তাযকিয়া' [শুদ্ধিকরণ] আদৌ কোনো কিতাবী জ্ঞান দ্বারা লাভের ব্যাপার নয়। এটা একটি আমলী রাস্তা। তা অর্জন হতে পারে যদি আল্লাহর ইচ্ছে হয়, কামিল মুর্শিদের সুহবত লাভের মাধ্যমে। হযরত রুজবারী রাহিমাহুল্লাহর যুগটি ছিলো শরীয়ত ও তরিকতের স্বর্ণযুগ। এছাড়া তখনকার ইরাকের বাগদাদ শহরটি ছিলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমে দ্বীন চর্চার কেন্দ্রস্থল। বিরাট আয়তনবিশিষ্ট মুসলিম বিশ্ব ছিলো আব্বাসী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচ্য ও প্রতিচীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য জ্ঞানান্বেষীদের জমায়েত ঘটতো বাগদাদে প্রতিনিয়ত। ইলমে দ্বীন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ওপর অধ্যয়নের পাশাপাশি বাগদাদের তখনকার যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ তথা সুফি-দরবেশগণ মানুষকে খোদাপ্রাপ্তি তথা হাক্বিক্বাত ও মা'রিফাত লাভের পথ ও পাথেয় শিক্ষা দিতেন। সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ সুফি শায়খ তখন বাগদাদে বসবাস করতেন। তাঁকে ঘিরেই তাসাওউফচর্চা হতো। তিনি ছিলেন হযরত আবুল ক্বাসিম জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ।

একদিন হযরত বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ কোনো এক স্থানে বয়ান পেশ করছিলেন। হযরত রুজবারী রাহিমাহুল্লাহ মাহফিলের নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কানে ভেসে আসলো হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর কণ্ঠে উচ্চারিত এ কথাটি: "ওহে! তুমি আমার কথা শ্রবণ করো!" হযরত রুজবারী থমকে দাঁড়ালেন। মনে হলো ওয়াইজ হযরত তাঁকেই সম্বোধন করছেন। তিনি ওয়াজ শুনতে লাগলেন। ক্রমেই তাঁর মন জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। হৃদয়ের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড তোলপাড়। তিনি আর থেমে থাকতে পারলেন না। ছুটে গেলেন জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর দরবারে। বললেন, "হুজুর! জীবনে যা শিখেছিলাম সব অন্তর থেকে মুছে গেছে! অনুগ্রহ করে হাক্বিক্বাতের রাস্তায় আমাকে পাড়ি জমাতে সাহায্য করুন।"

[৩৫] আর-রিসালাতুল কুশাইরী ফী ইলমিত তাসাওউফ- বঙ্গানুবাদ, সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, পৃ. ১৬৫, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী, সিলেট।

মুরিদ হওয়ার পর একদল তারকা ওলিদের সঙ্গে তিনিও জড়োত হলেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গীসাথী ও মুরিদানের মধ্যে ছিলেন, হযরত আবু বকর শিবলী, আবুল হাসান নূরী, আবু হামযা খুরাশানী, আবুল ক্বাসিম নাসরাবাদী, মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বাগদাদী, আবু বকর ক্বাতিফী, আবু আমর দামেস্কী, মনসুর হাল্লাজ, আবুল হাসান সিওতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এই মুবারক নামসমূহের তালিকায় যুক্ত হলো হযরত আবু আলী রুজবারী রাহিমাহুল্লাহর নামটিও।

খিলাফত লাভ

হযরত রুজবারী রাহিমাহুল্লাহ মুরিদ হওয়ার পর স্বীয় পীর হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদায় দীর্ঘদিন কাটান। এরপর হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন।

মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা

খিলাফত লাভের পর হযরত রুজবারী রাহিমাহুল্লাহ কিছুদিন বাগদাদে থেকে তাসাওউফের খিদমত করেন। এরপর মুর্শিদের নির্দেশে মিশরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। কায়রো শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে একদিন সেখানেই মাওলার দরবারে ফিরে যান।

বিভিন্ন ঘটনা

১. মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন: তিনি বলেন, “মিশরের এক দরবেশ আল্লাহর জিকির করাকালে ইন্তিকাল করেন। আমরা সবাই তাঁর কাফন দাফনের ব্যবস্থা করি। কবরে লাশ রেখে আমি তাঁর মুখমণ্ডল খেকে কাফনের কাপড় সরিয়ে দিলাম, যাতেকরে তাঁর ওপর দয়ালু প্রভুর রহমত পতিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, তিনি চোখ মেলে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বললেন, “হে আবু আলী! তুমি কী দেখতে পাচ্ছো, তাঁর সম্মুখে আমাকে বিনয়াবস্থায়? তিনিই তো আমাকে তাঁর প্রিয় বান্দায় পরিণত করেছেন।” আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, “হে মানবসন্তান! আপনি কী মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে গেলেন?” জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, আমি জীবিত। আল্লাহর বন্ধুরা সর্বদাই জীবিত থাকেন। হে আবু আলী! আমি তোমাকে সাহায্য করবো।” একুটু বলে তিনি পুনরায় চোখ বন্ধ করে দিলেন।”

২. দরবেশ ও যুবক: হযরত রুজবারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "একদিন আমি একটি ক্বওমি স্নানাগারে গেলাম। কক্ষের বাইরে দেখলাম একটি তালিযুক্ত জুব্বা। ভেতরে গিয়ে দেখি একজন দরবেশ সুদর্শন এক যুবককে গোসল করাচ্ছেন। এরপর তোয়ালি দ্বারা তার শরীর মুছে বাইরে নিয়ে গেলেন। তাকে উত্তম কাপড় পরিয়ে গায়ে গোলাপজল ও আতর মাখিয়ে দিলেন। হাতে একখানা পাখা নিয়ে তাকে বাতাস দিতে লাগলেন। কিন্তু এতো খিদমাত লাভের পরও যুবক দরবেশের প্রতি তোয়াক্কাও করলেন না। তিনি চলে যেতে উদ্যোত হলেন। দরবেশ বেশ পেরেশান হয়ে তাকে বললেন, 'আর কী করলে তুমি খুশি হবে?' যুবক বললেন, 'তোমার মৃত্যু হয়ে গেলে খুশি হবো!' আশ্চর্যের ব্যাপার, দরবেশ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলো! লাশটি সেখানে রেখে যুবক চলে গেলেন। এরপর লোকজন দরবেশের লাশ নিয়ে গেলো একটি খানক্বায়। সেখানকার কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হলো।

কয়েক বছর পর আমি পবিত্র হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জমায় যাই। তাওয়াফের সময় চোখে পড়লো সেই যুবককে। তার গায়ে ছিলো তালিযুক্ত মোটা সুতার জুব্বা। একসময় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওহে! তুমি সেই যুবক না, যে একজন দরবেশকে হত্যা করেছিলো?'
জবাবে যুবক বললেন, 'জী হাঁ, আমিই সেই যুবক, হে শায়খ! সেটা ছিলো আমার ভুল।'
আমি বললাম, 'তুমি এখানে আসলে কী করে?'
তিনি বললেন, 'ঐ রাতে আমি নিদ্রাকালে স্বপ্নে দেখলাম দরবেশ এসে বলছেন, তুমি আমাকে মরতে বলেছিলে কিন্তু আমার প্রতি তোয়াক্কাও করলে না!' আমি জেগে ওঠে তাওবাহ করলাম ও ছুটে গেলাম দরবেশের কবরে। মাথা মুণ্ডিয়ে পরে নিলাম এই তালিযুক্ত জুব্বা। এখন যাযাবর অবস্থায় সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি।'"

মূল্যবান বাণী

১. আমল থেকে কথা বেশি হচ্ছে হীনতার লক্ষণ। আর কথা থেকে বেশি আমল হচ্ছে মাহাত্ম্যের আলামত।
২. যাকিছু নিজের জন্য অপকারী তার মধ্যে বান্দাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

৩. কোনো সালিক যদি ৫ দিন উপবাসে থাকার পর অভিযোগ করে, তবে তাকে বাজারে ভিক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেওয়াই উত্তম।
৪. তাসাওউফচর্চা হচ্ছে আল্লাহ থেকে দূরবর্তী অবস্থান হতে নৈকট্যের দিকে যাত্রা।
৫. ভয় ও আশা হচ্ছে পক্ষীর দুটি ডানা। এর যে কোনো একটি থেমে গেলে অপরটি অকেজো। উভয়টি সক্রিয় থাকার নাম ইসলাম, অন্যথায় পথভ্রষ্টতা।
৬. ভীতির হাক্বিকাত হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কোনোকিছু বা কারোর প্রতি ভয় করা যাবে না।
৭. যার মধ্যে মহানুভবতা বিদ্যমান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং সে-ও আল্লাহকে ভালোবাসে।
৮. সুফি ঐ ব্যক্তি যে হাজারবার প্রভুর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও- বার বার চেষ্টা করতে থাকে।
৯. আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।
১০. রূহানী জগতে প্রবেশের একমাত্র পথ হচ্ছে দুনিয়া ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছু বিসর্জন দেওয়া।
১১. সামা’ বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে আছে তিনটি জিনিস: ১. হারাম খাবার খেলে অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ২. চোখকে হারাম বস্তুর ওপর পতিত করা যায় না। ৩. দুষ্ট লোকের সঙ্গ থেকে মুক্ত রাখে।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

হযরত আবু আলী রুজবারী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো। তাঁর আপন বোনের কোলে তিনি মাথা রাখলেন। রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষণকাল পূর্বে তিনি চোখ খুলে তাকালেন। বলতে থাকেন, “বেহেশত সুসজ্জিত করা হচ্ছে। ফিরিশতারা এসে বলছেন, এসো! আমরা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবো। আমি কখনও কল্পনাও করি নি যে, সেখানে এক অপূর্ব সুন্দরী হুর আমার জন্য অপেক্ষা করছে! কিন্তু আমার হৃদয় তো এখনও আল্লাহর সঙ্গে বিদ্যমান। আমি তো আর অপর কিছু বা কারোর প্রতি তাকাতে পারবো না। আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ভীষণ যন্ত্রণা সয়েছি। এ মুহূর্তে আমি কীভাবে ‘ঘুষ’ নেবো?” এরপরই তিনি চলে যান তাঁর মা’বুদের নিকট। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর এ মহান নৈকট্যশীল বান্দার মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করুন।

সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকানুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত আবু আলী হাসান ইবনে আহমদ কাতিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর যেটুকু সম্ভব বর্ণনা তুলে ধরবো। আমরা মহান একক প্রভুর সাহায্যপ্রার্থী।

হযরত শায়খ আবু আলী হাসান ইবনে আহমদ কাতিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃ. ৩৪০ হিজরি, সমাধি- মিশর।)

তাঁর নাম ছিলো হাসান। কুনিয়াত আবু আলী এবং তাঁর পিতার নাম ছিলো আহমদ কাতিব। সমকালীন যুগে মিশরের বিশিষ্ট মাশাইখের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। জীবনে তিনি একাধিক উচ্চপদে সমাসীন হন। হযরত আবু আলী রুজবারী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তাঁর মুর্শিদ। তিনি মুর্শিদের সুহবতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন। এছাড়া কায়রোতে বসবাসকারী অন্যান্য শায়খ যেমন, আবু বকর মিসরী রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখের সঙ্গ লাভ করেন।

মূল্যবান বাণী

হযরত কাতিব রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের উপর খুব বেশি জানা যায় নি। নিচের বাণীগুলো বিভিন্ন সূত্র থেকে পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি।

১. "কারোর হৃদয়ে যখন খোদাভীতি শক্তভাবে পয়দা হয়ে যায়, তখন ঐ ব্যক্তি যা বলেন তা হয় নিঃশর্তভাবে গুরুত্ববহ।"[৩৬]

২. "যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শ্রবণ করেও এর ওপর আমল করে না, সে মুনাফিক।"

৩. "আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'যে নিজেকে শক্ত করে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখবে সে আমাকে পাবে।'"

৪. "ঘোর পাপীর প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে একটি রোগ। এর প্রতিকার হলো তাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখা।"

৫. "[আল্লাহ] প্রেমিকের মধ্য থেকে বিরামহীনভাবে নির্গত হতে থাকে স্নিগ্ধ মনোমুগ্ধকর সুঘ্রাণ যদিও তাঁরা এটি গোপন রাখতে চান। এমনকি নিজেদেরকেও যদি তাঁরা আড়াল করে দেন, তথাপি সেই অপূর্ব ঘ্রাণ চুতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুগন্ধি হেতু আশিকরা তাঁর দিকে আকর্ষিত হতে থাকে।"

৬. "আল্লাহ তা'আলা জিকিরের মিষ্ট স্বাদ তাঁর বান্দাদের ওপর বর্ষণ করেন। এতে যদি জাকিরীনরা খুশি হয় ও আল্লাহর শুকরগুজারী করে তাহলে তাদেরকে তিনি দান

---

[৩৬] 'তাসাওউফ তারিখ কি আয়না মে', পৃ. ১১২।

করেন স্বীয় নৈকট্য। কিন্তু শুকুরগুজার না হলে তিনি জিকিরের স্বাদ ওঠিয়ে নেন এবং তাঁরা শুধু মৌখিক জিকিরই করতে থাকে।”[৩৭]

৭. “মু’তাজিলারা মানবিক গুণাবলী থেকে আল্লাহকে আলাদা করেছে যুক্তির মাধ্যমে এবং ভুল করেছে। অপরদিকে সুফিরা আল্লাহকে মানবিক গুণাবলী থেকে আলাদা করেছেন [ইলহামী] জ্ঞানের মাধ্যমে এবং তাঁরাই সঠিক।”[৩৮]

ইন্তিকাল

হযরত আহমদ কাতিব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মাওলার দরবারে ফিরে যান ৩৪০ হিজরি সনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি মিশরেই সমাহিত আছেন।[৩৯]

হযরত আহমদ কাতিব রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফার নাম হলো হযরত শায়খ খাজা আবু উনসান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর যেটুকু সম্ভব আলোচনা করবো। আল্লাহর সাহায্য ও ইচ্ছা ছাড়া এক অক্ষরও লেখার ক্ষমতা কারোর নেই। হে আল্লাহ! আমরা সবসময় আপনার মুখাপেক্ষী কিন্তু আপনি কারোর মুখাপেক্ষী নন।

---

[৩৭] তাবাক্বাত, খ. ১, পৃ. ৯৬।

[৩৮] ‘রিসালাতুল কুশাইরী [বঙ্গানুবাদ]’, খ. ১, পৃ. ১৭৩।

[৩৯] তাবাক্বাত, খ.১, পৃ. ৯৬।

হযরত শায়খ খাজা আবু উনসান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু: ৩৩৭ হিজরি, সমাধি- নিশাপুর, ইরান।)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো আবু উসমান সাঈদ ইবনে সালাম মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। যুগের একজন অতুলনীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত মাগরিবী। তাঁর মতো লোক ইতোপূর্বে খুব অল্পই জন্ম নিয়েছেন। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন হযরত আবু আলী হাসান ইবনে আহমদ কাতিব রাহিমাহুল্লাহ। এছাড়া তিনি সুহবত লাভ করেন হযরত হাবীব মাগরিবী ও আবু আমর জুযাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার। তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে যুগের আরো অনেক মাশাইখে আজমের সঙ্গে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নহরজুরী ও ইবনুস সায়িগ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। রিয়াজত-মুজাহাদায় সে যুগে তাঁর মতো ব্যক্তি খুব কম ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বেশ সুনাম ছিলো।

কঠোর আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম

পরিণত বয়সের শুরুতেই মুরিদ হওয়ার পর হযরত উসমান রাহিমাহুল্লাহ নফসের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। জানা যায়, রিয়াজত-মুজাহাদার অংশ হিসেবে তিনি একাধারে দীর্ঘ ৩০ বছর মাগরিবের [মরোক্কোর] নির্জন মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একাধারে দীর্ঘদিন নফল রোযা ও অল্পাহার হেতু তাঁর শরীরে মাংস বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি। তিনি কঙ্কালসার জ্যান্ত মানুষের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। চোখদ্বয়ের চতুর্দিকে কালো বৃত্তাকার দাগ পড়ে যায়।

এ অবস্থায় একদিন তাঁর নিকট ইলহাম নাজিল হলো: তুমি সৃষ্টিজগতের মধ্যে ফিরে যাও! এ নির্দেশ পেয়ে তিনি যাত্রা করলেন মক্কা মুয়াজ্জমার পথে। দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করলেন হযরত মাগরিবী রাহিমাহুল্লাহ। মক্কা শরীফের মাশাইখে আজম তাঁকে উষ্ণ স্বাগত জানালেন। তাঁর করুণ অবস্থা দেখে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, “আপনি ইতোমধ্যে ৩০টি বছর একাকী অবস্থায় মরুভূমিতে কাটিয়েছেন, যা কোনো মানুষের পক্ষে কাটানো প্রায় অসম্ভব। এ কারণে হে শায়খ! আপনি সবার নেতা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছেন। আমাদেরকে বলুন, এ দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে আপনি কী জিনিস লাভ করলেন? ওখান থেকে কী নিয়ে আসলেন?”

তিনি জবাব দিলেন: "আমি সেখানে গিয়েছিলাম 'সুকর' [প্রেমমত্ততা] অর্জনের সন্ধানে। কিন্তু এটা লাভের মধ্যে কাঠিন্যতা ও সমস্যা অবলোকন করে ফিরে এসেছি নিরাশ হয়ে। কোনো সফলতা লাভ করি নি। এ হাক্বিক্বাতের সন্ধানী হয়ে সেখানে আমি ৩০ বছরেও তা পাই নি।" আরো বললেন, "আমি একদিন আসমানী আওয়াজ শ্রবণ করলাম। বলা হলো: 'হে আবু উসমান! সহায়ক বস্তুসমূহ ভাবে প্রেমমত্ততা ও প্রভুপ্রাপ্তির কথা। এটা সহজ নয়, কারণ সবকিছুর সামগ্রিকতা যাতে বিদ্যমান আছে অস্তিত্ব বা সারাংশ- তা তো আমারই হাতে।' সুতরাং, এ বাণী শ্রবণ করে আমি ফিরে আসলাম নিরাশ হয়ে।"

মক্কা শরীফের শায়খগণ এ কথা শুনে তাঁকে বললেন, "আপনি আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন। সুতরাং, আপনার নিকট সুকর ও হাক্বিক্বাতের বর্ণনা অপরদের কর্তৃক তুলে ধরা মেটোই সঠিক হবে না।"

এরপর থেকে তিনি দীর্ঘদিন মক্কা মুকাররমার প্রধান শায়খ হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিভিন্ন ঘটনা

১. ঘিয়ের পাতিল ছুড়ে মারো: একদা ঈদের রাতে তিনি আবুল ফারিস রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। তিনি বলেন, "আবুল ফারিস নিদ্রামগ্ন ছিলেন। আমার মাথায় একটি ভাবনা আসলো। যদি এক পাতিল ঘি থাকতো, তাহলে বন্ধুদের জন্য কিছু খাবার তৈরি করতাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম নিদ্রামগ্ন আবুল ফারিস বলছেন, 'এখনই ঘিয়ের পাতিলটি ছুড়ে মারো!' এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। এরপর সজাগ হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেনো এরূপ বাক্য উচ্চারণ করলেন ঘুমের মাঝে? তিনি বললেন, 'আমি স্বপ্নে দেখছিলাম উভয়ে একটি বিরাট স্থানে অবস্থান করছি। আমরা আল্লাহর দীদার লাভের অপেক্ষায় আছি। আপনার হাতে এক পাতিল ঘি ছিলো। তাই বললাম, এটি ফেলে দিতে!"

২. চাই শুধু আল্লাহর নিকট: কেউ একজন তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে মনে মনে ভাবলো, যদি শায়খ তার নিকট কোনো কিছু চাইতেন তাহলে সে তা দান করতো। শায়খ মাগরিবী সাথে সাথে তাকে জানিয়ে দিলেন, "আমি কারোর নিকট কিছুই চাই না। যা চাই তা একমাত্র আল্লাহর নিকই চাই। একামত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ারও আশা করি না।"

৩. শাগরিদদের কর্তৃক গায়েবি আওয়াজ শ্রবণ: হযরত আবু আমর জুযাজী রাহিমাহুল্লাহ শায়খ উসমান রাহিমাহুল্লাহর দীর্ঘদিনের খাদিম ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি এক মুহূর্তের জন্যও হযরতের সুহবত থেকে দূরে যেতাম না। একদা আমি ও অন্যান্য শাগরিদ স্বপ্নের মধ্যে এক গায়েবি আওয়াজ শ্রবণ করি: 'ওহে! আবু উসমানের সাথে থাকার কারণে তোমরা আমার দরবার থেকে বঞ্চিত হয়েছো!' আমি এদিনই হযরতকে স্বপ্নের কথাটি বলতে চাইলাম। কিন্তু আশ্চর্য! কিছু বলার পূর্বেই কক্ষ থেকে বের হলেন নগ্নপায়ে। আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, 'তোমরা সবাই যা শুনেছো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, আমার সঙ্গ ত্যাগ করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করো। এবার আমাকে একাকী প্রভুর উপাসনা করতে দাও।'"

৪. পুনরায় ইসলাম গ্রহণ: হযরত আবু বকর ফারিস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হযরত শায়খী আমাকে একদিন বললেন, 'আমি কখনো কখানো ভাবতাম, আল্লাহর মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান। তিনি হয়তো এদিকে আছেন বা ওদিকে আছেন ইত্যাদি। কিন্তু যখন আমি বাগদাদে গেলাম তখন এ কল্পনার পরিবর্তন ঘটলো। বুঝতে পারলাম, বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্ব ও দিক থেকে মুক্ত। তিনি নিরাকার। এ হাক্বিক্বাত উন্মোচনের পর আমি মক্কা শরীফের মাশাইখে আজমের প্রতি পত্র প্রেরণ করি একথা বলে, 'আমি বাগদাদে এসে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছি!'"

৫. আল্লাহর অবস্থা: একদিন তিনি তাঁর এক শাগরিদকে প্রশ্ন করলেন, 'ওহে! বলো দেখি বর্তমানে আল্লাহর অবস্থা কেমন আছে?' শাগরিদ জবাব দিলেন, 'অনন্ত কালব্যাপী তাঁর অবস্থা যেমন ছিলো, এখনও তা-ই আছে এবং অনন্ত কালব্যাপী থাকবেও।' তিনি বললেন, 'বাহবা! তুমি ঠিক বলেছো।'

৬. চাকাটি বলছে আল্লাহ! আল্লাহ!: হযরত আবদুর রহমান সালমি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদা হযরত উসমান মাগরিবী রাহিমাহুল্লাহর নিকট উপস্থিত ছিলাম। অদূরেই এক ব্যক্তি কূপ থেকে পানি তুলছিলো। কূপের মধ্যথেকে পানি তোলার চক্র হতে ভেসে আসছিলো কিচির-কিচির শব্দ। তিনি বললেন, 'হে আবদুর রহমান! চাকাটি কী বলছে বুঝতে পারছো?' আমি নিরব রইলাম। তিনি বললেন, 'এটা বলছে, আল্লাহ! আল্লাহ!'"

৭. মহাবিশ্বের সবকিছুর হাক্বিক্বাত: তিনি বলতেন, “যদি পাখিদের কিচির-মিচির শব্দে, বৃক্ষরাজির পত্রাদির নড়াছড়ার আওয়াজে, বাতাস বয়ে যাওয়ার শিরশির শব্দতরঙ্গে কিংবা বৃষ্টির ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজে কারোর মধ্যে জেগে ওঠেনা প্রভুপ্রেমের মত্ততা- তাহলে তার প্রভুপ্রেমের দাবি সারশূন্য! আল্লাহ যাকে তাঁর জিকরুল্লাহ দ্বারা আলোকিত করেছেন, সে মহাবিশ্বের সব বস্তুর হাক্বিক্বাত দেখতে পায়। এ থেকে সে এতোই মহানন্দ বোধ করে যে, নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে দিতে উদ্যোত হয়। সে নিজের মাঝে ফিরে এসে এ অবস্থা থেকে আর অব্যাহতি চায় না।”

৭. আরিফ ও জাকিরের শত স্তর: তিনি বলেন, “আরিফ ও জাকিরের ১০০টি স্তর আছে। এগুলোর প্রতিটিই মৃত্যু থেকেও উচ্চতর। কারণ মৃত্যুও তাদেরকে জিকির ও মা’রিফাত থেকে দূরে রাখতে পারে না।

৮. আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুনোর একমাত্র রাস্তা: তিনি প্রায়ই বলতেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের রাস্তা দুটি: ১. নবুওয়াত [যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিদের জন্য খাস] এবং ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ [যা তাঁর উম্মতের জন্য খাস]। নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু নবুওয়াতী সুন্নাতের অনুসরণ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুনোর একমাত্র রাস্তাই হচ্ছে সুন্নাতের অনুসরণ।

৮. নির্জনবাসের আকাঙ্ক্ষীর জন্য পূর্বশর্ত: তিনি বলেন, যে কেউ খিলওয়াত [নির্জনবাস] করার আকাঙ্ক্ষী তাকে অবশ্যই আল্লাহর ধ্যান ছাড়া বাকি বসকিছু বিজর্সন করতে হবে। তার অন্তর থেকে গ্বাইরুল্লাহর সবকিছু মুছে ফেলতে হবে। তার আত্মা থেকে সব ধরনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা মুছে দিতে হবে। এরূপ অবস্থায় উপনিত হওয়ার যোগ্যতা বা সাহসিকতা যার মধ্যে নেই, তার জন্য খিলওয়াত করা হবে ক্ষতিকর।

৯. ‘খাসান-ই-খোদা’র স্তরে আরোহণের শর্তাবলী: তিনি বলেন, “নফসের তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা জাররা পরিমাণ কারো অন্তরে থাকাবস্থায় এবং জাররা পরিমাণ দুনিয়াবী খাহিশাত লাভের লোভ হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকলে, কেউ কখনো ‘খাসান-ই-খোদা’ [আল্লাহর উচ্চ পর্যায়ের বিলায়েত] এর স্তরে উপনিত হতে পারবে না।”

১০. পাপের স্বীকারোক্তির সুফল: হযরত উসমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “পাপীরা যখন নিজের পাপকর্ম প্রভুর দরবারে তাওবার সময় স্বীকার করে নেয়, তখন তাদের মর্যাদা ওসব নেককারদের চেয়েও উত্তম হয়ে যায়, যারা নেক আমলের দাবি করে।”

১১. ধনীদের নিকট থেকে খাদ্যগ্রহণ প্রসঙ্গ: তিনি বলেছেন, “যে কেউ নফসের লোভ ও ইচ্ছা হেতু ধনীদের নিকট থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, সে [সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমিয়ে] সফল হবে না। তবে অপারগ হলে সেটা ভিন্ন কথা।”

১২. সৃষ্টির প্রতি অগ্রসর নিষিদ্ধ: “যে কেউ সৃষ্টির প্রতি অগ্রসর হবে, সে প্রভুর প্রতি অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতা হারাবে।”

১৩. কে অন্ধ হবে: “যে কেউ গরীব-দরবেশদের সঙ্গ ত্যাগ করে ধনীদের প্রতি ভালোবাসা হেতু, আল্লাহ তা’আলা তার অন্তরচক্ষুর ওপর পর্দা ফেলবেন। সে অন্ধ হয়ে যাবে।”

১৪. ফলনহীন বৃক্ষ উপড়ে ফেলা: তিনি বলেন, “আত্মশুদ্ধির সাধনা হচ্ছে ফলনহীন বৃক্ষ উপড়ে ফেলার মতো। তবে একে উপড়ে ফেলার উত্তম সময় হলো তার গজে উঠার পরই। যদি দেরি করা হয় তাহলে বৃক্ষটি তার মূলকে শক্ত করতে থাকবে এবং উপড়ে ফেলা কঠিন থেকে কঠিন হবে- কারণ একই সময় সালিকের মধ্যে বয়স বাড়া হেতু দুর্বলতাও বাড়বে।”

১৫. মা’রিফাতুল্লাহ কী: তিনি বলেন, “স্রষ্টা ও সৃষ্টির হাক্বিক্বাত জানার নামই হচ্ছে মা’রিফাতুল্লাহ।”

১৬. মানুষের প্রতি উপদেশ: তিনি মানুষকে উপদেশ দিতেন, “তোমরা তখনই উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হবে, ১. যখন যাকিছু নিজে পছন্দ করো তা অপরের জন্য পছন্দ করবে। ২. তোমরা দান কবরে কিন্তু কোনো বিনিময় কামনা করবে না। ৩. অপরকে জুলুম করা থেকে বিরত থাকবে যদিও সে তোমাদের উপর জুলুম করে।”

১৭. ভালো-মন্দ উভয়টি জানতে হবে: তিনি বলেন, "সবকিছু অধ্যয়ন করতে হবে তার বৈপরিত্যসহ। অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ের ওপর পূর্ণ জ্ঞানার্জন তখনই হয় যখন এর ভালো ও মন্দ উভয় দিক সম্পর্কে জানা হবে। যেমন ইখলাসের গুরুত্ব ও এর হাক্বিক্বাত উন্মোচন হবে যখন কেউ জানতে পারবে মুনাফিকীর অসারতা ও পথভ্রষ্টতা কোন্ জিনিস।"

১৮. খোদাপ্রেম: "সুখ ও আয়েশের সময় মৃত্যুকে স্মরণ করা হচ্ছে খোদাপ্রেমের লক্ষণ।"

১৯. আরিফীনের দৃষ্টি: "আরিফীন [আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানবান] আল্লাহর নূর ও মা'রিফাত দ্বারা আল্লাহর বিস্ময়কে অবলোকন করেন।"

২০. কে কতো দিন উপবাসে কাটাতে সক্ষম: "বান্দা-রাব্বানী [ওলিআল্লাহ] চল্লিশ দিন পর্যন্ত উপবাসে কাটাতে পারেন। বান্দা-সামদানী [পরহেজগার ওলিআল্লাহ ব্যক্তি] উপবাসে কাটাতে সক্ষম ৮০ দিন পর্যন্ত।"

২১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসার প্রতিদান: তিনি বলেন, "যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর বন্ধুজনদের ভালোবাসে, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা ওলিদের মর্যাদায় ভূষিত করবেন।"

মৃত্যুকালীন অবস্থা

হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তাঁর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনা হলো। তিনি বললেন, এ মুহূর্তে আমার জন্য চিকিৎসক হচ্ছেন ইউসুফ আলাহিসসালামের ভাইদের মতো! তাঁরা যেভাবে নিজের ভাইকে কূপে ফেলে দিয়েছিল, ঠিক তদ্রূপ চিকিৎসক ঔষধ সেবন করিয়ে আমার ক্ষতি করতে চাচ্ছেন। তবে যেভাবে নবী ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছিলেন, সেভাবে আমাকেও রক্ষ করবেন। এখন চিকিৎসকের ঔষধ আমার শরীরে কোনো ক্রিয়া করবে না। সব অকেজো। আমি মাওলার দরবারে যাত্রামুহূর্তে ঔষধের ওপর ভরসা করার মতো প্রতারণায় পড়বো না![৪০]

[৪০] https://aalequtub.com/hazrat-abu-usman-al-maghribi-r-a/

ইবনে ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আবু উসমান মাগরিবী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুকালে তাঁর পাশে ছিলাম। চতুর্দিকে লোকজন কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলো। এতে তাঁর চেহারা কিছুটা মলিন হয়ে পড়লো। আমাদেরকে নীবর থাকার নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন, 'তিনি কেনো আমার কাছে এ কথাটি বলেন না?' আমি একজনকে বললাম, তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কী শুনতে পাচ্ছেন? আমি নিজে তাঁকে এ অবস্থায় প্রশ্ন করতে পারছিলাম না। আমার লজ্জাবোধ হচ্ছিলো। সুতরাং লোকটি প্রশ্ন করার পর তিনি জবাব দিলেন, "আমি যেখান থেকে যা শুনার শুনতে পাচ্ছি!"[৪১]

হযরত শায়খ খাজা আবু উসমান মাগরিবী রাহিমাহুল্লাহ ৩৭৩ হিজরি সনে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি দীর্ঘ হায়াতে তায়্যিবার অধিকারী হয়েছিলেন। এ ধরার কোলে ১৩০ বছর জীবিত থেকে অসংখ্য মানুষকে হাক্বিক্বাতের রাস্তা দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার মাক্বামাতকে আরো উন্নত করুন। তিনি নিশাপুরেই সমাহিত আছেন।

সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকা অনুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত আবু উসমান মাগিরিবী রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা হযরত শায়খ আবু বকর নাসসাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইনশাআল্লাহ! আমরা এখন এ মহাত্মন ওলির জীবন ও সাধনার ওপর যেটুকু সম্ভব বর্ণনা তুলে ধরবো। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ।

[৪১] 'রিসালাতুল কুশাইরী [বঙ্গানুবাদ]', খ. ১, পৃ. ১৯২।

হযরত শায়খ আবু বকর তুসী নাসসাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৪৭৮ হিজরি, সমাধি- তুস, ইরান।)

তিনি ছিলেন শরীয়ত ও মা'রিফাতের নূর। তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো শায়খ আবু বকর বিন আবদুল্লাহ তুসী নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহ। আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ পর্যায়ের ওলি ছিলেন এই মহাত্মন সুফি দরবেশ। তিনি খিলাফত লাভ করেন হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে। এছাড়া তিনি সুহবত লাভে ধন্য হন হযরত শায়খ আবুল ক্বাসিম গুরাকানী রাহিমাহুল্লাহর। তাঁর কাছ থেকেও তরিকতের খিরক্বা লাভ করেন। এছাড়া তিনিই ছিলেন মহাত্মন শায়খ আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর মুর্শিদ। সমকালীন অনেক মাশাইখে আজমের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁর সাথী বা পীরভাই ছিলেন হযরত শায়খ আবু বকর দিনাওয়ারী রাহিমাহুল্লাহ।

হযরত তুসী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বেশি কিছু বর্ণনা খুঁজে পাই নি। যাকিছু পেয়েছি সেটুকুর ওপর ভিত্তি করে কিছু তথ্য পাঠকদের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বলা হয়ে থাকে, সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমানোর প্রাথমিক দিনগুলোতে হযরত তুসী রাহিমাহুল্লাহ অনেক সংগ্রাম করেছিলেন। কারণ তিনি বেশ কিছু সফলতা পান নি। অনেক চেষ্টা-সাধনার পরও যখন আত্মিকভাবে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ভাবলেন, তখন ভীষণ হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মনে করলেন, তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণের সৌভাগ্য বুঝি তাঁর কপালে নেই। দুঃখ-বেদনা থেকে একদিন তিনি একেবারে কাতর হয়ে গেলেন। কাঁদতে লাগলেন অঝোর ধারায়। নিজেকে আর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাখতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

তিনি নিদ্রিত, বেঁহুশ না মৃত বুঝা যাচ্ছিলো না, যখন তাঁর কানে ভেসে আসলো এক গায়েবি আওয়াজ: "হে নাসসাজ! তুমি হচ্ছো সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এক গোলাম। ওঠো! নিজেকে তৈরি করো কঠোর ধ্যান-সাধনায় নিমজ্জিত হতে।" এ আওয়াজ শুনে তিনি জেগে ওঠলেন। নিজেই বললেন, হে আল্লাহ! আপনার নির্দেশ শিরোধার্য! সুলুকের রাস্তায় আর কোনোদিন হতাশগ্রস্ত হবো না। তুমি আমাকে সাহায্য করো।

এরপর থেকে আর কখনো তিনি নিরাশ হন নি। চলতে থাকেন স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক আত্মশুদ্ধির কঠোর সাধনার রাস্তায়।

মহাত্মন শায়খ আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "আমার শায়খ আবু বকর রাহিমাহুল্লাহ দুআর সময় বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে সৃষ্টির মূলে রহস্য কী ছিলো?' তিনি এর জবাব শ্রবণ করতেন, 'তোমাকে সৃষ্টির পেছনে কারণটি ছিলো এই: তুমি আমাকে তোমার আত্মার আয়নায় অবলোকন করবে। আমি তোমার হৃদয়ে আমার প্রেমকে প্রবেশ করে দেবো।'"

মহামূল্যবান বাণী

১. তিনি বলেন: "পানির কল্পনা দ্বারা তৃষ্ণা মিটে না, আগুনের ধ্যান দ্বারা উষ্ণতা পওয়া যায় না এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দাবি দ্বারা হাক্বিক্বাত লাভ হয় না।"

২. তিনি আরো বলেন: "যতক্ষণ না কাল্পনিক অস্তিত্বের ঊর্ণা দগ্ধ হবে এবং হৃদয়নেত্র উদ্দীপণার সূচ দ্বারা সেলাই করে শুধুমাত্র তাঁর [আল্লাহর] দর্শন লাভের প্রতি স্থির না রাখা হবে অস্তিত্বের নির্জনতার কক্ষে, ততক্ষণ প্রেমাস্পদের প্রকাশ-মোমবাতি প্রজ্জলিত হবে না। কারণ, কেউ কী কোনোদিন বপন করেছে বীচি যে জমিনে বপন করা হয়ে গেছে? কেউ কী কোনোদিন ঐ কাগজে লিখেছে যেখানে লিখা হয়ে গেছে?"

৩. তিনি বলেন: "'হাক্বিক্বাত' হচ্ছে- তুমি দেখবে হারাম ও হালাল স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।"

মত্যুকালীন অবস্থা

হযরত শায়খ আবু বকর তুসী নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহ ৪৭৮ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিচের [বাঙ্গানূদিত] শ্লোকটি তাঁরই ইন্তিকালের সময় রচিত হয়েছিল।

যখন আবু বকর নাসসাজ চলে গেলেন এ নশ্বর ধরা থেকে
এবং লাভ করলেন নৈকট্য তাঁর প্রেমাস্পদের,
যদি তুমি চাও জানতে তাঁর মৃত্যু সন
শুধু বলো, 'পৃথিবীর কুতুব হচ্ছেন প্রেমাস্পদ আবু বকর!'

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর এ প্রিয় বান্দার মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করুন, তাঁর রহস্যাবলী সংরক্ষণ করুন।

আগেই বলেছি, হযরত শায়খ আবু বকর তুসী নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা ছিলেন হযরত শায়খ আহমদ গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা এখন তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর আলোচনার ইচ্ছে রাখি। হে আল্লাহ! আমাদের নিয়তে বিশুদ্ধতা আনয়ন করুন এবং অনুগ্রহ করে তাওফিক দিন যাতে একমাত্র আপনারই সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা পরিপূর্ণ করতে পারি।

হযরত শায়খ আহমদ গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৫২০ হিজিরি, সমাধি- ক্বাজউইন, ইরান।)

তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুফি-দার্শনিক ও লেখক ইমাম আবু হামিদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর ছোট ভাই সুফি ও লেখক হযরত মাজদুদ্দিন আবুল ফুতুহ আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ। ইলমে তাসাওউফের ওপর ফার্সি ভাষায় তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'সওয়ানিহ'। তিনি এতে ইশকে ইলাহী বা আল্লাহপ্রেমের স্বরূপ, তত্ত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এখনো প্রাপ্য আছে।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত আহমদ গাজালী রাহিমাহুল্লাহ ইরানের খুরাশান প্রদেশের অন্তর্গত তুস নামক শহরের নিকটস্থ একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সঠিক জন্মসন জানা যায় নি। তবে অধিকাংশের মতে তিনি স্বীয় বিখ্যাত ভাই ইমাম গাযালী [১০৫৮-১১১১ ঈ.] রাহিমাহুল্লাহর জন্মের তিন কিংবা চার বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।

তুস শহরেই তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্জন করেন। এরপর খুরাসানে যেয়ে ফিকাহ শাস্ত্রের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন শেষে তাসাওউফ শাস্ত্রের প্রতি আকর্ষিত হন। বেশ যুবক থাকাকালেই হযরত আবু বকর নাসসাজ তুসী রাহিমাহুল্লাহর নিকট মুরিদ হন। পীরের কাছ থেকে খিলাফত লাভের পর যুগের আরেক শীর্ষস্থানীয় শায়খ হযরত আবু আলী ফারমাদী (মৃ. ১০৮৪ ঈ.) রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গ লাভে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন।

নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

তাঁর যুগে বাগদাদে সুপ্রতিষ্ঠিত নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এবং বহির্বিশ্বেও উচ্চতর বিদ্যাপীঠ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। আব্বাসী খিলাফতকালে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সব স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এসে জড়োত হতেন এই নিযামিয়ায় পড়ালেখার জন্য। নিযামিয়ার অসংখ্য যুগশ্রেষ্ঠ উস্তাদের মধ্যে ইমাম আবু হামিদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। তিনি ফেকাহ ও দর্শনের উপর দারসদান করেন। একদা সুফিতত্ত্বের ওপর গভীর

অনুসন্ধান ও রিয়াজত-মুজাহাদার উদ্দেশ্যে তিনি নিযামিয়ায় শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। স্বীয় ভাই আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "তুমি নিযামিয়ায় চলে যাও। ফিকাহ ও সুফিতত্ত্বের ওপর সেখানে দারসদান করবে।" সুতরাং ইমাম সাহেবের নির্দেশে তিনি বাগদাদে যেয়ে নিযামিয়ায় শিক্ষকতা শুরু করেন।

ইশকে ইলাহীর প্রাবল্য

প্রভুপ্রেম বা ইশকে ইলাহীর আকর্ষণ সুফি আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠেছিল অল্প বয়স থেকেই। পরিণত বয়সে এসে এ প্রভাবের বিকাশ ঘটে এবং তিনি এ ব্যাপারে কলম ধরেন। রচনা করেন ফার্সি ভাষায় এক অনবদ্য কিতাব 'সাওয়ানিহ'। ইশকে ইলাহীর গুরুত্ব মাহাত্ম্য, প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা ইতোপূর্বে কেউ করেন নি, যেভাবে আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ সাওয়ানিহ কিতাবে করেছেন। এ কিতাবটির প্রভাব পরের যুগের বিখ্যাত ফার্সি সুফি সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফরিদুদ্দীন আত্তার, জালালুদ্দিন রুমী, মুসলেহ উদ্দীন সাদী, ফখরুদ্দিন ইরাকী, খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ ফার্সি ভাষার সাহিত্যিকরা হযরত আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ রচিত সাওয়ানিহ কিতাব থেকে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁদের সবার কবিতা ও অন্যান্য সুফি সাহিত্যে ইশকে ইলাহীর প্রাবল্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অনেকের মতে হযরত আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পূর্বযুগের সুফি সাহিত্যিক হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহ থেকে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, সুলুকের মূল জিনিসই হচ্ছে প্রভুপ্রেম। যতক্ষণ পর্যন্ত সালিকের মধ্যে প্রভুপ্রেমের ছোঁয়া লাগবে না ততক্ষণ সে সফল হবে না।

ভ্রমণ

হযরত আহমদ গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সে যুগের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ শহরে ভ্রমণ করেন। তাঁর এসব ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো মূলত দুটি: সুফি-দরবেশদের সুহবাত লাভ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বয়ান পেশ। যেসব শহরে তিনি ভ্রমণ করেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কটি হলো: নিশাপুর [উত্তর-পূর্ব ইরান], মারাগেহ [পূর্ব আজারবাইজান], হামাদান [ইরান] ও ইসফাহান [ইরান]।

খুলাফা

হযরত আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর বেশ কয়েকজন তরিকতের খলিফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুজন হচ্ছেন, হযরত আইনুল ক্বাদ্বাত হামাদানী [১০৯৮-১১৩১ ঈ.] রাহিমাহুল্লাহ[৪২] এবং হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ।[৪৩]

প্রেমের মণিহার

হযরত আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর 'সাওয়ানিহ'[৪৪] কিতাবটি চয়ন করে নিচে তালিকাভুক্ত কয়েকটি মূল্যবান বাণী পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। এ সবগুলোই ইশকে ইলাহীর স্বরূপ উন্মোচণী মণিমুক্তা।

১. তুমি যদি এ ভ্রমে পতিত হও যে, প্রেমিক হতে পারে মালিক ও প্রেমাস্পদ এর দখলদার- তাহলে জেনো নিশ্চিত, এটি এক বিরাট ভ্রান্তি। কারণ খাঁটি প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের গলে পরিয়ে দেয় মর্যাদার গলবন্ধনী এবং তুলে নেয় স্বীয় গোলামিত্বের কানের দোল। কারণ প্রেমাস্পদ কখনো দখলদার হতে পারে না।

২. যদিও প্রত্যেক মানব-চিকিৎসক তোমাকে [মজনু প্রেমিককে] দিতে পারে রোগ-নিরামক [ঔষধ], তুমি আরোগ্য লাভ করবে না, যদি না শ্রবণ করো লায়লার মিষ্টি কণ্ঠ!

---

[৪২] পারস্যের এ জ্ঞানতাপস ছিলেন একাধারে ফকীহ, সুফি, দার্শনিক, কবি ও গাণিতিক। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। সেলজুক বাদশাহ কর্তৃক মুত্যুদণ্ডাদেশ জারি হওয়ার পরই তিনি একটি চতুষ্পদী পদ্য ফার্সি ভাষায় লিখেন। এটির বঙ্গানুবাদ হচ্ছে এই: আমি কামনা করি মৃত্যু ও শহিদী দরোজা প্রভু থেকে / আমি তা চাই তিনটি অল্পমূল্যের জিনিসের মধ্যে / যদি আমার বন্ধু [আল্লাহ] আমার কামনাকে পূর্ণ করেন/ আমি চাই অগ্নি, জ্বালানি তৈল ও খড়কুটা। উল্লেখ্য, তাঁর এ তিনটি জিনিসের কামনা পূর্ণ হয়েছিল: তাঁকে হত্যা করা হয় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে।

[৪৩] তিনি ও তাঁর সুযোগ্য ভাতিজা শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করেন সুহরাওয়ার্দি সুফি তরিকা। এ তরিকার তিনটি উপশাখা আছে: ১. কুবরাবিয়া / ফিরদাওসিয়া, ২. মাওলাবিয়া এবং ৩. নিয়ামতুল্লাহী। ঈসায়ী ১৩ শতকের সুফি হযরত নাযমুদ্দিন কুবরা খোয়ারিযমী [১১৪৫-১২২১ ঈ.; সমাধি- উরগেঞ্চ, উজবেকিস্তান] রাহিমাহুল্লাহ এ উপশাখার প্রতিষ্ঠাতা। ঈসায়ী ১৩ শতকের বিখ্যাত সুফি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী বলখী [১২০৭-১২৭৩ ঈ.; সমাধি- কোনিয়া, তুরস্ক] রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন মাওলাবিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তুর্কিস্তানের কোনিয়া শহরে এ তরিকার আবির্ভাব ঘটে। নিয়ামতুল্লাহী সুফি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ঈসায়ী ১৪-১৫ শতকের ফার্সি ভাষার সুফি কবি হযরত শাহ নূরুদ্দিন নিয়ামতুল্লাহ ওলী রাহিমাহুল্লাহ [১৩৩০-১৪২৯ ঈ.; সমাধি- মাহান, ইরান]।

[৪৪] কিতাবটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। বইটি অনুবাদ করেন নাসরুল্লাহ পুরজাওয়াদী। প্রকাশক: কেপিআই লিমিটেড, ১৯৮৬, লেস্টার স্কোয়ার, লন্ডন, ইংল্যান্ড।

৩. রূহ যখন অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এলো সৃষ্টির সীমানায়, প্রেম ছিলো তখন অপেক্ষায় এ তেজি অশ্বে আরোহণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমি জানি না, সৃষ্টির শুরুতে কোন ধরনের মিশ্রণ ঘটেছিলো- যদি রূহ হয়ে থাকে নির্যাস, তবে তার গুণাবলী হচ্ছে প্রেম। শূন্য কোঠা পেয়ে সে [রূহ] সেখানেই বাসস্থান গড়লো।

৪. হযরত মনসুর হাল্লাজ নিচের এ চতুষ্পদী লিখেছিলেন:

আমি হচ্ছি আমার প্রেমাস্পদ এবং আমার প্রেমাস্পদ হচ্ছে আমি,
একই দেহে আমরা দুটি রূহ বাস করি।
যখন তুমি আমাকে দেখো, তুমি তাকেও দেখো।
আর যখন তুমি তাকে দেখো তখন আমাকেও দেখো।

মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর উক্ত কবিতার সমালোচনা করে হযরত আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কবি রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। দ্বিতীয় লাইনে তিনি বলে ফেলেছেন '*একই দেহে আমরা দুটি রূহ বাস করি*'। তিনি তাওহিদ থেকে দ্বিত্ববাদে পদার্পণ করেছেন। প্রথম লাইনটি সত্যের কাছাকাছি- কারণ তিনি বলেছেন, '*আমি হাচ্ছি আমার প্রেমাস্পদ এবং আমার প্রেমাস্পদ হচ্ছে আমি*'।

এককত্বের হাক্বিক্বাত অপর একজন কবির ভাষায় ফুটে ওঠেছে যখন তিনি বলেন:

আমি বলি: হে মূর্তি! আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার প্রেমাস্পদ।
এখন, আমি যখন তাকিয়ে থাকি, আমি দেখতে পাই তুমি আমারই নফস ছাড়া আর কিছু নয়।

এরপর কবি তাঁর এ কবিতা পূর্ণ করতে যেয়ে বলেন:

তুমি যদি আমা থেকে ফিরে যাও আমি হারাবো আমার ঈমান,
হে রূহ ও জগৎ! তোমরা আমার ঈমান ও অবিশ্বাস![৪৫]

তবে তাঁকে বলা উচিৎ ছিলো: "***তুমি যদি আমা থেকে ফিরে যাও, আমি আমার আত্মাকে হারাবো।***" কিন্তু এগুলো তো কবির উক্তি। তিনি তো ছন্দ ও শাব্দিক মিল

[৪৫] এ কবিতাটি রচনা করেন মিশরের আরব কবি উমর ইবনে আলী ইবনে ফারিদ রাহিমাহুল্লাহ [১১৮১-১২৩৪ ঈ.]। মূল কবিতাটির মধ্যে শায়খ আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতিতে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান [মাশারিকুদ দিরারী, পৃ. ১২৩]। ইবনে ফারিদের 'তা'ইয়্যাহ' নামক কিতাবে উক্ত কবিতিটি আছে।

ছাড়া লিখতে পারেন না। প্রেমিকদের বাস্তব বন্দিত্ব দশা এক ব্যাপার, আর কবিদের কর্তৃক এর ব্যাখ্যা আরেক জিনিস। কবিরা ছন্দ ও শাব্দিক মিলের উর্ধ্বে ওঠতে অপারগ।”

৫. তিনি লিখেছেন: প্রেমে আছে এক অগ্রগামিতা ও আরেক পশ্চাদপসরণ; আছে এক বৃদ্ধি ও আরেক হ্রাস এবং একটি উৎকৃষ্টরূপ। এরই মধ্যে প্রেমিকের আছে বিভিন্ন আহওয়াল [অবস্থাসমূহ]। শুরুতে সে তা অস্বীকার করতে পারে এবং তারপর গ্রহণও করে নিতে পারে। পরবর্তীতে সে হতে পারে বিরক্ত- এরপর আবার হতে পারে এতে সম্মত। হালের অনুরূপ পরিবর্তন ঘটতে পারে বার বার। এটা অবশ্য নির্ভর করে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, এক সময় থেকে অপর সময়ে: কোনো সময় প্রেম বৃদ্ধি পায় এবং প্রেমিক তা অস্বীকার করে। কোনো সময় প্রেম হ্রাস পায় এবং প্রেমিক এ হ্রাসকরণকে অস্বীকার করে। [এরূপ স্বীকৃতি ও অস্বিকৃতির ইতি ঘটাতে] প্রেমকে প্রেমিকের আত্ম-রক্ষণশীল দূর্গের তোরণ উন্মুক্ত করতে হবে- যাতেকরে সে হয়ে যায় আনুগত্যশীল ও নিজেকে করতে পারে আত্মসমর্পিত।

আমি আমার অন্তরকে বললাম: “তোমার গোপন কথা বন্ধুকে বলবে না;
সতর্ক হও, প্রেমের কেচ্ছা আর তুমি বলো না।”
অন্তর জবাব দেয়: “এরূপ কথা আর কখনও বলো না,
আত্মসমর্পিত করো নিজেকে যন্ত্রণার মাঝে- এবং বেশি কথা আর বলো না।”

৬. মানুষ তার প্রভুর তরফ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছে সৃষ্টির শুরুতেই- তাহলো তাঁর [আল্লাহর] প্রেমিক না হওয়ার পূর্বেই তিনি তাকে নিজের প্রেমাস্পদ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এটা কী কম অনুগ্রহ? এ মায়াবী ধরায় আগমনের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন: “তিনি তাদের ভালোবাসেন।”[৪৬] দিয়েছেন অফুরন্ত রিজিক এ নিঃস্ব ফকিরকে, যা সে অনন্তকাল ভক্ষণ করেও শেষ করতে অপারগ। এরপরও রিজিক শেষ হয় না। “কোনো আত্মাই জানে না, তার জন্য কী মহানন্দ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।”[৪৭] হে যুবক! পূর্ব-পার্থিবতা এখানে [পার্থিব জগতে] আগমন করেছে। কিন্তু জেনে রাখো, উত্তর-পার্থিবতার ইতি নেই। সুতরাং, প্রভুপ্রদত্ব রিজিক কখনো ফুরিয়ে যাবে না। তুমি যদি তোমার ‘সময়’

---

[৪৬] يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ - তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে [মাইদাহ : ৫৪ অংশ]।
[৪৭] فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - “কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কী কী নয়ন- প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।” [সাজদাহ : ১৭]

এর রহস্যের খবর জেনে নাও, তাহলে ‘আজল’ [পূর্ব-পার্থিবতার] ও ‘আবাদ’ [উত্তর-পার্থিবতা] এর ‘দুটি ধনুক’[৪৮] যে যথাক্রমে তোমার ‘দিল’ ও তোমার ‘ওয়াক্ত’ তা তুমি অনুধাবন করবে।

৭. তিনি লিখেন:

এটা (অর্থাৎ ইশক) তার নিজের পাখি এবং নিজের নীড়; তার নিজের নির্যাস ও নিজের গুণ; তার নিজের পালক ও নিজের ডানা। এটা বাতাস ও উড়াল উভয়টি; শিকারী ও শিকার; উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানী; অন্বেষক ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু। এটা তার নিজের শুরু ও তার নিজের শেষ; তার নিজের বাদশাহ ও প্রজা; নিজের তরবারি ও কোষ। এটা বাগান ও বৃক্ষ উভয়টি- শাখা ও ফল; পাখি ও নীড়।

প্রেমের বিষাদ মাঝে, নিজেকেই আমরা সান্ত্বনা দেই।
নিজেদের কর্ম দ্বারাই বিভ্রান্ত ও হতভম্ব হই,
হৃতসর্বস্ব হই আমাদের নিজের সম্পদ দ্বারা,
আমরাই শিকারী, আমরাই শিকার।

৮. তিনি বলেন: কিরিশমা-ই হুসন্ [চমৎকারিত্বের পলক] এক জিনিস এবং কিরিশমা-ই মাশুকী [প্রেমাস্পদীয় পলক] আরেক জিনিস। কিরিশমা-ই হুসনের কোনো ‘মুখশ্রী’ নেই। সেটা একক। কিন্তু কিরিশমা-ই মাশুকীর ক্ষেত্রে প্রমোস্পদের প্রয়োজন একজন প্রেমিকের। তাই ‘হুসন্’ এক জিনিস এবং ‘মাশুকী’ আরেক জিনিস।

৯. **একটি রূপক গল্প:** জনস্নানাগারের পানি গরম করার জন্য চুল্লিতে জ্বালানি সরবরাহের কাজে জড়িত ছিলো এক সাধারণ ব্যক্তি। সে এক বাদশাহর প্রেমে পড়ে গেলো।[৪৯] বাদশাহ এ ব্যাপারে কিছুই অবগত ছিলেন না। তবে তাঁর উজির ব্যাপারটি অবগত হয়ে বাদশাহকে জানালেন। বাদশাহ খুব রাগান্বিত হলেন। বললেন, “এতোবড়ো স্পর্ধা! তাকে কাঠিন শাস্তি দেবো!” বুদ্ধিমান উজির বললেন, “মহামতি

---

[৪৮] فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى - “তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম।” -নাজম : ৯

[৪৯] জানা থাকা প্রয়োজন যে, চুল্লিতে জ্বালানি সরবরাহকারীরা সে যুগে খুব নিম্নশ্রেণীর মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতো। রূপক এ গল্পে এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে প্রেমিক [আশিক] সর্বদাই ফকির [নিম্নশ্রেণির] হয়ে থাকেন আর প্রেমাস্পদ [মাশুক] থাকেন রাজকীয় ও উচ্চবংশের। -গ্রন্থকার

বাদশাহ নামদার! গুস্তাকী মাফ করুন। আপনি তো সুবিচারের জন্য প্রসিদ্ধ। এরূপ কাউকে শাস্তি দেওয়াতে আপনার কোনো লাভ হবে না। সে তো অসহায়! এমন এক ব্যাপার তাকে আড়ষ্ট করছে যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।" কিন্তু বাদশাহর হুকুম তো হুকুমই। লোকটিকে জেলে নিক্ষেপ করা হলো।

ব্যাপার হলো এই, বাদশাহ প্রায়ই উক্ত জনস্নানাগারের পাশ দিয়ে ভ্রমণে যেতেন। ঐ গরীব লোকটি প্রত্যেকদিন রাস্তার পাশে এসে বাদশাহকে একনজর দেখার জন্য অপেক্ষা করতো। বাদশার আগমন ঘটলেই সে 'প্রেমাস্পদজণিত দৃষ্পিপাত করতো সৌন্দর্যের দৃষ্টিপাতের প্রতি'।[৫০] বাদশাও ব্যাপারটি অনুভব করতেন। এভাবে অনেকদিন চলে গেলো। একদা বাদশাহ যখন আসলেন, তিনি ঐ ব্যক্তিকে তার স্থানে এদিন অপেক্ষারত পেলেন না। বাদশাহ ঠিকই আগের মতো প্রেমাস্পদজণিত দৃষ্টিপাত করলেন সেই স্থানের দিকে। কিন্তু স্থানটি শূন্য থাকায় এ দৃষ্টিপাত হয়ে গেলো উলঙ্গ। কারণ এ দৃষ্পিপাত পতিত হওয়ার পাত্র থাকা জরুরি। বাদশাহর মধ্যে অস্বস্থির ভাব জেগে ওঠলো। জ্ঞানবান উজির ব্যাপারটি অনুধাবন করলেন। খুব বিনয়ের সঙ্গে বাদশাহর নিকট আরজ করলেন: "মাননীয় বাদশাহ নামদার! আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, এ অসহায় লোকটিকে শাস্তি দেওয়া হবে অর্থহীন, কারণ সে তো কোনো ক্ষতি করে নি। এখন [শাস্তি দেওয়ার কারণে] আমরা বুঝতে পারলাম, তার প্রয়োজন আমাদেরই ছিলো।"

১০. সবকিছুর 'গোপন মুখ' হচ্ছে তার [স্রষ্টার সঙ্গে] সংযোগস্থল। এছাড়া, সৃষ্টির মধ্যে [স্রষ্টার] নিদর্শন বিদ্যমান- আর তা হচ্ছে 'হুসন'। [যে কোনো কিছুর] গোপন মুখ হচ্ছে সেটি, যেটি তাঁর [স্রষ্টাকে] মুখোমুখি হয়। এখন, কেউ যদি [সৃষ্ট বস্তুসমূহের] গোপন মুখ দেখতে অপারগ হয় তাহলে সে না দর্শন করবে সৃষ্টির মধ্যকার নিদর্শন, না দেখবে এর মধ্যস্থ হুসন [সৌন্দর্য]। এ মুখ হচ্ছে আল্লাহর মুখশ্রীর জামাল [সৌন্দর্য] যা প্রতিবিম্ব হয় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। কুরআন শরীফে তাই ইরশাদ হয়েছে:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

-"একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা [মুখ] ছাড়া।" [আর-রাহমান : ২৭]

---

[৫০] অর্থাৎ বাদশাহ তো পরমসুন্দর ছিলেনই, এখন প্রেমিকের দৃষ্টিপাত হেতু তার শ্রী আরো বেড়ে যায়।

অপর মুখ [যেটি স্রষ্টার দিকে ফেরানো নয়], বাস্তবে কেনো মুখই নয়। তাই বলা হয়েছে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

-"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল।" [আর-রাহমান : ২৬]

সুতরাং, আপনি হয়তো জানতে ইচ্ছুক হবেন যে, অপর মুখ হচ্ছে কদাকার।

১১. প্রেমাস্পদের হুসনের চক্ষু বন্ধ স্বীয় জামালের মাঝে। একমাত্র প্রেমিকের প্রেম-আরশিপরে নিজের নিখুঁত সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পারেন। এটা এক বিরাট রহস্যের ব্যাপার।

তার প্রতি আমার প্রেমমত্ততা বৃদ্ধি কারণহীন নয়।
সেখানে ছিলো সূরা, নেশাগৃহ কিন্তু আমার জয়ের বিপরীত কেউ নয়।
বলো না- আমি তাকে অনুসন্ধান করছি।
কারণ, এটা ছিলো সে যে এর অনুসন্ধানী- আমি নয়।

কিতাব রচনা

একজন লেখক হিসেবে আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর সুনাম ছিলো সমকালীন যুগে। তবে তাঁর কিছু লেখা হারিয়ে গেছে। প্রথমত, তিনি স্বীয় বড়ভাই ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহর 'ইহইয়া উলূমুদ্দীন' এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। এটি এখন আর পাওয়া যায় না। 'তাফরিদ ফি কালিমাতিত্ তাওহীদ' নামক কিতাবের তুর্কি ভাষার অনুবাদ এখনো পাওয়া যায়। সামা' সম্পর্কে একটি আলোচনা-সমালোচনামূলক বইয়ের রচয়িতা তিনি ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বইটি অনুবাদ করেছেন জে. রবসন নামক এক ইংরেজ লেখক [লন্ডন, ১৯৩৮]। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'সাওয়ানিহ' গ্রন্থটি সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন ১৯৪২ সালে এইচ. রিটার নামক এক ইংরেজ লেখক।

হযরত আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

সুফিশাস্ত্রে 'প্রেম' এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যাদাতা হযরত আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ ইরানের ক্বাজউইন শহরে ৫২০ হি. / ১১২৬ ঈ. ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ মহাত্মন ওলির মাক্বামাতকে বুলন্দ করুন।

সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি সিলসিলা মুতাবিক পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ। আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করার প্রত্যাশী। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফিক প্রদান করুন অনুগ্রহ করে।

হযরত শায়খ জিয়াউদ্দিন আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু- ৫৬৩ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

‘দুই ইরাকের মুফতি’ নামে খ্যাত হযরত আবু নাজিব জিয়াউদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর। সুহরাওয়ার্দ হচ্ছে ইরানের ঝানঝান প্রদেশের একটি শহরের নাম।

হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি ছিলেন একাধারে সুফি শায়খ, শাফিঈ ফকীহ এবং বিশিষ্ট ওয়ায়েজ। যুগের একজন প্রভাবশীল ব্যক্তি ছিলেন হযরত সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর তাক্বওয়াহ, পরহেজগারী, ইবাদত ইত্যাদি ছিলো উচ্চ মানের।

জন্ম ও শিক্ষা

তিনি ইরানের ঝানঝান প্রদেশের অন্তর্গত সুহরাওয়ার্দ নামক স্থানে ৪৯০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বাগদাদে যেয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন পরিবারের সাথে। তিনি ইবনে নাবহান ও অন্যান্য উস্তাদদের নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেন। মাইহানী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়াকালে তাঁর শিক্ষক। পরবর্তীতে এই নিযামিয়ায় তিনি জিম্মাদার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু তাঁর পীর হযরত আহমদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশে নিযামিয়া থেকে অব্যাহতি নেন এবং বাগদাদের দজলা নদীর তীরে একটি রিবাত [খানক্বাহ] প্রতিষ্ঠা করে তাসাওউফের খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

অসংখ্য মানুষের পীর

হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দির সুনাম শীঘ্রই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষ বাগদাদের খানক্বায় এসে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তবে তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শাগরিদ ছিলেন নিজের ভাতিজা হযরত আবু হাফস শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দী রাহিমাহুল্লাহ। হযরত আবু নাজিব রাহিমাহুল্লাহকে সম্ভবত তাঁর নামের সঙ্গে ‘সুহরাওয়ার্দি’ শব্দটি যুক্ত থাকায় সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ মহান তরিকাকে শক্ত ভিতের ওপর স্থাপন করেন হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর হাতেই এ তরিকা একটি বিশ্বজনিন

রূপ ধারণ করেছিলো। ইনশাল্লাহ, আমরা অবশ্যই পরবর্তীতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর বিশদ আলোচনা করবো।

হযরত হাম্মাদ দাব্বাসের সঙ্গলাভ

তখনকার বাগদাদের এক উচ্চ দরোজার ওলিআল্লাহ ছিলেন হযরত আবুল খায়ের হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস রাহিমাহুল্লাহ। বাগদাদে অবস্থানকালে হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দী রাহিমাহুল্লাহ এই ওলির সুহবত লাভের আশায় তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। হযরত হাম্মাদ ছিলেন নিরক্ষর, অথচ তিনি গউসুল আজম আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ ছিলেন। যাক, হযরত হাম্মাদের সুহবতে থেকে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন। এ সময় আর্থিক দৈন্যদশা হেতু তাঁকে একাধারে কয়েক বছর যাবৎ পানি-বহনকারী হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল।

দামেস্কো শহরে ভ্রমণ

হিজরি ৫৫৭ সালে হযরত আবু নাজিব রাহিমাহুল্লাহ জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন। কিন্তু সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কো শহরে পৌঁছুয়ে জানতে পারলেন নূরুদ্দিন জঙ্গি [১১১৮-১১৭৪ ঈ.] ও বল্ডউইনের [১১৩০-১১৬৩ ঈ.] মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। হযরত আবু নাজিবের আগমনে দামেস্কোবাসী আনন্দিত হয়। তারা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর হযরত আবু নাজিব বাগদাদে ফিরে আসেন।

ছাত্র ও খলিফাবৃন্দ

হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় খানক্বায় একটি উচ্চমানের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই এখানে শিক্ষক হিসেবে বহুদিন কাটিয়েছেন। একইসময় তাসাওউফের ওপর গভীর চর্চাও চালিয়ে যান। অসংখ্য মুরিদান ছিলো তাঁর। হযরতের খলিফাদের সংখ্যা অনেক ছিলো। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ইবনে আসাকির এবং মুহাদ্দিস সামা'নী রাহিমাহুল্লাহ। হযরতের খলিফা আম্মার বিদলিসী রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৫৯০ হি.] সুফি ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করেন। তিনিই ছিলেন কুবরাবিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত নাজমুদ্দিন কুবরা রাহিমাহুল্লাহর [৫৪০-৬১৮ হি.] উস্তাদ।

হযরত আবু নাজিব রাহিমাহুল্লাহর সাধনার প্রভাব সর্বাধিক বেশি যার ওপর ক্রিয়া করেছিলো তিনি হচ্ছেন হযরত শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ। তিনিই ছিলেন, সুলুকের বিখ্যাত কিতাব ‘আওয়ারিফুল মা’আরিফ’ এর লেখক।

রচনা

হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ খুব বেশি লেখালেখি করেন নি। তিনি ‘গারিবুল মাসাবিহ’ নামক একটি হাদিসের শরাহ গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তাঁর আরেক প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম হলো ‘আদাবুল মুরিদীন’। তিনি এতে তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণকারী সালিকদের আদব-কায়দা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এ কিতাবটি সম্পর্কে অধিক জানাজানি হয় তাঁর ভাতিজা হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে। ‘আদাবুল মুরিদীন’ কিতাবে তাসাওউফকে বিশেষ কিছু আদাবের সমন্বিত রূপ হসিবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে তিনি ইমাম কুশাইরী, সুলামী এবং সাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৫১]

ইন্তিকাল

স্বীয় প্রতিষ্ঠিত খানক্বাহ ও মাদরাসায় দীর্ঘদিন সুফিতত্ত্বের ওপর সাধনা করে হযরত আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ এ মায়াবী পৃথিবীর কোল ছেড়ে আখিরাতের অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমান। তিনি ৫৬৩ হিজরি সনে বাগদাদের খানক্বায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি খানক্বার পাশেই সমাহিত আছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা তাঁর এ প্রিয় বান্দার মাক্বামাত বুলন্দ করুন। সংরক্ষণ করুন তাঁর গোপন রহস্যাবলী।

সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকানুযায়ী পরবর্তী শায়খ হচ্ছেন ইমামুত তরিকত হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা এবার তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর বিশদ আলোচনা করবো। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ।

---

[৫১] N Hanif, Biographical Encyclopedia of Sufis in Central Asia and Middle East.

ইমামুত তরিকত হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৬৩২ হিজরি, সমাধি- বাগদাদ, ইরাক।)

ইমামুত তারিকত, সুলতানুল সুহরাওয়ার্দ শিহাবুদ্দিন আবু হাফস বিন মুহাম্মদ সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। 'মুহাদ্দিসে বাগদাদী' হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। তবে হযরতের জন্ম হয় বর্তমান ইরানের জানযানের নিকটস্থ 'সুহরাওয়ার্দ' নামক একটি জনপদে। হিজরি ৫৩৯ [১১৪৫] সনের রজব মাসের শেষের সপ্তাহ থেকে শা'বানের প্রথম ক'দিনের মধ্যে তাঁর জন্ম হয় বলে অধিকাংশ ইতিহাসবিদের ধারণা।[৫২]

তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। 'মুনাক্কিবে গাউসিয়া' নামক কিতাবে আছে, প্রথমত তাঁর পিতামাতা নিঃসন্তান ছিলেন। অবশেষে কোনো একদিন হযরতের মাতা হযরত আবদুল কাদির জিলানী [মৃ. ৫৬১ / ১১৬৭] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানক্বায় যেয়ে উপস্থিত হলেন। একটি সুসন্তান লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে আবদার জানালেন শায়খের নিকট। দু'আ শেষে শায়খ জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব উত্তম একটি ছেলে-সন্তান লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। অন্য বর্ণনায় জানা যায়, তিনি এটাও বলেছিলেন, 'তোমার এ সন্তানের নাম রাখবে শিহাবুদ্দিন উমর'।

শিক্ষাজীবন ও তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণ

হযরত শিহাবুদ্দিনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিজের গৃহে। এরপর নিজের চাচা হযরত জিয়াউদ্দীন সুহরাওয়ার্দি [মৃ. ৫৬৩ / ১১৬৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো বালক বয়সেই তিনি শিক্ষার্থী হিসাবে বাগদাদে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ ইত্যাদি জাহিরী ইলমের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন করেন সে যুগের প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষাগুরুর নিকট। এরপর তাঁর সুযোগ্য চাচার

---

[৫২] নাফাহাতুল উনস, পৃ. ৭১৪, সূত্র: আক্বওয়ালে সালাফ, খ. ২, পৃ. ৩৯৪।

নিকট তরিকতের সবকও গ্রহণ করেন। তিনি শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতেও বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর নিকট থেকে হিজরি ৫৬০ / ১১৬২ ঈসায়ী সনে কাদিরীয়া তরিকতের খিলাফত লাভে ধন্য হন। 'ক্বালা'ইদুল জাওয়াহির' কিতাবে আছে হযরত জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই প্রিয় মুরীদকে বললেন: 'হে উমর! ইরাকের শেষ যুগের শায়খ হিসাবে তুমি সুপরিচিত হয়ে ওঠবে'। হযরতের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

উক্ত দু'জন প্রসিদ্ধ অলিআল্লাহ ছাড়াও শিহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমসাময়িক যুগের আরো অনেক মাশাইখে আজমের সুহবত লাভে ধন্য ও উপকৃত হন। ইরাকের আবাদান নামক স্থানে অবস্থান করে সেখানকার কয়েকজন 'আবদালের' নিকট থেকেও তরিকতের অনেক গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। ঐ সময় হযরত খিজির আলাইহিস্সালামের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন বলেও বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত শিহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ কয়েকবার পবিত্র হজ্জ পালন করেন। হজ্জ উপলক্ষে মক্কা মুকাররমায় সর্বশেষ ভ্রমণে যান হিজরি ৬২৮ / ১২৩১ সনে। এই সফরেই মক্কা শরীফে তিনি সাক্ষাৎ লাভ করেন মিশরের সুফি-দরবেশ হযরত শায়খ আবু হাফস উমর বিন আলী ওরফে ইবনুল ফারিদ [মৃ. ৬৩২ / ১২৩৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে। এ সময় ইবনুল ফারিদের সফরসঙ্গী দু'জন ছেলে-সন্তান শায়খ কামালুদ্দীন মাহমুদ ও শায়খ আবদুর রহমান, শিহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে উভয়ে হযরতের নিকট থেকে তরিকতের খিলাফত লাভে ধন্য হন।

হযরতের চাচা জিয়াউদ্দীন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি খানক্বাহ ছিলো। জিয়াউদ্দীন সাহেব হিজরি ৫৬৩ / ১১৬৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তখন এই খানক্বার দায়িত্ব নেন শিহাবুদ্দিন সাহেব। খানক্বায় একটি ধর্মীয় মুসাফিরখানা ছিলো। হযরত আরো তিনটি নতুন মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর নামকরণ করা হয়: 'রিবাতে নাসিরী', 'রিবাতে বিস্তামী' ও 'রিবাতে মামূনিয়া'। হযরতের মুরীদান এসব রিবাতে অবস্থান করতেন।

সাধারণ মুসলমানদের নিকট হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জনপ্রিয়তা অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে। সে যুগের মুসলিম বিশ্বে তাঁর সুনাম বিস্তার লাভ করে খুব দ্রুত। দলে দলে লোকজন তাঁর খানক্বায় উপস্থিত হয়ে বাইআত গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চতর মাক্বাম সম্পর্কে একটি বর্ণনা একজন সুফির প্রশ্ন ও এর জবাব থেকে পাওয়া যায়। হযরতের নিকট প্রেরিত ঐ চিঠিতে সুফি সাহেব প্রশ্ন করলেন: "শায়খ! আমি নফল ইবাদত ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিজেকে অলস হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। ইবাদত করলে আমার মনে গরিমার সৃষ্টি হয়। আমি এখন কোনটি করবো?" হযরত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব লিখলেন: "ইবাদত করতে থাকো এই বলে, হে আল্লাহ আমাকে গৌরববোধ থেকে মুক্ত ও মাফ করে দাও।"

শাইখুশ শুয়ূখ উপাধিতে ভূষিত

হযরত শিহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনের অধিকাংশ সময় বাগদাদে কাটিয়েছেন। তখনকার খলিফা নাসির [১১৫৮-১২২৫ ঈ.] তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একদা তাঁকে 'শাইখুশ শুয়ূখ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হযরতের নিকট মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে পত্রাদি লিখতো। প্রায়ই মুসলিম বিভিন্ন জনপদের শাসকদের মধ্যে শান্তিরক্ষার্থে তিনি একজন সফল দূত হিসাবে কাজ করতেন। সমকালীন ইতিহাসবিদ ইবনে খালিক্বান [হিজরি ৬০৮-৬৮১] তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "তাঁর শেষের জীবনে সমপর্যায়ের কেউই জীবিত ছিলেন না।" প্রত্যেকদিন নজরানা হিসাবে অনেক অর্থকড়ি আসতো ধনীদের নিকট থেকে। তিনি এগুলো গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। বিরাট অঙ্কের অর্থ-কড়ি প্রাপ্তির পরও তিনি খুব সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। এমনকি হযরতের ইন্তিকালের পর দেখা গেলো কাফন-দাফনের জন্য জরুরী টাকা-পয়সাও তিনি রেখে যান নি।

সমসাময়িক মাশাইখবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা

হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যান্য তরিকা ও এদের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সমসাময়িক যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেশ ক'টি প্রসিদ্ধ সুফি তরিকা, যেমন: হযরত আবু ইসহাক শামী [মৃ. ৩২৯

/৯৪১] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী [মৃ. হিজরি ৬৩৩ / ১২৩৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসারিত চিশতিয়া তরিকা, হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা [মৃ. ৬১৮ / ১২৬৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুবরাবিয়া / ফিরদাউসিয়া তরিকা, শায়খ জালালুদ্দীন রুমী [মৃ. ৬৬৪ / ১২৬৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাওলাবিয়া তরিকা ও শায়খ হযরত আবদুল কাদির জিলানী [মৃ. হিজরি ৫৬১ / ১১৬৭] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাদিরিয়া তরিকা। চিশতিয়া তরিকার বিখ্যাত শায়খ, হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী [মৃ. ৬৩৪ / ১২৩৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর [মৃ. ৬৬১ / ১২৬৩] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শিহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাগদাদের খানক্বায় ভ্রমণে যান ও বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

ইমাম ইয়াফিঈ [মৃ. ৬৭৮ / ১৩৬৭] লিখেছেন, একদা শায়খুল আকবর হযরত ইবনুল আরাবি [মৃ. ৬৩৮ / ১২৪০] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শিহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ পান। উভয়ে শুধুমাত্র একে অন্যের চোখ পানে কিছুক্ষণ তাকালেন, কেউ কিছু বললেন না। পরবর্তীতে কেউ একজন হযরত আরবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে শিহাবুদ্দিন সাহেব সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তিনি জবাব দিলেন, "তিনি ঐ ব্যক্তি যার মাথা থেকে পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত রাসূলের সুন্নাতে পরিপূর্ণ।" অপরদিকে শায়খ সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখন কেউ শায়খ আরবি সাহেব সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তিনি জবাব দিলেন, "তিনি হচ্ছেন মা'রিফাতের মহাসাগর।" 'রিসালা ইক্ববাদিয়া' নামক কিতাবে আছে, হযরত সাদ উদ্দীন হামুইয়া [মৃ. ৫৬০ / ১২৫২] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ প্রশ্ন করলেন, ইবনুল আরবি সাহেব সম্পর্কে মন্তব্য করুন। তিনি জবাব দিলেন, "তাঁকে একটি উত্তাল মহাসমুদ্রের সাথে তুলনা করা যায় যার বিস্তৃতি অসীম।" হযরত শিহাবুদ্দিন সাহেব সম্পর্কে অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে বললেন, "রাসূলের ইত্তিবার নূর দ্বারা তাঁর কপাল এমনভাবে আলোকিত আছে যার তুলনা নেই।"

তাঁর প্রেষণায় আকৃষ্ট হয়ে যুগের অসংখ্য মাশাইখ বাগদাদের খানক্বায় হাজির হয়েছেন সুহবত লাভ করতে। তাঁর খলিফারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ও ইলমে তাসাওউফের জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধির রাস্তার বিকাশ ঘটান। 'আখবারুল আখঈয়ার ফী আসরারুল আবরার' কিতাবে আছে, হযরত নিজেই বলেন, 'আমার

অনেক খলিফা ভারতবর্ষে অবস্থান করছেন।' ধারণা করা হয়, ২০ জনের মতো তাঁর সুযোগ্য খলিফার পদধূলিতে ভারতবর্ষের জমি ধন্য হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জন হলেন: মীরে দিল্লী শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ নূরুদ্দীন মুবারক গজনবী [মৃ. ৬৩২ / ১২৩৪], হযরত বাহাউদ্দীন আবু মুহাম্মদ জাকারিয়া মুলতানী [মৃ. ৬৬১ / ১২৬২], শায়খ কাজি হামিদুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আতাউল ফারুকী নাগৌরী [মৃ. ৬৪৩ / ১২৭৪], শায়খ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ তাবরিযী [মৃ. ৬৪২ / ১২৪৪], শায়খ নূহ বাখারি সিন্ধী, শায়খ সাইয়্যিদ আহমদ অরফে সুলতান সাখি সারওয়ার [মৃ. ৫৭৭ / ১১৮১], শায়খ জিয়াউদ্দীন রুমী [মৃ. ৭২১ / ১৩২৩], শায়খ মজদুদ্দীন মুহাম্মদ হাজি জাযেরমি [মৃ. ৬২৩ / ১২২৬], শামসুল আরিফীন শাহ তুর্কমান বাইয়াবানী দেহলবী [মৃ. ৬৩৭ / ১২৪০], শায়খ সাইয়্যিদ শিহাবুদ্দীন বিন মুহাম্মদ হুসাইনী অরফে 'জগৎজ্যোতি' [মৃ. ৬৬৬ / ১২৬৭-৬৮ - তিনি ছিলেন হযরত শরফউদ্দীন ইয়াহইয়া মানিয়ারী [মৃ. ৭৮২ / ১৩৮১] রাহ. এর দাদা], শায়খ সাইয়্যিদ মঈযুদ্দীন সান্দাইলিবী আবদাল, শায়খ সাইয়্যিদ ইলালুদ্দীন জাওয়ারী, শায়খ শরফুদ্দীন ইরাকী, শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহিম আনসারী, শায়খ আহমদ বিন জৈন মুলতানী, শায়খ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আব্বাসী হাসিমী প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম মহাত্মন।

তাঁর আরো কয়েকজন খলিফা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ইলমে তাসাওউফের খিদমাত করে গেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক'জন হলেন, শায়খ সাইয়্যিদ আহমদ কবির সুহরাওয়ার্দি (হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহর মামা), শায়খ মুসলেউদ্দীন সাদী সিরাজী [মৃ. ৬৯১ / ১২৯২], শায়খ নাযিবুদ্দীন আলী বিন বুযগুশ সিরাজী [মৃ. ৬৭৮ / ১২৭৯], শায়খ শামসুদ্দীন সাফি সিরাজী, শায়খ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ সুজাহ মাশাদী, শায়খ শাহ সরফুদ্দীন মাহমুদ বিন হুসাইন তুসতরী, শায়খ মুহাম্মদ ইয়ামনী, শায়খ আহমদ দামেস্কী, শায়খ নাজমুদ্দীন তাফলিসী [ইরাক], শায়খ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বাগদাদী, শায়খ রশীদুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবুল কাসিম মারক্কি সুফি বাগদাদী, শায়খ আহমদ ফারুকী কাবুলী, শায়খ ইযজউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ফারুকী প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম মাশাইখে আজম।

পুত্রসন্তান

এ পর্যন্ত জানা, হযরতের তিনজন পুত্রের নাম হলো শায়খ জৈনুদ্দীন, শায়খ ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ও শায়খ জামালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি হযরতের খলিফা ছিলেন। সর্বশেষ হজ্জের সফরে [৬২৮ / ১২৩১] তিনি তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

রচনা

হযরত শিহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। জার্মান প্রাচ্যবিদ ব্রকেলম্যান তাঁর 'গেসিসস্তি ডার আরাবিশেন লিটারেচার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত শিহাবুদ্দিন সাহেব মোট ২১টি গ্রন্থের প্রণেতা। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম হলো 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' [ঐশি জ্ঞানের প্রাচুর্য]। এটি যুগ যুগ ধরে সুফি সম্প্রদায় ও সাধারণ তাসাওউফপন্থীদের নিকট সমাদৃত ও বহুলপঠিত হয়ে আসছে। এটা সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার গাইডবইও বটে। মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে তিনি এটি রচনা করেন। তিনি বলেছেন, "যে মুহূর্তে আমি লিখতে যেয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই আল্লাহর দিকে নিজেকে রুজু করেছি ও বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সেরেছি।" গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচিত। তবে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শাইখুল মাশাইখ হযরত জালালুদ্দীন হুসাইন বিন আহমদ কবির [মৃ. ৭৮৫ / ১৩৮৪] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি- যিনি মাখদুমে জাহানগাশ্ত নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লিখেছেন: "যদি কারো কোনো মুর্শিদ না থাকেন এবং তিনি 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থটি পড়ে একে সতর্কতাসহ অনুসরণ করেন তাহলে তিনি উত্তম একজন সুফিতে পরিণত হবেন!"[৫৩]

আওয়ারিফুল মা'আরিফ থেকে মহামূলল্যবান বাণী

১. দৃঢ়তা অর্জন হচ্ছে লক্ষ্য: হযরত আবু আলী জুযজানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে সুফি! যে দৃঢ়তা অর্জনের সাধনা করে, তার মতো হও। যে কারামতের কামনা করে

---

[৫৩] তবে জানা থাকা আবশ্যক যে, এ যুগে মুর্শিদ ছাড়া সুফিতে পরিণত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আহমদ কবির রাহিমাহুল্লাহ গ্রন্থের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝাতে যেয়ে এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর যুগেও কেউ মুর্শিদ ছাড়া বড় মাপের সুফিতে পরিণত হয়েছেন বলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলে না। সুতরাং তাসাওউফের রাস্তায় চলতে হলে অবশ্যই একজন হক্কানী পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করতে হবে। -গ্রন্থকার

তার মতো হয়ো না। তোমার নফসের খাহেশ হচ্ছে কারামত প্রকাশ করতে। কিন্তু তোমার প্রভু চান দৃঢ়তা অর্জনে তুমি সচেষ্ট থাকবে।”[৫৪]

২. বিনয়ের বুনিয়াদ: বিনয় [তাওয়াজু’] এর বুনিয়াদ হচ্ছে, যখন তুমি সম্মানহানি ও ও গর্ব এ উভটির সম্মুখীন হবে তখন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ গর্ব হচ্ছে, যখন কেউ ভাবে, তার আসল মূল্য থেকে সে আরো দামী। অপরদিকে সম্মানহানি হচ্ছে, মানুষ এমন নীচ পর্যায়ে পৌঁছুয়ে যায় যে, নিজের অধিকার পর্যন্ত পদদলিত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে।[৫৫]

৩. সম্মান ও গর্বের মধ্যে পার্থক্য: সম্মানের সংজ্ঞা হচ্ছে এই: মানুষ নিজের পরিচয় লাভ করে এবং পরিচয় লাভ করে তার নফসের নির্যাসকে। সে নিজেকে সম্মানিত করে এমন এক পদ্ধতিতে যার দ্বারা সে অসম্মানিত ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয় না, যদিও সে হালাল পদ্ধতিতে দুনিয়াবী খাহিশাত ও উপকার লাভ করে।

গর্বের সংজ্ঞা হচ্ছে এই: মানুষ তার নফসের পরিচয় লাভ করে নি। সে ভাবে এর মূল্য আসল দাম থেকে বেশি।

একব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহকে বললো, ‘আপনার নফস এতো বিরাট!’ তিনি বললেন, ‘আমি আজিম [বিরাট] নই। তবে আমি অবশ্যই ‘আজিজ [সম্মানিত]’। একথা বলার কারণ হচ্ছে, সম্মান তো মূল্যহীন গুণ নয়। কিন্তু সম্মান ও গর্বের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্যও পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

-“তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করতে” [আহক্বাফ : ২০]

সুতরাং উভয়টির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য হচ্ছে, সম্মান হবে যৌক্তিকতাসহ এবং অহঙ্কার বা গর্ব হচ্ছে, অযৌক্তিক। আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদের জন্য ইজ্জত লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

[৫৪] আওয়ারিফুল মা’আরিফ, পৃ. ১৭৪, আক্বওয়ালে সালাফ [ইংরেজি অনুবাদ], খ. ৩, পৃ. ৩৯৯ থেকে উদ্ধৃত।
[৫৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩।

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

-"সম্মানের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ।" [মুনাফিকূন : ৮]

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান লাভের জন্য দু'আ করেছেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي، وَفَقِيرٌ فَارْزُقْنِي

-"হে আল্লাহ! আমি নীপিড়িত, সুতরাং আমাকে সম্মান দিন। আমি গরীব, সুতরাং আমাকে রিজিক দিন।" -[মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ]

৪. মুক্তি এবং ধ্বংসের কারণ: হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "মুক্তি লাভের উপায় তিনটি এবং ধ্বংসের কারণও তিনটি। মুক্তি লাভের তিনটি উপায় হচ্ছে: ১. গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা। ২. ন্যায়ের মানদণ্ডে অটল থাকা যদিও তুমি এর দ্বারা খুশি কিংবা রাগান্বিত অনুভব করো না কেনো। ৩. অভাবী কিংবা অভাবহীন অবস্থায় যাকিছু প্রাপ্ত হও তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। ধ্বংসের কারণ তিনটি হচ্ছে: ১. নিজের স্বাভাবিক কার্পণ্যতাকে অনুসরণ করা। ২. নিজের যাচ্ছে-তাই ইচ্ছার গোলামী করা। ৩. আত্মগরিমা করা।

খুশি এবং রাগ উভয় সময়ে ন্যায়পরায়ণ থাকা শুধুমাত্র আলিমে রব্বানী [আল্লাহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞাত ও তাঁর প্রতি ভীত আলিম হচ্ছেন আলিমে রব্বানী] দ্বারা সম্ভব। কারণ তাঁর নফসকে তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তাঁর মন ও হৃদয় তাঁকে সর্বদা সতর্ক রাখে। যখন তিনি তাঁর মতামত পেশ করেন, তখন তিনি আশা করেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের।[৫৬]

৫. আদব হচ্ছে জ্ঞানকে সঠিকভাবে অনুধাবনের চাবি: শায়খ ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: জ্ঞানকে অনুধাবন করার উপায় হচ্ছে আদব। মানুষের আমল খাঁটি হয় সঠিক জ্ঞান দ্বারা। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ হয়ে ওঠে প্রজ্ঞাবান। আর প্রজ্ঞার

---

[৫৬] আওয়ারিফুল মা'আরিফ, পৃ. ৪২০, আক্বওয়ালে সালাফ [ইংরেজি অনুবাদ], খ. ৩, পৃ. ৪০১-৪০২ থেকে উদ্ধৃত।

মাধ্যমে মানুষ সংযমী ও দুনিয়াকে পরিহার করতে অভ্যস্ত হয়। সংযমের মাধ্যমে মানুষ আখিরাতের প্রতি আকর্ষিত হয়। আর আখিরাতের প্রতি আকর্ষিত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৫৭]

৬. নামাযের আদব-কায়দা: যখন কেউ নামায আদায় করে, তখন তার হৃদয়ে অন্যকিছু যাতে স্থান করে নিতে পারে না, সেদিকে খিয়াল রাখতে হবে- সেটা যতোই গুরুত্বপূর্ণ কিংবা মূল্যহীন হোক না কেনো। বুদ্ধিমান লোকজন দুনিয়াকে একপাশে রেখে মনোযোগী হয়ে নামায আদায় করেন। যদি তা না হয়, তাহলে দুনিয়া হৃদয়কে তার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। সঠিক নামাযীরা দুনিয়াকে দূরে রেখে দেন দ্বীনের মূল্য হেতু, সুতরাং এর দ্বারা তারা যখন [নামাযের অবস্থায়] আল্লাহর সঙ্গে বাক্যালাপে জড়িত হন তখন তাঁর নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে পারেন। তারা সক্ষম হন জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য লাভ করতে আভ্যন্তরীণভাবে।[৫৮]

৭. শান্তির দশটি অংশ: বলা হয়ে থাকে শান্তির মধ্যে দশটি অংশ আছে। এর নয়টি হচ্ছে নীরবতা অর্জনের মধ্যে এবং একটি একাকীত্বে বিদ্যমান। আরো বলা হয়ে থাকে, একাকীত্ব হচ্ছে সবকিছুর মূল ও ভিত্তি। অপরদিকে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা হচ্ছে অস্থায়ী। সুতরাং আমাদেরকে যাকিছু মৌলিক তা-ই আঁকড়ে ধরতে হবে। মেলামেশা হতে হবে শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে। এসময়ও তোমাকে নিরব থাকা চাই। কারণ এটা [নিরব থাকা] হচ্ছে মৌলিক, অথচ কথাবলা হলো অস্থায়ী ব্যাপার।[৫৯]

৮. সবরের সারাংশ: সবকিছুর সারাংশ বা নির্যাস আছে। মানুষের নির্যাস হচ্ছে তার বুদ্বিমত্তা। বুদ্ধিমত্তার নির্যাস হচ্ছে সবর বা ধৈর্য। যখন কেউ সবর অবলম্বন করে, তখন সে বাস্তবে তার নফসের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করলে অন্তরে সৃষ্টি হয় কোমলতা।[৬০]

---

[৫৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০।

[৫৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭১।

[৫৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২। মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময়ও শুধুমাত্র যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই কথা বলতে হবে।

[৬০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২। জানা থাকা প্রয়োজন যে, নফসকে দমন করা ও হৃদয়ের কোমলতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

৯. কৃতজ্ঞতার নির্যাস: ব্যক্তির প্রতি যাকিছু পতিত হয়, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে মনে করতে হবে। শুধুমাত্র ঐটুকু ছাড়া যার দ্বারা তার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যাকিছু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর পতিত করেন তা অবশ্যই বান্দার জন্য প্রভুর পক্ষ থেকে দয়ার-দান ছাড়া আর কিছু নয়।[৬১]

১০. তাসাওউফের রূহ: হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর খলিফা শায়খ সা'দি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বুস্তান কিতাবে দুটি উপদেশ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা এগুলো নিচে তুলে ধরছি। এ কথাগুলো হচ্ছে তাসাওউফের রূহ।

> "দজলা নদীর ওপর দিয়ে আমার ভ্রমণকালে শায়খ শিহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ আমাকে দুটি উপদেশ দিয়েছেন: ১. নিজের সম্পর্কে তুমি কখনও সুধারণা পোষণ করবে না। ২. অপরদের সম্পর্কে তুমি কখনও কুধারণা করবে না।"[৬২]

১১. ইমাম রাযী রাহিমাহুল্লাহর প্রতি উপদেশ: হযরত শায়খুল ইসলাম শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ একটি পত্রের মাধ্যমে ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী রাহিমাহুল্লাহকে নিচে উদ্ধৃত উপদেশ প্রদান করেন:

"আজকের যুগে যে কেউ জ্ঞানের প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তাঁর প্রতি আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ পতিত হয়েছে। সুতরাং যে কেউ পরহেজগার এবং হুঁশিয়ার, তাঁকে খাস দু'আ দ্বারা সমর্থন করা প্রয়োজন। এতেকরে আল্লাহ তা'আলা তার নিকট স্পষ্ট করে দেবেন, পরহেজগারীর মাধ্যমে জ্ঞানের মধ্যস্থ চোরা-গর্তসমূহের চেহারা। তাঁর জ্ঞানের মৌলিকতা রক্ষা করবেন ইচ্ছার[৬৩] প্রভাব থেকে। একটিমাত্র [বদ] ইচ্ছার ফোটা সমগ্র মহাসাগরের পানিকে কলুষিত করে দিতে সক্ষম। যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে নফসের আকাঙ্ক্ষা [যার সূত্র হচ্ছে নিচ কদর্য জগৎ] শেকড় গেড়ে বসে যায়, যা সর্বদা তার সঙ্গী হয় এবং জ্ঞানের [যার সূত্র হচ্ছে পবিত্র উচ্চ জগৎ] ভেতর অন্তঃপ্রবেশন করে, তখন এটি [নফসের ইচ্ছা] জ্ঞানকে আড়ষ্ট করে ধরে। ফলে জ্ঞান তার উচ্চাসন থেকে অধঃপতিত হয়। যখন জ্ঞানের সকল সূত্র নফসের ইচ্ছা থেকে পবিত্র থাকে, তখন জ্ঞান ক্রমান্বয়ে উন্নততর হতে থাকে- যা আল্লাহ তা'আলা

---

[৬১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬১।

[৬২] আক্বওয়ালে সালাফ [ইংরেজি অনুবাদ], খ. ৩, পৃ. ৬৬১।

[৬৩] এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর ইচ্ছা বুঝাচ্ছে। -গ্রন্থকার।

বলেছেন, ‘তাঁর মহিমান্বিত মর্যাদার বর্ণনা সাগরের পানিকে কালি বানিয়ে লিখতে থাকলে শুকিয়ে যাবে, কিন্তু লিখা শেষ হবে না।’ এটা যখন ঘটবে, তখন জ্ঞান পূর্ণ শক্তিসহ এর সাথে আত্মপ্রকাশ করবে। আর এরূপ স্তরে উন্নীতজন হচ্ছেন সেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিগণের সাথী যারা ‘রাসিখুন ফিল ইলম’ [জ্ঞানের মধ্যে শক্তভাবে গেঁথে আছেন]। ওদের মতো নয়- যারা শুধুমাত্র কৃষ্টির অনুসারী। এরূপ ব্যক্তিই হচ্ছেন সত্যিকার ‘ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া’। তাঁদের আমল জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। তাদের জ্ঞান ও কর্ম একটার পর আরেকটাকে সর্বদা অনুসরণ করে- যতক্ষণ না তাদের আমল সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, নিষ্কলুষ জটিল হয়ে যায়। এটা তখন হয়ে যায়, গোপন কাহিনী ও আধ্যাত্মিক কথোপকথন।

আমলসমূহ- তাদের সূক্ষ্মতা হেতু, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপ ধারণ করে। আর জ্ঞান-বিজ্ঞান- তাদের শক্তিশালী প্রভাব ও সহজাত সক্ষমতা হেতু, আমলসমূহের রূপ ধারণ করে যা বিস্তৃত হয়।

নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণ করার ব্যাপার হচ্ছে- এতে কিছুই নেই। এর মূল জাগতিকতার মধ্যে (পরকালের সঙ্গে সম্পর্কহীন)। যেমন, আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

-“অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং পৃথিবীর [দুনিয়াবী খাহিশাতের] অনুগামী হয়ে রইল।” [আ’রাফ : ৭]

সুতরাং, প্রজ্ঞার নূরকে ওয়াসওয়াসার বদমায়েশী থেকে পবিত্র করতে, নিজেকে অনুমানপ্রবণতা- যা সৃষ্টি করে প্রজ্ঞার মধ্যে দুর্বলতা এবং ত্রুটিযুক্ত নফসকে করে বিভ্রান্ত, সুরক্ষা করতে সকল কাজ আঞ্জাম দিতে হবে সাহসিকতার মাধ্যমে। এটা যখন কারোর পক্ষে সম্ভব হয় তখন বহির্গামী আত্মা ‘মালা’ ‘আলা’ [ফিরিশতাদের সঙ্গলাভের উচ্চতর স্তর] -এ পৌঁছুয়ে যায়। অতিক্রম করতে থাকে আল্লাহ তা’আলার ময়দানসমূহ। তোমাকে তাই দুনিয়ার তুচ্ছ বিত্তবিভবসমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে। দূরে থাকতে হবে সৃষ্টির মোহনীয় দৃষ্টি ও তার মিষ্ট সান্ত্বনা প্রদানের ভেলকিবাজি থেকে। এসব জিনিসই হচ্ছে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য পদস্খলন ও অধঃপতনের কারণ।

যে লোক সর্বোচ্চ সান্নিধ্য [অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য] লাভে ইচ্ছুক, সে হচ্ছে আসল মুতাকাল্লিম এবং মুহাদ্দিস। তার ওপর অবতরণ করে খোদায়ী সংজ্ঞার্থ। এর পেছনে দুটি কারণ বিদ্যমান: ১. যেহেতু এটা আসে কষ্টকর চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে তাই সে নিজেই এর প্রকাশস্থল। ২. সে ইচ্ছা করে কষ্ট-সাধনাকে লাঘব করতে আল্লাহর ওপর সত্যিকার আশ্রয়ের মাধ্যমে। এছাড়া সে বেশি বেশি করে আল্লাহর পবিত্র নৈকট্যস্থলে ডুব দিতে থাকে। সে ডুব দেয় তার শ্বাস-প্রশ্বাসসহ ‘‘আইনুল ইয়াক্বিনের’ [নিশ্চয়তার চোখ] মহাসাগরে। সে স্নাত করে দলিল-প্রমাণসমূহের প্রভাব নির্দেশনার মাধ্যমে। এটা করতে যেয়ে, দলিলাদি হয় তার চিন্তা- কিন্তু তা হয় না তার গোপনীয়তা ও রহস্যাবলী।”

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে তাফসীরে রুহুল মা’আনী’র লেখক বলেন: “একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে কী সুন্দর সতর্কীকরণ! কী সুন্দর উপদেশ একজন আন্তরিক বন্ধুর নিকট থেকে! আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যা তিনি বলেছেন তা থেকে যেনো দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে সক্ষম হই।”[৬৪]

ইন্তিকাল

কোনো কোনো কিতাবে আছে শেষ জীবনে হযরত শিহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্ধ হয়ে যান। মুহাররম মাসের ১ম তারিখ ৬৩২ হিজরি [১২৩৪ ঈসায়ী] তিনি এই ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন শায়খ অহুদুদ্দীন বিন আবুল ফখর কিরমানী [মৃ. ৬৩৫ / ১২৩৮] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি তাঁকে গোসল এবং কাফনও পরিয়ে দেন। বাগদাদের বিখ্যাত ‘ওয়ার্দিয়া’ কবরস্থানে এই মহান সুফি সাধক সমাহিত আছেন। তাঁর সমাধিস্থলের পাশেই একটি বড়ো মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা তাঁর এ প্রিয় বান্দার কবরকে নূরান্বিত করুন। রক্ষা করুণ তাঁর সকল রহস্যকে।

---

[৬৪] হযরত মাহমুদ আলুসী বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ, ‘তাফসিরে রুহুল মা’আনী’, খ. ৯, পৃ. ১০৩; আক্বওয়ালে সালাফ, খ. ৩, পৃষ্ঠা ৪০৮ থেকে উদ্ধৃত।

ইমামুত তরিকত হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ একঝাঁক উচ্চ পর্যায়ের তরিকতের খলিফা রেখে যান। এদের প্রত্যেকেই ছিলেন সুহরাওয়ার্দি তরিকার একেকজন উজ্জ্বল তারকা। এ গ্রন্থে সবার জীবনালোচনা সম্ভব নয়। এরপরও আমরা চেষ্টা করবো উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন খলিফার জীবনালোচনা করার। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ। সর্বপ্রথম আমরা ভারতের মুলতানে বসবাসরত উচ্চপদস্থ শাইখুল মাশাইখ হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করতে আশা পোষণ করছি। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না। আমরা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী সর্বদা, কিন্তু তিনি সব ধরনের মুখাপেক্ষিতার ঊর্ধ্বে।

হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৬৬৫ , সমাধি- মুলতান, সিন্ধু, পাকিস্তান।)

সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার বিখ্যাত শাইখুল মাশাইখ হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত মুলতানে ইলমে তাসাওউফের খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি চিশতিয়া তরিকার মহান ওলি ও শাইখুল মাশাইখ বাবা ফরিদুদ্দিন মাসউদ উজুদানী গঞ্জেশকর [১১৯৭-১২৬৬ ঈ.] রাহিমাহুল্লাহর সমসাময়িক যুগে জীবিত ছিলেন। এছাড়া হযরত গঞ্জেশকর রাহিমাহুল্লাহর পীর শায়খ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী দেহলবী [১১৯৩-১২৩৫ ঈ.] রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গেও বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সাক্ষাত হয়। বাস্তবে এ তিনজন উচ্চ পর্যায়ের ওলিদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিলো।

পরিবার ও পূর্বপুরুষ

তিনি ছিলেন একাধারে কুরাইশী, হাসানী ও হাশিমী।[৬৫] তাঁর দাদা শায়খ কামালুদ্দিন আলী শাহ মক্কা মুকাররমা থেকে বর্তমান উজবেকিস্তানের খোয়ারিজমে এসে বসবাস শুরু করেন হিজরি ২০০ সনে। তবে কিছুদিন পরই চলে যান মুলতানের নিকটস্থ 'কুত কারোর' নামক স্থানে। এখানেই তাঁর পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।[৬৬] হযতর বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর পিতার নাম ছিলো শায়খ ওয়াজিহউদ্দিন। তিনি একই অঞ্চলে বসবাসকারী মাওলানা হামিদুদ্দিন তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহর মেয়ে বিবি ফাতিমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর আম্মার নাম বিবি ফাতিমা ছিলো সে ব্যাপারে মতানৈক্য না থাকলেও তিনি কোন্ বংশের মেয়ে ছিলেন এ ব্যাপারে আরো দুটি বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন কিতাবে। যেমন, আনওয়ারে গাউসিয়া কিতাবে আছে যে, বিবি ফাতিমা শায়খ ঈসা রাহিমাহুল্লাহ নামক এক ওলির মেয়ে। শায়খ ঈসা ছিলেন গউসুল আজম হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর একজন বংশধর। হযরত ওয়াজিহউদ্দীন যখন হামা নামক শহরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তিনি শায়খ ঈসার

---

[৬৫] আনওয়ারে গাউসিয়া।

[৬৬] সিয়ারুল আরিফীন; মাসালিকুস সালিকীন, খ. ২, পৃ. ৫১১।

মেয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।[৬৭] অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিবি ফাতিমা ও বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রাহিমাহুল্লাহর মাতা সহোদরা ছিলেন। অর্থাৎ বাবা ফরিদুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ও বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রামিহাহুল্লাহ একে অন্যের খালাতো ভাই।

জন্ম ও শিক্ষা

হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ ৫৬৬ হিজরি সনে কুত কারোর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দিনটি ছিলো ২৭ রামাদ্বান, শুক্রবার।[৬৮] অবশ্য তাঁর জন্ম তারিখ নিয়েও মতানৈক্য আছে। এক বর্ণনা মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৮৭ হিজরি / ১১৯২ ঈসায়ী। একই বছর চিশতি তরিকার শায়খুল মাশাইখ গরীবে নেওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি সঞ্জরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আজমিরে আগমন করেন।

হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ মাদারজাত ওলি ছিলেন। একেবারে শিশু থাকাবস্থায়ই তাঁর মধ্যে এর নিদর্শন প্রকাশ পয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, তাঁর পিতা যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি মায়ের বুকের স্তন্যপান থেকে বিরত থেকে আদবের সাথে মনোযোগসহ আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করেন। এছাড়া সাত তাজবিদের মাধ্যমে তিলাওয়াত শিখেন। যৌবনের শুরুতেই তিনি তাঁর পিতাকে হারান। তখন মাত্র ১২ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। ইয়াতীম হওয়ার পর তিনি চলে যান উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে খুরাশান শহরে।[৬৯]

খুরাশানে থেকে দীর্ঘ ৭ বছর ফিকাহ ও হাদিসের ওপর অধ্যয়ন করেন। এরপর আরো উচ্চতর শরয়ী জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে চলে যান উজবেকিস্তানের বুখারায়। তাঁর অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র স্বভাব এবং আনুগত্যতা হেতু সেখানকার উস্তাদগণ তাঁকে 'বাহাউদ্দিন ফিরিশতা' বলে সম্বোধন করতেন।[৭০]

---

[৬৭] আনওয়ারে গাউসিয়া।

[৬৮] মাসালিকুস সালিকীন, খ. ২, পৃ. ৫১১।

[৬৯] সিয়ারুল আরিফীন।

[৭০] মাসালিকুস সালিকীন, খ. ২, পৃ. ৫১১।

বুখারায় দ্বীনি শিক্ষা সমাপ্ত করে চলে যান মক্কা মুকাররমায়। পবিত্র হাজ্জ পালন করে মদীনা মুনুওয়ারায় যেয়ে মসজিদে নববীতে হাদিসের দারসে যোগ দেন। সেখানে তাঁর উস্তাদ ছিলেন কামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহ। দীর্ঘ ৫ বছর নূরের শহরে থেকে উস্তাদের নিকট থেকে হাদিসের সনদ লাভ করেন।[৭১] এরপর হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ চলে যান জেরুজালেমে। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে চলে আসেন বাগাদাদে।

তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণ

ইতিহাসব্যাপী যতো ওলিআল্লাহ ও মাশাইখে আজম পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন তাঁরা কেউই কোনো না কোনো পীর আল্লাহওয়ালার সুহবত থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। এর মূল কারণ হলো, ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তাসাওউফ- এ উভয়বিদ জ্ঞানলাভের উপায়ই হচ্ছে যথাক্রমে উচ্চমানের উস্তাদ ও ওলির সান্নিধ্য লাভ। আর বাস্তবে এ উভয়বিদ জ্ঞান ও সেসঙ্গে প্রয়োজনীয় আমল ও মুজাহাদা ছাড়া সত্যিকার অর্থে প্রভুর নৈকট্যশীল বান্দাহ হওয়া যায় না। এটাই আল্লাহ তা'আলার নিযাম। তিনি ওয়াসিলা ছাড়া খুব অল্পজনকেই নিজের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মুর্শিদ-শাগরিদ সম্পর্ক হচ্ছে ইলমে তাসাওউফের মাধ্যমে নৈকট্যশীল বান্দায় রূপান্তর হওয়ার সৌভাগ্যলাভের পূর্বশর্ত। কারণ তাযকিয়ায়ে নফস [আত্মশুদ্ধি] যেহেতু ফরয হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, তাই এটি অর্জনে পীরের সুহবত একান্ত জরুরি। মোটকথা তাফসির, ফিকাহ ও হাদিসের যেরূপ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ইসনাদ বিদ্যমান, ঠিক সেরূপ তাসাওউফের তথা মুর্শিদ-শাগরিদেরও একটি ইসনাদ আছে, যাকে বলা হয় 'তরিকতের সিলসিলা'। এ সিলসিলাও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছুয়েছে। বাহিক্য ইলমের সনদ লাভের পর আধ্যাত্মিক ইলমেরও সদন অর্জন করা প্রয়োজন। উভয়টির সমন্বয় যার মধ্যে ঘটে তিনিই আল্লাহর সত্যিকার আ'রিফ হতে পারেন।

হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাহ্যিক ইলমে দ্বীনের ওপর উচ্চতর শিক্ষা শেষে আধ্যাত্মিক খোরাক পেতে আকুল হয়ে ওঠলেন। বাগদাদে অবস্থানকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিলেন। তিনি জানতে পারলেন, বাগদাদ শহরে একাধিক শাইখুল মাশাইখ বাস করেন। এর মধ্যে হযরত

[৭১] ফাওয়াইদুল ফুয়াদ।

শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর সুনাম ও আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদা সবার মুখে মুখে প্রচারিত ছিলো। বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রচণ্ড এক টান অনুভব করেন হৃদয় মাঝে। তিনি হযরত শিহাবুদ্দিনের হাতে বাইআত গ্রহণ করতে খুব আগ্রশীল হয়ে ওঠলেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করে চলে গেলেন হযরতের দরবারে।

মুর্শিদে বরহক্বের হাতে বাইআত গ্রহণ করে তরিকতের সবক নিতে থাকেন। মাত্র ১৭ দিন কঠোর রিয়াজত, মুজাহাদা, মুশাহাদ ও জিকির-আজকার শেষে হযরত শিহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে ডেকে এনে বললেন, "হে বৎস! তুমি তরিকতের খিরক্বা লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছো।" এতো অল্প সময়ের মধ্যে খিলাফত লাভ করায় খানক্বায় অবস্থানরত অন্যান্য মুরিদান বেশ হিংসাবোধ করলেন। এদের অনেকেই দীর্ঘদিন যাবৎ হযরতের সুহবতে ছিলেন- কিন্তু খলিফা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন নি। ব্যাপারটি যখন হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর নজরে পড়ে তখন তিনি সবাইকে ডেকে এনে বললেন, "দেখো বাবারা! বাহাউদ্দিন হচ্ছেন শুকনো কাঠের মতো। ফলে এতে খুব সহজেই আগুন ধরে যায়। তোমরা সবাই এখনও ভেজা কাঠের মতো- তাই আগুন ধরতে অনেক সময় ব্যয় হচ্ছে।"

খিলাফত লাভের পূর্বেকার স্বপ্ন

হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পীর শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে খিলাফত লাভের আগের রাত একটি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন, একটি বিরাট নূরোজ্জ্বল গৃহে অবস্থান করছেন। সেখানে একটি উঁচু স্থানে কুরসির উপর উপবিষ্ট আছেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পাশেই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়ানো ছিলেন তাঁর মুর্শিদ হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ। কক্ষের একপাশে একটি দড়ি টাঙ্গানো ছিলো। দড়িতে রাখা ছিলো কয়েকটি নূরোজ্জ্বল খিরক্বা। হযরত শিহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহকে ডেকে বললেন, 'কাছে এসো!' তিনি এগিয়ে গেলে হযরত তাঁর হাতে ধরে বললেন, 'তিনি হচ্ছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দড়িতে টাঙ্গানো একটি খিরক্বার দিকে ইশারা করে বললেন, "হে উমর! এটি জাকারিয়ার গয়ে পরিয়ে দাও!" সুতরাং শিহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ঐ খিরক্বাটি এনে জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহর গায়ে পরিয়ে দিলেন। তিনি এটা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পাদ্বয় ছুঁয়ে চুমো খেলেন। হযরতের ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

এ স্বপ্ন দেখার পরদিন ভোরে হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ হযরত জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহকে ডেকে নিলেন নিজের কক্ষে। তিনি যখন স্বীয় মুর্শিদের সামনে হাজির হলেন তখন লক্ষ্য করলেন, স্বপ্নে যে নূরোজ্জ্বল কক্ষ দেখেছিলেন এটিও অনুরূপ দেখাচ্ছিলো। শুধুমাত্র সেখানে ছিলেন না রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একটি দড়িতে কয়েকটি আলোকিত খিরক্বাও টাঙ্গানো ছিলো। হযরত উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে ডাক দিলেন কাছে যেতে। দড়ি থেকে একটি খিরক্বা তুলে নিয়ে তাঁকে পরিয়ে দিলেন। এ খিরক্বাটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খিরক্বা পরানোর পর শায়খ শিহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বললেন: "এ খিরক্বাটির মালিক হচ্ছেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি তাঁর অনুমতিক্রমে তোমার গায়ে এটি পরিয়ে দিলাম। তুমি তো ইতোমধ্যে স্বপ্নযোগে ব্যাপারটি অবগত হয়েছো!"

বাগদাগ থেকে মুলতানের দিকে যাত্রা

হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহকে তাঁর পীর হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ একদিন কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "হে আমার পুত্র! তোমার মিশন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। হিন্দের মুলতানে যেয়ে তুমি এ তরিকানুযায়ী তাসাওউফের খিদমতে লেগে যাও।" মুর্শিদের নির্দেশ পেয়ে তিনি মুলতানের উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন পীরভাই হযরত শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন শায়খ উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর আরেক বিখ্যাত খলিফা। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো ভারতের বাংলা প্রদেশে এসে সুহরাওয়ার্দি তরিকার বিকাশ ঘটানো।

উভয় শায়খ নিশাপুরে এসে যাত্রাবিরতি করেন। সে সময় নিশাপুরে বসবাস করতেন যুগের আরেক স্বনামধন্য শায়খ, 'মানতিকুৎ তায়ির' ও 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' কিতাবদ্বয়ের লেখক হযরত ফরিদুদ্দিন আত্তার নিশাপুরী রাহিমাহুল্লাহ। শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন বয়োবৃদ্ধ হযরত ফরিদুদ্দিন আত্তার রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

সাক্ষাৎ শেষে ফিরে আসলে হযরত বাহাউদ্দিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মতে বর্তমানে সর্বাধিক উচ্চ পর্যায়ের তরিকতের শায়খ কে?" তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহ জবাবে বললেন, "আমার মতে নিঃসন্দেহে হযরত ফরিদুদ্দিন আত্তারই হচ্ছেন বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দরবেশ।"

নিশাপুরে যাত্রবিরতির পর শায়খ বাহাউদ্দিন ও শায়খ জালালুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা ভিন্ন পথে যারতার গন্তব্যস্থলের দিকে পুনরায় যাত্রা করেন।[৭২]

মুলতানে প্রত্যাবর্তন

এক দীর্ঘ ও কষ্টকর ভ্রমণশেষে হযরত জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ অবশেষে মুলতানে প্রত্যাবর্তন করেন। তখনকার যুগে পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী মুলতান ছিলো একটি উন্নত শহর। এখানে বাস করতেন একাধিক মাশাইখে আজম। এছাড়া ভারবর্ষের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মুলতানের সুনাম ছিলো সমগ্র মুসলিম বিশ্বে।

হযরত জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহর আগমন হেতু স্থানীয় কিছু উলামা-মাশাইখ ও উচ্চ পর্যায়ের আমির-উমারাগণ কিছুটা হিংসাবোধ করলেন। তাঁরা ভাবলেন, মুলতানে যতো পীর-মাশাইশ ও উলামায়ে কিরাম আছেন তা-ই যথেষ্ট। আরেকজন পীরের প্রয়োজন এখানে নেই। কিন্তু বিষয়টি সরাসরি হযরত জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহকে না বলে এক অভিনব পদ্ধতিতে তাঁকে অবগত করলেন।

তাঁরা এক কাপ ভর্তি দুধ হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করলেন হযরতের দরবারে। হযরত জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ বিষয়টি আঁচ করে নিলেন। বুঝতে পারলেন, মুলতানের পীর-মাশাইখরা এটাই বুঝতে চাচ্ছেন যে, "এ শহরে যথেষ্ট দরবেশ-আউলিয়া আছেন। অতিরিক্ত আরেকজনের প্রয়োজন নেই।" তিনি একটি গোলাপ ফুল এনে পরিপূর্ণভাবে দুধে ভর্তি কাপের মাঝখানে রেখে দিলেন। ফলে ফুলটি দুধের ওপর ভাসতে লাগলো। এরপর এটি মাশাইখে আজমের নিকট ফেরৎ পাঠালেন।

---

[৭২] মাসালিকুস সালিকীন, খ.২, পৃ. ৫১২।

পীর-মাশাইখগণ কাপের মধ্যে ভাসমান গোলাপফুল দেখে অবাক হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, হযরত জাকারিয়া জবাবে এটাই বললেন, 'মুলতানে আরেকজন উচ্চ পর্যায়ের দরবেশের প্রয়োজন আছে!' তাঁরা হযরতের দূরদৃষ্টি, জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হলেন। সবাই এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু এরপরও কোনো কোনো মাশাইখ ও শাসকদের মধ্যে তাঁর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রয়ে গেলো।

কাজির সঙ্গে সংঘাত

মুলতানে বসবাস শুরুর প্রাথমিক সময়ে হযরত জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ মুলতানের কাজি কুতুবুদ্দিন কাশানীর মাদরাসা মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতেন। কাজী কাসানী ছিলেন ঘোর সুফি-বিরোধী। কোনো একদিন বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ জামাআতের সময় নামায থেকে সরে যেয়ে নিজেই নামায আদায় করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, "যদি কেউ কাশফের [নূরে বাতিন] মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হন যে, নামাযের মধ্যে ইমাম ভুল করেছেন, তাহলে তাকে আর ইমামের ইত্তিবা করতে নেই।" উল্লেখ্য এদিন ইমামতি করছিলেন কাজি কুতুবুদ্দিন কাশানী।

হযরত বাহাউদ্দিনের উক্ত মন্তব্যে কাজি সাহেব ভীষণভাবে অপমান বোধ করলেন। তিনি রাগের সুরে মন্তব্য করলেন, "কাশফের মাধ্যমে জানা কোনো বিষয়ই শরীয়তসম্মত নয়! এটা একটি মারাত্মক পাপ।" এরপর কাজি সাহেব বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহকে তাঁর মাদরাসা মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিলেন।

মুলতানে দাওয়াতের প্রারম্ভকাল

প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি নিরবে, মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে থেকে কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা, জিকির-আজকার ও ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে কালাতিপাত করতে থাকেন। তিনি যেনো ভবিষ্যতের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দীর্ঘদিন পরে আস্তে আস্তে তাসাওউফের প্রচার-প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। শরীয়ত ও তাসাওউফের ওপর তাঁর মূল্যবান ওয়াজ শুনতে লোকজনের সমাগম বাড়তে শুরু হয়।

ধীরে ধীরে একজন বিশিষ্ট আলিম ও সুহরাওয়ার্দি তরিকার শায়খ হিসেবে হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সুনাম মুলতানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে অবশ্যই

সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বাগদাদে বসবাসরত শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং ওলায়েতের মাহাত্ম্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো। মানুষ যখন জানতে পারলো যে, হযরত সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট একজন খলিফা হচ্ছেন হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ এবং তিনি তাদেরই শহর মুলতানে অবস্থান করছেন, তখন লোকজন দলে দলে এসে তাঁর সুহবাত লাভ করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, মুলতানের বাইর থেকেও লোকজন আসতে শুরু করেন। ইরাক এবং খুরাশানের বণিকরা এসে তাঁর দরবারে হাজির হতে থাকেন। হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ মেহমানদের সুবিধার্থে সরাইখানাসহ [রান্নাঘর] একটি বড়ো খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিকভাবে এই খানক্বায় শুধুমাত্র উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্মচারী ও দূরদেশের মেহমাদের প্রবেশিধকার ছিলো। পরবর্তীতের এটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

সিয়াসত

হযরতের জীবদ্দশায় দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাক [১১৫০-১২১০ ঈ.]। এদিকে শাহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী [১১৪৯-১২০৬ ঈ.] রাজা পৃত্তিরাজ চৌহানকে [১১৬৬-১১৯২ ঈ.] ১১৯২ ঈসায়ী সনের যুদ্ধে পরাজিত করেন। মুলতানে সুলতানের শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন নাসিরুদ্দিন ক্বাবাশা [মৃ. ১২২৮ ঈ.]। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ [মৃ. ১২৩৬ ঈ.] যখন দিল্লির সুলতান হিসেবে কুতুবুদ্দিন আইবাকের স্থলাভিষিক্ত হন তখন ক্বাবাশা নিজেকে দিল্লির শাসন থেকে মুক্ত মুলতানের স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণার ষড়যন্ত্র করেন। এ ষড়যন্ত্র কিন্তু তখনকার মুলতানের কাজি মাওলানা শরফুদ্দিন ইসফাহানী পছন্দ করলেন না। একইভাবে হযরত জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহও এটি পছন্দ করেন নি। উভয় ব্যক্তি ছিলেন সুলতান ইলতুতমিশের সমর্থক। এর মূল কারণ ছিলো, সুলতান ইলতুতমিশ একজন পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। এছাড়া তিনি শায়খ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদও ছিলেন। সুতরাং কাজি ও শায়খ বাহাউদ্দিন ক্বাবাশার ষড়যন্ত্রের কথা সুলতানকে অবগত করতে একখানা পত্র লেখেন। কিন্তু পত্রখানা শাসকের গোয়েন্দাদের হস্তগত হয়। সুলতানের নিকট পৌঁছুয় নি।

ক্বাবাশা যখন অবগত হলেন যে, তাঁর ষড়যন্ত্রের কথা হযরত বাহাউদ্দিন ও কাজি শামসুদ্দিন সুলতানকে অবগত করতে চিঠি দিয়েছেন তখন তিনি প্রথমে কাজিকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করলেন। এরপর নিজের প্রাসাদে হযরত বাহাউদ্দিন

রাহিমাহুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন। হযরত তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হওয়ার পর ক্বাবাশা রাগান্বিত হয়ে ঐ পত্রখানা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও কী এ পত্র সুলতানের নিকট পাঠিয়েছিলেন?" হযরত বিনা দ্বিধায় উত্তর দিলেন, "জী হ্যাঁ! আমি এই পত্র লিখেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়ে।" আধ্যাত্মিক প্রচণ্ড প্রভাবে প্রভাবান্বিত হযরতের কথাগুলো শ্রবণ করতেই শাসকের অন্তরে তোলপাড় শুরু হলো। তার সমগ্র দেহ কাঁপতে লাগলো। বললেন, "আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে চলে যান!"[৭৩]

সুলতান ইলতুতমিশের দরবারে

ঈসায়ী ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুতমিশ মুলতান ও সিন্ধুকে সরাসরি দিল্লির সালতানাতের অধীনে নিয়ে আসেন। সুতরাং দিল্লির সুলতান ও শায়খ বাহাউদ্দিন মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে সুসম্পর্ক আরো গভীর হয়। কিছুদিন পর সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ হযরতকে দিল্লিতে আসতে আমন্ত্রণ জানান। এসময় হযরত শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনেন নাজমুদ্দিন সুগরা। সুফি-দরবেশ বিরোধী এ ব্যক্তি হযরত জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহর প্রতি হিংসা পোষণ করতেন। দিল্লির মানুষ এবং বিশেষকরে সুলতান নিজেই হযরত জালালুদ্দিনের ভক্ত ছিলেন। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। অবশেষে অন্তর্জ্বালা হেতু তিনি শায়খের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র করেন। এ ব্যাপারে একটি ফায়সালা চেয়েছিলেন সুলতান ইলতুতমিশ। তাই তিনি হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহকে দিল্লিতে আসতে আমন্ত্রণ জানান।

ঈসায়ী ১২২৮ সালে হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া যখন দিল্লির নিকটস্থ হন তখন সুলতান নিজেই তাঁকে শহরের বাইরে এসে স্বাগত জানান। নাজমুদ্দিন সুগরা ছিলেন সুফি-দরবেশ বিরোধী একজন দুষ্ট ব্যক্তি। তিনি যখন দেখলেন হযরত বাহাউদ্দিনকেও সুলতান খুব বেশি শ্রদ্ধা করছেন তখন তিনি ভীষণভাবে হিংসাতুর হয়ে ওঠেন।

দুষ্ট নাজমুদ্দিন সুগরা যে অভিযোগ হযরত জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহর বিরুদ্ধে উত্তাপন করেছিলেন তার মূল হুতা তিনি নিজেই ছিলেন। তিনি এক সুন্দরী

---

[৭৩] মাসালিকুস সালিকীন, খ. ২, পৃ. ৫১৩।

ক্রীতদাসীকে অর্থের লোভ দেখিয়ে শায়খ তাবরিযীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করতে বললেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন, বিনিময়ে তাকে অগ্রিম প্রদান করবেন ২৫০ স্বর্ণমূদ্রা ও পরে আরো সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে। দাসী টাকার লোভে সুলতানের নিকট হযরত জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে নালিশ করলো। সুলতান ব্যাপারটি বিশ্বাস করলেন না- কিন্তু সত্যমিথ্যা তো যাচাই করা দরকার।

সুলতান তাই সকল ধর্মগুরু ও মাশাইখে আজমকে একত্রিত করেন। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী, হযরত কাজি হামিদুদ্দিন নাগরী এবং বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানীসহ আরো অনেক আলিম-উলামা। দাসীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করে তার অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন শুরু হলে সে এক পর্যায়ে হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক জেরার সময় স্বীকার করে নিলো, বাস্তবে এ সবই একটি ষড়যন্ত্র। নাজমুদ্দিন সুগরাই এর মূল নায়ক। এ বিচারকার্যের ফলস্বরূপ নাজমুদ্দিনকে তার 'শাইখুল ইসলাম' পদ থেকে অপসারণ করা হয়। হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহকে এই পদে নিযুক্ত করেন সুলতান ইলতুতমিশ।[৭৪]

তাঁর পূর্বসুরী নাযমুদ্দিন সুগরার মতো হযরত জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ সিয়াসতে তেমন আকৃষ্ট ছিলেন না। 'শাইখুল ইসলাম' এর পদটি মূলত ছিলো একটি সম্মানজনক পদবী মাত্র। শরয়ী কোনো ব্যাপারে সমস্যা, মতানৈক্য ইত্যাদি আত্মপ্রকাশ করলে অন্যান্য আলিম-উলামা ও মাশাইখে আজমের পরামর্শক্রমে তিনি এগুলোর সমাধান দিতেন। তবে এ পদবী তাঁর খানক্বার জন্য অর্থকড়ির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ও তাসাওউফচর্চায় বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। সিয়াসত বা রাজনৈতিক ব্যাপারে সুলতানকে তিনি সদোপদেশ দিতেন মাত্র।

হযরত জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহর নিকট স্বয়ং সুলতানও বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ষড়যন্ত্রের জন্য সবাই তাঁর নিকট দুঃখপ্রকাশ করেন। এরপরও হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ আর দিল্লিতে অবস্থান করতে চাইলেন না। স্বীয় পীর হাযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশমতো বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সুলতান ইলতুতমিশ হযরতের ভ্রমণ সংক্রান্ত

[৭৪] মাসালিকুস সালিকীন, খ. ২, পৃ. ৫১৫।

সবকিছুর আঞ্জাম দেন। হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ দিল্লি ছেড়ে যাত্রাকালে বলেছিলেন:

"আমি যখন এই দিল্লি শহরে আসি, তখন ছিলাম খাঁটি সোনা। এখন আমি রূপায় পরিণত হয়েছি। এখানে থাকলে কী জানি পরবর্তীতে আমি কীসে পরিণত হবো?"

বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রকালে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ বিশেষ সম্মান প্রদর্শনার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন হযরত জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছুয়ে দিতে।[৭৫]

বিবাহ ও সন্তানাদি

হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মুলতানেই। তিনি ৭ পুত্রসন্তানের পিতা ছিলেন। এরা হচ্ছেন: ১. শায়খ সদরুদ্দিন আ'রিফ, ২. শায়খ বুরহানুদ্দিন, ৩. শায়খ জিয়াউদ্দিন, ৪. শায়খ আলাউদ্দিন, ৫. শায়খ শাহাবুদ্দিন, ৬. শায়খ কুওয়াতুদ্দিন ও ৭. শায়খ শামসুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।[৭৬]

তিনি একজন উত্তম পারিবারিক ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় সন্তানদের শিক্ষার জন্য অনেক অর্থকড়ি ব্যয় করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ নাতি হযরত রুকুনুদ্দিন আবুল ফাতাহ রাহিমাহুল্লাহর প্রতি হযরতের বেশ আকর্ষণ ও মুহাব্বাত ছিলো। রুকুনুদ্দিন ছিলেন শায়খ সদরুদ্দিন আ'রিফের পুত্র। রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ পরবর্তীতে একজন সুহারাওয়ার্দি শায়খ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

খুলাফায়ে কিরাম

হযরত জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর বেশ কয়েকজন খলিফা ছিলেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত ক'জন হলেন: ১. হযরত শায়খ সদরুদ্দিন আ'রিফ, ২. হযরত শায়খ

[৭৫] শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহ প্রথমে শায়খ আবু সাঈয়্যিদ তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ হন। পরে তিনি শায়খ শিহাবুদ্দিন সুহরারাওয়র্দি রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে যান এবং সুহরাওয়ার্দি তরিকায় খিলাফত লাভ করেন। দিল্লিতে অবস্থানকালে তিনি চিশতিয়া তরিকায়ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাংলার তখনকার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় এসে ইসলামপ্রচার করেন। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে দুটি মতামত পাওয়া যায়: ৬২৩ হি. / ১২২৬ ঈ. এবং ৬৪২ হি. / ১২৪৪ ঈ.। তাঁর সমাধি পণ্ডুয়ায় অবস্থিত। - বাংলাপিডিয়া।

[৭৬] মাসালিকুস সালিকীন, খ. ২, পৃ. ৫২৩-৫২৪।

সাইয়্যিদ জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী, ৩. হযরত শায়খ হাসান আফগানী, ৪. হযরত শায়খ সাইয়্যিদ উসমান মারওয়ান্দী উরফে লাল শাহবাজ ক্বলন্দর সিন্ধী, ৫. হযরত শায়খ ফখরুদ্দিন ইব্রাহিম ইরাকী, ৬. হযরত শায়খ সাইয়্যিদ সদরুদ্দিন আহমদ উরফে সাইয়্যিদ হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

হযরত শায়খ হাসান আফগানী নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু মুর্শিদে বরহক্বের ওয়াসিলায় তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ দূরদৃষ্টি [বাসিরাহ] দান করেছিলেন যে, কুরআনে পাকের আয়াতমালা থেকে নির্গত নূর তিনি অবলোকন করতে পারতেন। হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ নিজিই তাঁর এ খলিফা সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> "যদি কেউ আগামীকাল আমাকে আবদার জানায় নিজের দরগাহ [বাড়ি] থেকে এক ব্যক্তিকে বের করে নিয়ে আনতে, যে সবার পক্ষে বিচারের সম্মুখীন হবে, তাহলে আমি অবশ্যই হাসান আফগানীকে পছন্দ করতাম।"

তবে হযরত জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর সর্বাধিক বিখ্যাত খলিফা ছিলেন হযরত জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ। কথিত আছে এই মহাত্মন শায়খের ওয়াসিলায় মোঙ্গল যোদ্ধা জেঙ্গিশ খান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছিলো আমরা পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করবো।

উত্তম চরিত্র মাধুর্য

হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ শুধুমাত্র উচ্চ পর্যায়ের সুফি-শায়খ ছিলেন না- একই সময় তিনি ধর্মসংস্কারক, সামাজিক ও অর্থনীতিক সংস্কারক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সিন্ধু ও মুলতানের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি অনেক সংস্কার কাজে হাত দেন। অনেক মরু অঞ্চল ও জঙ্গল তাঁর নেতৃত্বে অনুর্বর থেকে উর্বর চাষাবাদের জমিতে রূপান্তর হয়। এ কাজে প্রয়োজন হয় পানি প্রাপ্তির জন্য ছোট বড় খাল খনন ও কূপের। এসব কাজকর্মে বেশ সময় ও শক্তিমত্তার প্রয়োজন পড়ে। এরপও তিনি এগুলো আঞ্জাম দেন এবং একই সময় একজন সুফি শায়খ হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন যথাযথভাবে।

নিজের সম্পদ ব্যবহারে উদারতা

হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তার ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত ছিলো দেশ-বিদেশে। কিন্তু এ উচ্চমাত্রার সম্পদ তিনি ব্যবহার করতেন খুব উদারভাবে। এর প্রমাণ হিসেবে একটি ঘটনার বর্ণনা এখানে তুলে ধরছি।

মুলতানের শাসক একদা হযরতের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, “শায়খ! মুলতানের সর্বত্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। শহরের গোদামে সংরক্ষিত সব গম শেষ হয়ে গেছে। কী করবো? উপদেশ দিন।”

হযরত বললেন, “আমার গোদামঘর থেকে প্রয়োজনীয় গম নিয়ে যান।” শাসক গম নিয়ে গেলেন। সরকারী গোদামে এই গম রাখার সময় একটি বড়ো কলস বেরিয়ে আসলো গমের ভেতর থেকে। কলসটি রৌপ্যমুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিলেন। শাসক ছুটে গেলেন হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহর নিকট। ভাবলেন, কলসটি নিশ্চয় ভুলবশত এসে গেছে। তাই ফেরৎ দেওয়া জরুরী। রৌপ্যমুদ্রা ভর্তি কলসটির কথা হযরতকে অবগত করলেন শাসক। হযরত বললেন, “লোকদেরে বলবেন, জাকারিয়া এ সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিলো। আমি ইচ্ছে করেই গমের সঙ্গে রৌপ্যমুদ্রাগুলো দিয়েছি।”[৭৭]

হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় একটি রান্নাঘর (লঙ্গরখানা] ছিলো। তিনি প্রতিনিয়ত রান্না করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ, বণিক-ব্যবসায়ী, দরবেশ ও দূরের মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করাতেন।

একটি ঘটনা

একদিন তিনি তার খাদিমকে ডেকে বললেন, গরীবদের মধ্যে ৫,০০০ দিনার বণ্ঠন করে দাও। খাদিম অনেক অনুসন্ধান করেও অর্থের বাক্সটি পেলেন না। তিনি হযরতকে বিষয়টি অবগত করলেন। মহাত্মন ওলিআল্লাহ হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ!” বেশ কিছুক্ষণ পর খাদিম আনন্দচিত্তে ছুটে আসলেন হযরতের নিকট। বললেন, “হুজুর! অর্থের বাক্সটি পেয়েছি।” এবারও

[৭৭] ফাওয়াইদুল ফুয়াদ।

হযরত বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ!” উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, “ইয়া শাইখী! আপনি কেনো উভয় সংবাদেই ‘আলহামদুলিল্লাহ!’ বললেন? প্রথমে তো জানতে পারলেন বাক্সটি হারিয়ে গেছে!” হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন:

> “দরবেশদের জন্য দুনিয়াবী বস্তু থাকা ও না থাকা কিংবা ধন-সম্পদ থাকা ও না থাকা সমান। দরবেশরা নিজেদের বস্তু-সম্পদকে ভালোবাসেন না। না তারা অখুশি হন অভাব অনটনে। তাদের জন্য উভয় অবস্থাই একই জিনিস।”

সমসাময়িক অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের সুফি-দরবেশগণ কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করতেন। একদিন গরীবে নেওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা হযরত শায়খ হামিদুদ্দিন নাগরী রাহিমাহুল্লাহ হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর উক্ত উক্তির ওপর মতানৈক্য করে বললেন:

> “যেহেতু সম্পদ ও সর্প অবয়বের মধ্যে সম্পর্কিত, তাই এদের মধ্যে সম্পৃক্ততাও বাস্তব। সুতরাং সম্পদ হচ্ছে একটি সর্প এবং যে সম্পদ জমা করে সে বাস্তবে সর্পকে আশ্রয় দেয়।”
>
> এর জবাবে হযরত বাহাউদ্দিন বললেন: “যদিও সম্পদ একটি সর্প, যে কেউ এর বিষক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণের মন্ত্র শিখে নিয়েছে, তার জন্য এ সর্প কোনো ভয়ের কারণ নেই।”

অতএব, হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর উক্ত মন্তব্য দ্বারা এটাই পরিষ্কার হলো যে, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষসাধনই হচ্ছে মৌলিক বিষয়। সম্পদ থাকা না থাকার সঙ্গে এর কেনো সম্পৃক্ততা নেই।

বিরাট ধৈর্যক্ষমতা

কোনো একদিন একদল ‘কলন্দরী’ হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহর খানক্বার সামনে এসে জড়োত হলো। তিনি খানক্বার দরোজা বন্ধ করলেন। তারা চাঁদার জন্য জোর দাবী জানালো। এমনকি এক পর্যায়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো খানক্বার দিকে। অবস্থা এমন হলো যে, মনে হচ্ছিালো বিরাট হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বের হয়ে আসলেন। বললেন, তোমারা খিয়াল করে শুনো। আমি এখানে কোনো ধরনের মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে

এটি প্রতিষ্ঠা করি নি। আমার পীর হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমি মুলতানে এসেছি।

যে মুহূর্তে কলন্দরীরা সুহরাওয়ার্দি তরিকার প্রতিষ্ঠাতার নাম শুনলো, তারা সবাই মাথা নতো করে হযরত জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে চলে গেলো।

ইবাদত

হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও ইবাদতগুজার ছিলেন। তিনি প্রায়ই মাত্র এক রাকাআত নামাযের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে নিতেন। ফাওয়াইদুল ফুয়াদ কিতাবে বর্ণিত আছে:

> "শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ এগিয়ে আসলেন। প্রথম রাকাআত নামায আদায়কালে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলেন। এরপর আরো তিন পারা পাঠ করেন। দ্বিতীয় রাকাআতে শুধুমাত্র সূরা ইখলাস একবার পাঠ করে নামায শেষ করলেন।"

সকল সূফি-দরবেশের মতো হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, রিয়াজত ও মুজাহাদা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। হৃদয়কে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এর বিকল্প নেই। বিনা কারণে মানুষের সংসর্গের পরিবর্তে একাকী জিকির করা উচিৎ। সুফিকে সতর্কতাসহ তাঁর নফসে আম্মারাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে সর্বদা। তার জন্য অনর্থক কথা বলা ও কোনো কিছু করা নিষিদ্ধ।

মূল্যবান বাণী

১. যদি কোনো হৃদয়ে আল্লাহপ্রেমের অগ্নি জ্বলে ওঠে না- তাহলে এটি কিছু নয় শুধুমাত্র মৃত মাংসপিণ্ড ছাড়া। যদি এতে জ্বলন্ত থাকে ইশকে ইলাহীর অগ্নি, তাহলে তা হয়ে ওঠে প্রভুর জ্যোতি প্রতিবিম্ব হওয়ার আয়না।

২. সত্যিকার আল্লাহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষীকে আভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু [গাইরুল্লাহ] থেকে গাফিল থাকতে হবে।

৩. তরকে দুনিয়ার আসল অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার কোনো সম্পদ থাকাসত্ত্বেও এ থেকে হৃদয়কে মুক্ত রাখা।

৪. তোমাদের কেউই সত্যিকার সালিক হতে পারবে না যতক্ষণ না তিনটি গুণাবলীর অধিকারী হবে:

১. আল্লাহর উপর গভীর বিশ্বাস ও ভরসা করা ও দুনিয়ার অসংখ্য বিলাস-সামগ্রীকে প্রত্যাখ্যান করা।

২. সৃষ্টিকর্তার নাম 'আল্লাহ' [ইসমে জাত] সবসময় মুখে ও অন্তরে জপ করা।

৩. সর্বদা বিচারদিবসের কথা স্মরণ করে বার বার আল্লাহর দরবারে গুনাহ মাফির জন্য তাওবাহ করা।

৫. একজন মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার উপাসনা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে করতে হবে।

৬. মানুষকে এটা জরুরি মনে করতে হবে যে, তাঁর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে অনবরত 'আল্লাহ! আল্লাহ!' বলে জিকির করা। এরই মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

-"অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" [সূরা জুমু'আ : ১০]

৭. শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য অল্প খাবার খাওয়া জরুরি।

৮. আত্মার পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা চাই।

৯. ঈমানকে মজবুদ করার উপায় হচ্ছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করে প্রেরণ করা।

১০. দরবেশদের ক্ষেত্রে দুনিয়াবী লাভ ও ক্ষতি কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। ধন-সম্পদের মালিক হলে যেমন খুশি হন না, ঠিক তেমনি গরীব হয়ে গেলেও তারা দুঃখিত হন না।

১১. প্রেমিক ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় বেহেশত, দোযখ, সম্পর্ক ও ভরসা ইত্যাদি সবকিছু।

১২. ধর্মানুরাগে আছে তিনটি জিনিস: ১. দুনিয়ার চাকচিক্যকে প্রত্যাখ্যান করা। ২. আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া। ৩. শুধুমাত্র আখিরাতের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চিন্তায় নিমগ্ন থাকা। এসব গুণাবলী যার মধ্যে নেই সে পরহেজগার নয়।

১৩. মুরিদের জন্য ওয়াজিব হলো জিকির-মুরাকাবা করা, হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া যাকিছু তা পরিত্যাগ করা, মানুষের সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত মেলামেশা না করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকা।

১৪. আল্লাহর জিকির যদি কারোর মধ্যে স্থায়ী না হয়, তাহলে প্রভুপ্রেমের ঘ্রাণও সে পাবে না।

১৫. দেহের নিরাপত্তা অল্প খাবারে নিহীত, আত্মার নিরাপত্তা অল্প ঘুমের মধ্যে নিহীত এবং ধর্মানুরাগের নিরাপত্ত নামাযের মধ্যে নিহীত।

ইন্তিকাল

হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো রহস্যজনকভাবে। বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে, একদিন তাঁর এক শাগরিদ একখানা পত্র নিয়ে আসলেন। পত্রটি হযরতের পুত্র শায়খ সদরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর নিকট হস্তান্তর করে বললেন, "একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার নিকট এ পত্রটি দিয়ে বলেছেন, এটি হযরত বাহাউদ্দিনের নিকট নিয়ে যাও।" পত্রের মধ্যে প্রেরকের ঠিকানা পাঠ করে শায়খ সদরুদ্দিনের মুখখানা মলিন হয়ে গেলো। তিনি এটি নিয়ে গেলেন হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর নিকট। তিনি এটি পাঠ করে সজোরে কাঁদতে লাগলেন।[৭৮] এদিন রাতেই এ মায়াবী ধরার কোল থেকে যুগের এই শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ ও শায়খুল মাশাইখ হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিদায় হয়ে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যু সন ছিলো ৬৬৫ হি. / ১২৬৭ ঈ.। তিনি মুলতানেই সমাহিত আছেন। হে আল্লাহ! আপনার এই ওলির দারাজাতকে আরো উন্নত করুন। তাঁর নেক আমলের ওয়াসিলায় আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আপনার নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত করুন।

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন হযরত শায়খ সাইয়্যিদ জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা তাই পরবর্তীতে এই মহাত্মন সুহরাওয়ার্দি শায়খের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। হে প্রভু! আপনি আমাদেরকে তাওফিক দিন। আপনার ইচ্ছে ও সাহায্য ছাড়া একটি অক্ষরও লিখার শক্তি আমাদের নেই।

[৭৮] অনেকের মতে সম্ভবত এই চিঠিতে হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুসংবাদ ছিলো।

হযরত শায়খ সাইয়্যিদ জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত্যু- ৬৯০ হিজরি, সমাধি- উচ্ পাকিস্তন।)

হযরত শায়খ জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহমাতুল্লাহি একজন বিখ্যাত সুহরাওয়ার্দি শাইখুল-মাশাইখ ছিলেন। তাঁর মুর্শিদ হচ্ছেন ইমামে তরিকত হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

পারিবারিক ঐতিহ্য, জন্ম ও শিক্ষা

হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ সাইয়্যিদ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামের সঙ্গে বুখারী শব্দ যুক্ত হয়েছে জন্মস্থান উজবেকিস্তানের বুখারা শহরে হওয়ায়। তাঁর পূর্বপুরুষ হচ্ছেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় নাতি হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহ আনহু।

হিজরি ৫৯৫ সনে হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তাঁর নাম রাখা হয় জালালুদ্দিন হায়দার। তবে পরবর্তীতে তিনি একাধিক উপাধিতে ভূষিত হন। যেমন, জালাল গঞ্জ, মীর সুরখ (লাল নেতা), শরীফুল্লাহ (আল্লাহর উদারমতি), মীর বুজুর্গ (বড়ো নেতা), মাখদুমুল আজম, জালাল আকবর, আজিমুল্লাহ, শের শাহ (সিংহ বাদশাহ), জালাল আজম ও সুরখ-পশ ইত্যাদি।[৭৯]

তাঁর নামের সঙ্গে 'সুরখ-পশ' [লাল বস্ত্র] থাকার কারণ হলো, তিনি প্রায়ই লালচে রংয়ের একটি সদরিয়া গায়ে পরতেন। হযরতের পিতার নাম ছিলো সাইয়্যিদ আলী মুঈদ। তাঁর দাদার নাম ছিলো সাইয়্যিদ জাফর মুহাম্মদ হুসাইন।

---

[৭৯] 'মারাট-ই-জালালী, এস. কে. এ. বি. হাসানী, ১৯১৮ সং, ইলাহাবাদ।

হযরত বুখারী রাহিমাহুল্লাহর প্রাথমিক শিক্ষার উস্তাদ ছিলেন স্বীয় পিতা আলী মুঈদ। এরপর সাইয়্যিদ শাহ জামাল মুজাররদ কুলাপুরী [আধুনিক ভারতের কুলাপুর মারাঠা রাজ্য] তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নেন। সাত বছর লেখাপড়া করেই তিনি উচ্চতর দ্বীনি ইলম অর্জন করতে সক্ষম হন।

ভ্রমণ

হযরত সুরখ-পশ বুখারী রাহিমাহুল্লাহর জীবন কেটেছে ভ্রমণ করে। তিনি দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতেন। তিনি সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন গোত্রে যেয়ে ইসলাম প্রচার করেছেন, যেমন: সুমরো, সাম্মা, চাদার, সিয়াল, দাহির ও ওয়ারেন ইত্যাদি গোত্র তাঁরই দাওয়াতে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।

বিবাহ ও সন্তানাদি

হযরত বুখারী রাহিমাহুল্লাহর তিনজন স্ত্রী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম সাইয়্যিদা ফাতিমা। তিনি ছিলেন বুখারার সাইয়্যিদ ক্বাসিমের কন্যাসন্তান। আলী ও জাফর নামক দুজন পুত্রসন্তান জন্ম নেন বিবি ফাতিমার গর্ভে। বিবি ফাতিমার মৃত্যু হয় ৬৩৫ হিজরি সনে। হযরত বুখারী তাঁর দুজন সন্তানকে নিয়ে পাঞ্জাবের কাখখার নামক স্থানে এসে বসবাস শুরু করেন।

জালালুদ্দিন বুখারী রাহিমাহুল্লাহ দ্বিতীয়বার বাখরারা নামক স্থানে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া এ স্ত্রীর নাম ছিলো বিবি তাহিরা জোহরা, তিনি ছিলেন সাইয়্যিদ বদরুদ্দিন বাখখারীর কন্যাসন্তান। সাইয়্যিদ বদরুদ্দিনের পিতা ছিলেন সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মক্কী রাহিমাহুল্লাহ।[৮০] দ্বিতীয় এ বিবাহ থেকে হযরত বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আরো দুজন পুত্র সন্তানের পিতা হন। এরা হচ্ছেন সদরুদ্দিন মুহাম্মদ গাউস ও বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ

[৮০] তিনি 'শের সাওয়ার' [সিংহের আরোহী] নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ঈসায়ী ৫৪০ হিজরি সনে মক্কা মুকাররমায়। তাঁর মাতা ছিলেন হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর কন্যাসন্তান। পরিণত বয়সে সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মক্কী রাহিমাহুল্লাহ ইয়ামনে বসবাস করেন। পরে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে সিন্ধুতে হিজরত করতে নির্দেশ দেন। কথিত আছে ৩০ হাজার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তিনি সিন্ধুর বুখখার দখল করেন। এক দীর্ঘ সফল জীবন শেষে ১০৩ বছর বয়সে সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মক্কী রাহিমাহুল্লাহ ৬৪৪ হিজরি সনে বুখখারে ইন্তিকাল করেন। তিনি বুখখার ও সুকখারের মধ্যবর্তী আরাক কেল্লায় সমাহিত আছেন। সূত্র: wikipedia.org

মা'সুম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। মুহাম্মদ গাউসের এক কন্যাসন্তান বিবাহ করেন হযরত জাহানিয়ান জাহানগাশত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[৮১]।

বিবি জুহরার মৃত্যুর পর হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তৃতীয়বারের মতো বিবাহ করেন বিবি ফাতিমা হাবিবা সাইয়্যিদা নাম্নী এক মহিলাকে। তিনি ছিলেন বদরুদ্দিন বুখারীর দ্বিতীয় কন্যাসন্তান। এ বিবাহ থেকে একজন পুত্রসন্তান লাভ করেন হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। এ সন্তানের নাম ছিলো আহমদ কবির রাহিমাহুল্লাহ। তিনিই ছিলেন হযরত জাহানিয়ান জাহানগাশত ও মাখদুম সদরউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার পিতা। বিখ্যাত মঙ্গল যোদ্ধা চেঙ্গিশ খানের এক কন্যাসন্তানকেও তিনি বিবাহ করেছিলেন। নিচে এ ব্যাপারে বর্ণনা তুলে ধরছি।

হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ও চেঙ্গিশ খান[৮২]

হযরত জালালুদ্দিন বুখারী রাহিমাহুল্লাহর ওয়াসিলায় মঙ্গল যোদ্ধা চেঙ্গিশ খান ইসলামে দিক্ষীত হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে। নিচে একটি বর্ণনা তুলে ধরছি।

চেঙ্গিশ খানের সঙ্গে যখন হযরতের সক্ষাত ঘটলো, তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু যোদ্ধা চেঙ্গিশ রাগে জ্বলে ওঠলেন। নির্দেশ দিলেন 'এই মুসলিমকে জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলে দাও!' সুতরাং তার সহযোদ্ধারা হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহকে ধরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলো। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! হযরতের একটি লোমও জ্বললো না- বরং অগ্নিকুণ্ড পরিণত হলো গোলাপ বাগানে। এ কারামত প্রকাশ হওয়ার পর জেঙ্গিশ খান ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হলেন। হযরতের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে নিজের এক কন্যাসন্তানকে তাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে অনুরোধ জানালেন। প্রথমে শায়খ জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ এ বিবাহে নারাজ ছিলেন। কিন্তু একটু পরই তিনি এক গায়েবি আওয়াজ শুনলেন, "তোমার বংশধরগণ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। এরা সবাই হবে

---

[৮১] হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর নাতি হযরত মাখদুম জাহানিয়ান জাহানগাশত রাহিমাহুল্লাহ [১৩০৮-১৩৮৪ ঈ.) একজন সুফি-দরবেশ ছিলেন। তিনি সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শায়খ ছিলেন। ইনশাআল্লাহ! আমরা আশাকরছি তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

[৮২] হযরত জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর অতীতে অনেক লেখালেখি হয়েছে। যেমন: মাজহারই জালালী, আখবারুল আখইয়ার, রওজাতুল আহবাব, মারাইজুল ওয়ালায়াত, মানাক্বিবি কুতবি, সিয়ারুল আক্বতার, সিয়ারুল আরিফীন, মানাক্বিবুল আসফিয়া ইত্যাদি গ্রন্থমালা।

কুতুব।” তিনি বিবাহে রাজী হয়ে গেলেন। সত্যিই তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেক উচ্চ পর্যায়ের ওলির জন্ম হয়েছিল। এরা পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর প্রদেশ, কাচ্, হায়দরাবাদ, গুজরাটসহ সমগ্র ভারতব্যাপী দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগে জড়িত ছিলেন। তাঁদের ওয়াসিলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলমান হয়েছিলেন। তিন-চারটে বিবাহ থেকে হযরত জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ২২ জন পুত্রসন্তানের পিতা হয়েছিলেন। এদের অনেকেই ওলিআল্লাহ ছিলেন।

উচ্ অঞ্চলে আগমন

তখন দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ [১২৪৬-১২৬৬ ঈ.]। এ সময় ৬৪২ হিজরি সনে শায়খ জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তখনকার দেওগড় [উচ্] এলাকায় ভ্রমণে আসেন। মানুষ তাঁর দরবারে এসে দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। দেওগড়ের রাজা দেও সিং এতে খুব রাগান্বিত হন। অনেক চেষ্টা করে এই মহাত্মন সুফি-দরবেশকে ঠেকাতে না পেরে, তিনি শেষ পর্যন্ত মারওয়ারে পালিয়ে যান।

মাখদুম শাহ দৌলা শহীদকে কবুতর উপহার

বর্তমান বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের শাহী মসজিদের পাশে সমাহিত আছেন বিখ্যাত এক ওলি মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ[৮৩]। এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে এই ওলির সাক্ষাৎ হয়। তখন শায়খ জালালুদ্দিন বুখারায় অবস্থান করছিলেন। হযরত মাখদুম শাহ দৌলা রাহিমাহুল্লাহকে শায়খ জালালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ একজোড়া কবুতর উপহার দেন।

শাহজাদপুরে আগমনের পর সেখানকার প্রভাবশালী হিন্দু রাজা যার রাজ্যের সীমানা বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো, খুব রাগান্বিত হন। মাখদুম শাহ ও তাঁর সাথীদেরকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু এ নির্দেশ অমান্য করলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে হযরত মাখদুম শাহসহ সবাই শহীদ হন। শুধুমাত্র খাজা নূর নামক একজন ছাড়া। তিনি পরবর্তীতে সোনারগাঁও এর একজন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। খাজা নূরের কবরও শাহজাদপুরের শাহী মসজিদের পাশে অবস্থিত।

---

[৮৩] এ মহান ওলির জীবন ও কর্মের ওপর খুব বেশি লেখালেখি হয় নি। অনলাইন বাংলাপিডিয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আছে তাঁর সম্পর্কে। দেখুন: http://en.banglapedia.org/index.php?title=Makhdum_Shah_(R)

হযরতের ইন্তিকাল

হযরত জালালুদ্দি বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ৬৪০ হিজরি সনে সিন্ধুর উচে আগমন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন পুত্র বাহাউল হালিম। এখানে একটি খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ মরণশীল। আলমে বরযখের বাসস্থান কবরে একদিন সবাইকে যেতে হবে। নবী-রাসূল-গউস-কুতুব কেউই চিরঞ্জীবী নন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাহ ও ওলি হযরত শায়খ জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহিমাহুল্লাহকেও একদিন নিয়ে যান দুনিয়ার অস্থায়ী জীবন থেকে চিরন্তন জীবনের দিকে। তাঁর ইন্তিকালের সন ছিলো ৬৯০ হিজরি [১২৯০ ঈসায়ী]। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। প্রথমে তাঁকে সমাহিত করা হয় উচ শহরের অদূরে গাগ্ঘার হারকা নদীর তীরে। বেশ পরে বন্যার সময় তাঁর কবর নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়। ফলে কবরটি তুলে নেওয়া হয় কাত্তাল শহরে। এরপর ১০২৭ হিজরি সনে তাঁরই বংশধর এক ওলিআল্লাহ নাসিরুদ্দিনের পুত্র মাখদূম হামিদ রাহিমাহুল্লাহ কবরটি নিয়ে যান উচ্ শহরে। এখানেই তাঁর সর্বশেষ সমাধিস্থল স্থাপিত হয়। বাহারপুরের নবাব বাহাওয়াল খান ২য় ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে কবরের উপর একটি মনোরম ইমারত তৈরি করেন। এর পাশেই একটি মসজিদ আছে।

আমরা আল্লাহর পবিত্র দরবারে আবদার জানাই, হে মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক! আপনি হযরত জালালুদ্দিন সুরখ-পশ বুখারী রাহিমাহুল্লাহকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। তাঁর মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করুন। সংরক্ষণ করুন তাঁর গোপন রহস্যাবলী।

হযরত শায়খ কাজি হামিদুদ্দিন নাগরী রাহামতুল্লাহি আলিইহি
(মৃত্যু- ৬৪১ হিজরি, সমাধি- দিল্লি, ভারত।)

পরিবার, জন্ম ও নামকরণ

তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর। পূর্বপুরুষগণ বাস করতেন ইয়ামনে। এরপর তাঁরা হিজরত করে চলে আসেন কান্দিশের বুরহানপুর। এখান থেকে পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন ভারতের হায়দরাবাদে।

হযরত নাগরী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি। তাঁর জন্মনাম ছিলো মুহাম্মদ। তিনি বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি হামিদুদ্দিন, পিতার নাম আতাউল্লাহ মাহমুদ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর কলম নাম ছিলো হামিদ দরবেশ। জন্মের সময় তাঁর পিতা ছিলেন বুখারার সুলতান।

হযরত হামিদুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পিতার আদুরে সন্তান ছিলেন। বয়স যখন পনেরো মাত্র পিতা মাহমুদ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে সালতানাতের দায়িত্ব দেন। তিনি খুব দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।

জঙ্গলে গমন ও ফকির বেশে বেরিয়ে পড়া

হযরত হামিদুদ্দিন তখন বুখারার সুলতান। হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলো। এতে তিনি এতোই বেশি শোকাহত হলেন যে, রাজপ্রাসাদে অবস্থান করতে পারলেন না। একদিন চলে গেলেন জঙ্গলে। উদ্দেশ্য ছিলো শিকার করবেন। একটি খরগোশের গায়ে তাঁর ছোঁড়া তীর বিদ্ধ হলো। আল্লাহর কী কুদরত! আহত খরগোশটির জবান খুলে গেলো! বললো, “হে আজিজ! আপনি তো আল্লাহর একজন গোলাম। তাহলে কেনো আপনি আমাকে তীর নিক্ষেপ করে আহত করলেন? আপনার প্রভুর সম্মুখে যেয়ে কী জবাব দেবেন?”

তিনি খরগোশটির কথা ও অভিযোগ শুনে একেবারে অবাক-বিস্ময়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসলেন। খরগোশটিকে আহত করায় তিনি আন্তরিকভাবে মর্মাহত হলেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন।

পরদিন ভোরে তিনি বুখারার সবাইকে ডেকে এনে ঘোষণা দিলেন, "আজ থেকে বুখারার সবাই আমার নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে গেলে! সকল গরীব-মিসকিন রাজপ্রাসাদে এসে যতো টাকা আমি কর হিসাবে সংগ্রহ করেছি তা নিয়ে যাও!" এ ঘোষণার পর তিনি একদল দরবেশদের সঙ্গে বের হয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদ থেকে। দরবেশগণ তখন ভ্রমণে ছিলেন, তাঁরা যাচ্ছিলেন কিরমান শহরের উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁদের সফরসঙ্গী হলেন।

হযরত নাগরী রাহিমাহুল্লাহর পিতা তখনো জীবিত। আদুরে সন্তানের বিরহে তিনি মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। সুতরাং তিনিও বুখারা ত্যাগ করে কিরমানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তবে নিজের আদুরে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো না।

খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ

কিরমানের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে পথিমধ্যে হযরত হামিদুদ্দীন নাগরী রাহিমাহুল্লাহর সাক্ষাৎ ঘটে হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে। তিনি তাঁর সাথে দীর্ঘ ১২ বছর কাটিয়ে দিলেন। যাযাবর অবস্থায়ই একদিন পৌঁছুয়ে গেলেন বাগদাদ শরীফে।[৮৪]

হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর দরবারে

হযরত হামিদুদ্দিন নাগরী রাহিমাহুল্লাহ যখন বাগদাদে যান তখন সেখানকার বিখ্যাত শায়খ হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ জীবিত ছিলেন। নাগরী রাহিমাহুল্লাহর মন চাইলো হযরতের মুরিদ হওয়ার। সুতরাং তিনি চলে গেলেন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর দরবারে। বাইআত গ্রহণের পর দীর্ঘ এক বছর পীরের খিদমতে থেকে সুহবত লাভ করলেন। এসময় সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশ মতো তাসাওউফের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে থাকেন কঠোর রিয়াজত মুজাহাদার মাধ্যমে। একই সময় বিখ্যাত চিশতি শায়খ হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী

[৮৪] তারিখে সুফিয়্যায়ে নাগরী, পৃ. ২৮৩।

রাহিমাহুল্লাহও সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে ছিলেন। তিনি ওলিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করার আশায় খুব বেশি সফর করতেন। বাগদাদে থাকাকালে হামিদুদ্দিন নাগরী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। উভয় বুজুর্গ দীর্ঘদিন একই সঙ্গে ভ্রমণও করেছেন। হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁর লেখালেখিতে বলেন, প্রায়ই আমার সফরসঙ্গী থাকতেন হযরত হামিদুদ্দিন নাগরী রাহিমাহুল্লাহ।

খিলাফত লাভ ও মদীনা মুনুওয়ারায় গমন

হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করে কাজী হামিদুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ মদীনা মুনুওয়ারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নূরের শহরে পৌঁছুয়ে অত্যন্ত ভক্তিভরে সালাম জানান পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে যেয়ে। এরপর দীর্ঘ ১ বছর ২ মাস ৭ দিন সেখানে অবস্থান করেন। তিনি কবর শরীফের অতি নিকটেই থাকতেন এবং মসজিদে নববীতে যেয়ে ইবাদত-বন্দেগী করতেন প্রতিনিয়ত। অবশেষে আবেগাপ্লুত হয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বিদায় নেন আলোকিত শহর থেকে।

মক্কা মুকাররমায়

মদীনা শরীফ থেকে দীর্ঘ ৬-৭ দিনের ভ্রমণ শেষে চলে আসেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম শহর মক্কা মুকাররমায়। মসজিদুল হারাম ও বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে গভীর ইবাদত-বন্দেগি-রিয়াজত-মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকেন দীর্ঘ ৩টি বছর। ইতোমধ্যে তিনবার পবিত্র হাজ্জ পালন করেন। এরপর যাত্রা করেন ভারতের রাজধানী দিল্লির উদ্দেশ্যে।

দিল্লিতে স্থায়ীভাবে বসবাস

তখন দিল্লির সুলতান ছিলেন শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৩৬ ঈ.]। হযরত নাগরী রাহিমাহুল্লাহকে সুলতান সাদর অভ্যর্থনা জানান। দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন তাঁর একান্ত বন্ধু হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রাহিমাহুল্লাহ। সুতরাং এ শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন হযরত হামিদুদ্দিন নাগরী রাহিমাহুল্লাহ। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ও প্রিয় বন্ধুর পাশে সমাহিত হন।

চিশতি সম্পর্ক

হযরত কাজি হামিদুদ্দিন নাগরী রাহিমাহুল্লাহ মূলত সুহরাওয়ার্দি তরিকার একজন উচ্চ পর্যায়ের শায়খ ছিলেন। কিন্তু মানুষ তাঁকে চিশতি শায়খ হিসেবেই বেশি সম্মান করতেন। শাইখুল মাশাইখ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা হযরত কুতুবুদ্দিন কাকী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্কই ছিলো এর মূল কারণ। এছাড়া তিনি কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকে চিশতিয়া তরিকায় খিলাফত লাভও করেন।[৮৫]

অপর এক বর্ণনায় জানা যায়, হযরত কাজি হামিদুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর নিকট হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ইলমে শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সিয়ারুল আকতাব কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত হামিদুদ্দিন নাগরী রাহিমাহুল্লাহ হযরত খাজা কতুবুদ্দিন কাকী রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ ছিলেন। খাজা সাহেব তাঁর নিকট ইলমে শরীয়তের ওপর অধ্যয়ন করেন। তবে উস্তাদ হয়েও আধ্যাত্মিক দিক থেকে উচ্চ পর্যায়ে আরোহণকৃত খাজা সাহেবের প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিলো অগাধ। তিনি খাজা সাহেবের খিদমাত করতেন। মানুষ এ ব্যাপারে খুব আশ্চর্যান্বিত হতো ও বলতো, ‘খাজা কুতুবুদ্দিন হচ্ছেন মাশাইখের কুতুব। তাঁর স্তর কাজি হিমিদুদ্দিনের তুলনায় হাজার গুণ উপরে। তিনি তাঁর এক চুল পরিমাণ সমপর্যায়ের নন।’ কাজি নাগরী রাহিমাহুল্লাহ শেষ পর্যন্ত খাজা সাহেবের নিকট থেকে চিশতিয়া তিরিকায় খিলাফত লাভ করেন।[৮৬]

কারামত

খাজা কুতুবুদ্দিন কাকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: কাজি হামিদুদ্দিন এবং আমি একদিন ভ্রমণে বের হই। আমরা একটি নদীর তীরে যেয়ে উপস্থিত হলাম। এসময় আমার খুব খিদে পাচ্ছিল। আমরা বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম একটি বকরি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মুখ কামড়ে ধরে রেখেছে দুটি রুটি। আমাদের সম্মুখে এসে রুটি দুটো রেখে সে চলে গেলো। আমরা মনে করলাম, নিশ্চয়ই এ রুটি দুটো স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। সুতরাং আমরা তাঁর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আমরা এরপর লক্ষ করলাম বিড়ালের মতো বড়ো একটি বিচ্ছু সাতার কেটে নদী পার হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। উভয়ে এ দৃশ্য দেখে মনে করলাম, নিশ্চয় এতে

---

[৮৫] লাতাইফে আশরাফী।

[৮৬] বাযম সুফিয়্যাহ, পৃ. ১১২

কোনো শিক্ষা আছে আমাদের জন্য। বললাম, এসো হামিদুদ্দিন। নদীর ওপারে যাই। দেখি ওখানে কী হচ্ছে। আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের দৃশ্য দেখে নিই। আমরা উভয়ে হাত তুলে দুআ করলাম। নদীর পানি সাথে সাথে শুকিয়ে গেলো! আমরা পায়ে হেটে ওপারে চলে গেলাম। সেখানে যেয়ে দেখি একব্যক্তি বৃক্ষের নীচে ছায়ার মধ্যে ঘুমোচ্ছেন। একটি বিষধর সর্প ফনা তুলে তাঁকে দংশন করতে উদ্যোত হয়ে আছে। কিন্তু সেই বিচ্ছুটি দ্রুত নিকটে যেয়ে সাপটিকে আক্রমণ করলো। সে সাপটিকে মেরে ফেললো। এরপর বিচ্ছুটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। আমরা বুঝতে পারলাম ঘুমন্ত ব্যক্তি নিশ্চয় উচ্চ পর্যায়ের কোনো ওলিআল্লাহ হবেন। এ কারণেই কুদরতী উপায়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করেছেন। আমরা তাই খুব বিনয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত করতে অগ্রসর হলাম। কিন্তু কাছে গিয়ে আশ্চর্য হলাম। লোকটি ছিলো আসলে একজন মদখোর! সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গাছের নিচে ঘুমোচ্ছিল। আমরা ভাবলাম, ওহে প্রভু! তুমি এতোই দয়ালু। তোমার এক নাফরমান বান্দাকেও তুমি এতো মুহাব্বাত করো!

তিনি আরো বলেন, আমরা যখন এ ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছিলাম, এক গায়েবি আওয়াজ আমাদের কর্ণগোচর হলো: "হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি যদি শুধুমাত্র নেককার ও উত্তম বান্দাদের দিকে তাকিয়ে থাকি, তাহলে কে আমার এই মাতাল ও পাপী বান্দাদেরকে নিরাপত্তা দান ও লালন-পালন করবে?" আমরা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে, যখন বৃক্ষের নিচে পড়ে থাকা লোকটির নেশা কেটে গেলো। আমরা তাকে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। সে এতে এতোই লজ্জিত হলো যে, তার চোখ দুটো অশ্রুতে ভিজে যায়। বললো, 'আমি দয়াময় আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করছি আর জীবনে কখনও মদ পান ও পাপকাজ করবো না।' সুবহানাল্লাহ! এ লোকটি পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার একজন ওলি হয়ে যান।[৮৭]

চিরবিদায়

পৃথিবীর জমিনে কেউই চিরঞ্জীবী নয়। বস্তুত সবকিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকবেন শুধু মহান মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা। কোনো কোনো প্রাণী ২০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। ধনুক-মস্তক তিমি মাছ ২১১ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকার রেকর্ড পাওয়া যায়। এখনও পৃথিবীর জমিনে জীবিত কিছু বৃক্ষরাজি আছে যেগুলোর বয়স

[৮৭] রওজায়ে আকতাব, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৭; সিয়ারুল আউলিয়া, পৃ. ৫৮-৫৯।

৩,২৬৬ বছর! তবে মানুষের জীবন তুলনামূলকভাবে অল্পদিনের। এছাড়া সবাই সমপরিমাণ হায়াতও পায় না। মায়ের উদরে থাকা শিশু থেকে শতাধিক বছর পর্যন্ত মানুষের জীবন হতে পারে। অথচ এই মানবদেহ তৈরি করেছেন মহাপ্রভু কী জটিল-কটিন ও কৌশল অবলম্বনে। এর কারণ হচ্ছে, দেহের ভেতর যে মহামূল্যবান সত্তা বাস করবে তা-তো আর সাধারণ কিছু নয়। এটার জন্ম হয়েছিলো সুদূর অতীতে কিন্তু তাঁর মৃত্যু নেই। এ সত্তার নাম আত্মা। আত্মাকে ধরে রাখার জন্যই মানবদেহের এতো জটিল-কঠিন ডিজাইন। সুবহানাল্লাহ!

যাক, আমাদের আলোচিত মহান ওলিআল্লাহ হযরত কাজি হামিদুদ্দিন নাগরী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন **১১**ই রমজান ৬৪**১** হিজরি / **১**২৪৩ ঈসায়ী। তিনি সবেমাত্র তারাবির নামায শেষ করে বিতির নামাযে দাঁড়িয়েছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডাক দিলেন, চলে এসো! ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি সমাহিত হয়েছেন প্রিয় বন্ধু ও শায়খ খাজা কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর কবরপাশে ভারতের রাজধানী দিল্লি শহরে। হে আল্লাহ! আপনি উভয় বুজুর্গের মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করুন।

হযরত শায়খ সদরুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত্যু- ৬৮৪ হিজরি, সমাধি- মুলতান, পাকিস্তান।)

তাঁর নাম হচ্ছে সদরুদ্দিন, পিতার নাম শাইখুল ইসলাম হযরত জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন সুহরাওয়ার্দি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা।

হযরত শায়খ সদরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয় ৫৯৯ হিজরি সনে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত মুলতানে। পিতার ইন্তিকালের পর তিনিই সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার মুলতানে প্রতিষ্ঠিত খানক্বার দায়িত্ব নেন। যুগের অধিকাংশ মাশাইখে ইযাম হযরতের ওপর আস্থাশীল ছিলেন। অনেকে তাঁর মুরিদ হন। সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হযরত মীর হুসাইন সাদাত রাহিমাহুল্লাহ শায়খ সদরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ ছিলেন।

হযরতের বাণী

হযরত সদরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় নি। তবে নিম্নোক্ত বাণীসমূহ তাঁরই বলে স্বীকৃত। কুনুযুল ফাওয়ায়িদ নামক কিতাবে তাঁর এসব বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি এসব কথা নিজের মুরিদদেরকে লিখেছিলেন।

১. হাদিসে কুদসিতে আছে:

لا إله إلا الله حصني، فمن دخله أَمن من عذابي

-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে আমার [আল্লাহর] দূর্গ। যে কেউ এতে প্রবেশ করবে সে আমার শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

এখানে দুটি শব্দ আছে: প্রথমটি হলো ‘হিসন’ [দুর্গ] এবং দ্বিতীয়টি ‘হিসার’। শেষোক্তটির অর্থ হচ্ছে চার-দেওয়াল বেষ্টিত কাঠামো- এটা নিরাপত্তার মধ্যে থাকুক

বা না। হিসন হচ্ছে চার-দেওয়াল বেষ্টিত কাঠামো যা নির্মাণের পর সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তার আওতাভুক্ত করা হয় পাহারার মাধ্যমে।

‘হিসন’ এর আছে তিনটি স্তর। (১) জাহির [প্রকাশ্য], (২) বাতিন [লুকানো] এবং (৩) হাক্বিকাত [নির্যাস]।

হিসন এর প্রকাশ্য বা বাহ্যিক স্তর হলো বান্দা যখন আশা ও ভয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে করে না। এমনকি সমগ্র বিশ্বও যদি তার মিত্র অথবা শত্রুতে পরিণত হোক না কেনো, এগুলো তার কোনো ক্ষতি বা লাভ করার ক্ষমতা রাখে না যদি না আল্লাহর নির্দেশ আসে। এ সম্পর্কে স্বয়ং রাব্বুল আলামিন বলেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ * وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ * يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ * وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

-“আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া, পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত; তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।” [১০ : ১০৭]

হিসনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা হচ্ছে, যখন বান্দার মধ্যে এ উপলব্ধি আসে যে, এ দুনিয়ার সব ধস-সম্পদ ও যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা মূলত অস্থায়ী ও দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু। এ দুনিয়ার কোনো কিছুর মধ্যেই চিরস্থায়ীত্ব, সদাবিরাজমানতা এবং অবিচলতার গুণাগুণ নেই। দুনিয়া ধ্বংসের নির্দেশনা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে মহান প্রভুর পক্ষ থেকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলার বাণী হচ্ছে এই:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

-“ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল।” [৫৫ : ২৬]

এর কারণ হলো, পৃথিবীরই কোনো চিরস্থায়িত্ব কিংবা অবিরামতা নেই। এর ওপর কাউকে জীবিত থাকতে হবে অপরিচিত [মুসাফির] হয়ে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

হিসনের নির্যাস হচ্ছে, বান্দাকে জান্নাত লাভের আশা ও জাহান্নামের শাস্তির ভয়- উভয়টি নিজের অন্তর থেকে মুছে দেওয়া। তাকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর মধ্যে প্রশান্তি উপলব্ধিকে। তাকে অবশ্যই এই আয়াতের ওপর পূর্ণাঙ্গ আস্থাশীল হওয়া চাই:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

-“যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।” [৫৪:৫৫]

অন্য কথায়, তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা’আলার বিশেষ নৈকট্য থেকে প্রশান্তি অনুভব করা চাই। যে মুহূর্তে সে এ উচ্চ স্তরের জন্য যোগ্যতা লাভ করবে, জান্নাত তার নিজ থেকেই তাকে খুঁজবে ও পেছনে লেগে যাবে। অপরদিকে জাহান্নাম তার থেকে পালিয়ে যাবে।

২. তিনি লিখেছেন: আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

-“হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।” [৩৩ : ৪১]

যখন আল্লাহ তা’আলা কাউকে উত্তম কিছু দান করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তখন তিনি তার নাম সালিহীনদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। তখন সে ভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর জিকিরের প্রতি ভীষণ আকর্ষণ বোধ করে। তাঁর হৃদয় জিকির করতে শক্তিশালী হয়। এরপর জলি জিকির করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে খফি জিকিরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন। সুতরাং জিহ্বা নিরব থাকলেও হৃদয় জিকির দ্বারা জাগ্রত থাকে। এটাই হচ্ছে ‘জিকরে কাছির’ [আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা]। কেউ যখন সব ধরনের কপটতা, মুনাফিকী, নাফরমানী ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হয় তখনই তার মধ্যে এরূপ উচ্চ পর্যায়ের জিকির স্থায়ী হতে পারে। এ সম্পর্কে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এসেছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণীর মধ্যে:

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'আমার উম্মার অধিকাংশ মুনাফিকরা হচ্ছে 'কুররা' [জ্ঞানীগণ]'" [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ]

এখানে 'মুনাফিক্ব' দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে মিশ্রণকারী বুঝাচ্ছে। যারা অপরদের সঙ্গে রূহানী সম্পর্ক রাখে। যখন কোনো ব্যক্তি এসব অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাককে প্রেরণা লাভ করে, তখন সে কুচিন্তা ও অনৈতিকতা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়। নিজেকে আধ্যাত্মিক উত্তমতা দ্বারা আলাদাকরণেও সমর্থ হয়। অবশেষে শীঘ্রই এক সময় এসে যায়, যখন জিকরুল্লাহর আলো চমকাতে শুরু করে এবং এর দ্বারা তার অভ্যন্তরীণ নিজ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ সময়ই শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও নফসানী ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা তার থেকে দূরে সরে পড়ে। জিকরুল্লাহর নির্যাসের আলো এতোই বিকশিত হয়ে পড়ে যে, জাকির আল্লাহর দীদার জিকিরের মধ্যে অবলোকন করতে থাকে। এই উচ্চ মাক্বাম ও সর্বোচ্চ দয়া যার ওপর অর্পিত হয়, তারা হচ্ছেন সাহসী ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তিবর্গ। তারা ওসব ব্যক্তির প্রতিও নমনীয় যারা এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। তারা তাদের নিকট নিজেদেরকে সোপর্দ করেন [শাগরিদ হন]। প্রেরণা আসে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে।

ইন্তিকাল

হযরত শায়খ সদরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ মুলতানের খানক্বাহকে দীর্ঘদিন আলোকিত রাখার পর একদিন মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবীর এ নশ্বর জিন্দেগীর ইতি ঘটিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। হিজরি ৬৮৪ সনে তিনি মুলতানেই ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আল্লাহ! আপনার এ প্রিয় বান্দা ও বন্ধুজনকে দান করুন, অফুরন্ত রহমত ও নিয়ামত। তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন জান্নাতুল ফিরদাউসের 'আলা মাক্বামে।

আমরা এবার হযরত শায়খ সদরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর প্রিয় পুত্র ও খলিফা হযরত শায়খ রুকুনুদ্দিন আবুল ফাতাহ রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হযরত শায়খ রুকুনুদ্দিন আবুল ফাতাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৬৯০ হিজরি, সমাধি- মুলতান, পাকিস্তান।)

তাঁর নাম রুকুনুদ্দিন, কুনিয়াত আবুল ফাহাত, পিতার নাম শায়খ সদরুদ্দিন আরিফ ইবনে শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রাহিমাহুল্লাহ। হিজরি ৬৪৯ [১২৫১ ঈ] সনে তিনি মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'শাহ রুকনে আলম' [জগতের খুঁটি] নামেও সুপরিচিত ছিলেন।

হযরত রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর পিতা একজন শাইখুল মাশাইখ ছিলেন। তবে তিনি তরিকতের খিলাফত লাভ করেন স্বীয় দাদা হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে।

হযরত রুকুনুদ্দিন আবুল ফাতাহ রাহিমাহুল্লাহর একজন বিশিষ্ট মুরিদ 'মুনাদা সুফিয়্যাহ' নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে হযরতের জীবন ও কর্মের ওপর বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। এছাড়া 'মাযমা'আল আখইয়ার' গ্রন্থেও হযরত আবুল ফাতাহ রাহিমাহুল্লাহর অনেক 'মালফুজাত' লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর মুরিদদের নিকট প্রেরিত বেশ কিছু পত্রও উক্ত বইয়ে লিখিতভাবে সংরক্ষিত আছে। তরিকতের সালিকীনের উপকারার্থে নিচে তাঁর একটি চিঠি লিপিবদ্ধ করা হলো।

খুব উপকারী একটি পত্র

আমার প্রিয় মুরিদ! তোমাকে দৃঢ়ভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, মানুষ সৃষ্ট হয়েছে দু'টি মৌলিক উপদানের সমন্বয়ে। ১. তার বাহ্যিক রূপ ও ২. তার গুণাবলী। একমাত্র তার গুণাবলী হচ্ছে প্রশংসার যোগ্য। তার বাহ্যিক রূপের কোনো মূল্য নেই। তিনি [আল্লাহ তা'আলা] তোমার আমল ও হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। গুণাবলীর আসল স্বরূপ প্রকাশ হবে আখিরাতের জীবনে। এগুলো তখন বিভিন্ন আকার ধারণ করবে। শুধুমাত্র আখিরাতেই সবকিছুকে বস্ত্রাবৃত করা হবে তাদের মূল আকারে।

বাহ্যিক আকার তখন ব্যক্তি দেখতে পাবে। প্রত্যেককেই যারতার নিজের দৈহিক আকারে পুনরুত্থিত করা হবে কবর থেকে। যেমন বালাম বাউর- তার অনেক

উপাসনা ও রোযা রাখার আমল থাকা সত্ত্বেও, একটি কুকুরের আকারে পুনরুত্থান করা হবে। কারণ তার মধ্যে পাওয়া যাবে কুকুরের গুণাবলী। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয়প্রার্থী।

অনুরূপ, হাশরের দিন জালিম ও বিদ্রোহীরা পুনরুত্থিত হবে নেকড়ে বাঘের অবয়বে। একজন অহঙ্কারী ও উদ্ধত ব্যক্তি পুনরুত্থিত হবে চিতা বাঘের আকার ধারণ করে। একজন কৃপণ ও পরধন লোলুপ ব্যক্তিকে ওঠানো হবে শূকরের সুরতে। এসব ইতর প্রাণীর রূপ ধারণের কারণ হলো বর্ণিত ব্যক্তিদের জাগতিক খাসলত হেতু। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

-"তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম।" [ক্বাফ : ২২]

সুতরাং, যদি না তোমার হৃদয় থেকে ঘৃণ্য দোষগুলো মুছে দাও, তেমোকে ঐ ইতর প্রাণীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

-"তারা চতুষ্পাদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর।" [আ'রাফ : ১৭৯]

হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জিত হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহর দরবারে ভিক্ষা চওয়ার মাধ্যমে। আমার নফস নিষ্পাপ আছে, তা আমি কখনও দাবি করি না। কারণ নফস তো সর্বদাই মানুষকে বিদ্রোহ ও নাফরমানীর দিকে নিয়ে যায়। তবে যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার দয়া বর্ষিত হয়, তারা নফসের কুমন্ত্রণা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। আমার আল্লাহ তো খুব ক্ষমাশীল ও দয়ালু। অন্যকথায়, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানী কারোর ওপর থেকে চলে না যাবে ততক্ষণ সে নিরাপদ থাকবে।

যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ক্ষমাশীলতা পতিত না হয়, তাহলে তোমরা কেউই উত্তম ও পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী হতে পারবে না। আর তাঁর দয়ার

একটি নিদর্শন হলো, ব্যক্তি যখন তার নিজের ভুল-ভ্রান্তির দিকে নজর দেয় ও বুঝতে পারে এগুলো ক্ষতিকর এবং আল্লাহ তা'আলার ঐশি নূরের মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ আপন নূরান্বিত হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে দুনিয়ার সব শক্তি-সামর্থ ও চাকচিক্য আসলে মূল্যহীন। সে তখন দুনিয়াবী কোনো কিছুর পেছনে আর ছুটোছুটি করে না।

যখন কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এ স্তরে উন্নীত হয়, সে পশুবৎ ও নিষ্ঠুর চরিত্রকে ঘৃণা করতে থাকে। এগুলো নিয়েই দুনিয়াদাররা ব্যস্ত। এরূপ স্তরে উন্নীত ঈমানদার ব্যক্তি তখন দুনিয়াদার ব্যক্তিদেরকে একই উন্নত ফিরিশতাসূলভ স্তরে উপনীত হতে ইচ্ছা পোষণ করে। অতএব, নিপীড়ন, ক্রোধ, ঔদ্ধত্য, লোভ ও লোলুপতাকে যথাক্রমে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, বিনয়, উদারতা এবং আত্মবিসর্জন ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। এসব গুণাবলীই হচ্ছে আখিরাতে চিরশান্তি লাভের চাবিকাঠি। আর যারা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে পেতে চায় তাদের স্তর আরো অনেক অনেক উপরে। সে কারণে এরূপ উচ্চ স্তরে আরোহণও আরো বেশি বেশি কঠিন।

تَجَلَّقُوا بِأَجْلَاقِ للهِ

-আল্লাহর গুণাবলীতে নিজের চরিত্রকে গুণান্বিত করো।

এটা একটি স্বীকৃত সত্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছুতে সক্ষম হবে না। একজন কবি বলেন:

> "আমি নিজে নিজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি যে, তুমি ছাড়া আর কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবো না। আমার নফসকে দিয়েছি এক শর্ত: প্রভুকে ছাড়া আর কাউকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মুছে দিতে হবে।"

ভর্ৎসনাপূর্ণ পত্র

'মাজমাউল আখইয়ার' গ্রন্থে আছে যে, শায়খ রুকুনুদ্দিন আবুল ফাতাহ রাহিমাহুল্লাহ একজন মুরিদের নিকট নিম্নে উল্লেখিত পত্রটি লিখেছিলেন:

"হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদিন বললেন: "আমি না কারোর উপকার করেছি, না কারোর ক্ষতি করেছি।" আমীরুল মু'মিনীনের কণ্ঠে একথা শ্রবণ করে উপস্থিত সকলেই অবাক বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। এরপর একজন জিজ্ঞেস

করলেন: “হে মহাত্মন আমীরুল মু’মিনীন! এটা সম্ভব যে, আপনি কারোর অপকার করেন নি- কিন্তু কারোর উপকার করেন নি বলতে কী বুঝাচ্ছেন?” তিনি জবাব দিলেন: “আল্লাহ তা’আলা বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ * وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا * ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

-“যে সৎকাজ করছে, সে নিজের কল্যাণার্থেই তা করছে, আর যে অসৎকাজ করছে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।” [সূরা জাসিয়া : **১৫**]

যাকিছু ভালো বা মন্দ কাজ আমি করেছি, তার জন্য একমাত্র আমাকেই প্রতিফল দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে অন্যদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। একামাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া, যিনি সবকিছু অবগত।”

এর সূত্র ধরেই ওলিআল্লাহ আকাবিরে কিরাম বলেছেন: “প্রত্যেক ব্যক্তির দীনের সর্বোত্তম হাতিয়ার হচ্ছে সততা এবং ধর্মানুরাগ।” একজন কবি বলেন:

> “তুমি খুব ভালোই জানো, যাকিছু তুমি জমিতে বপন করেছো তা-ই ফসল কেটে ঘরে তুলবে। সুতরাং সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে তোমার জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো পরহেজগারীকে বপন করা।”

এসব কথা লেখার পর শায়খ রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ নিম্নে বর্ণিত উপদেশগুলো লিপিবদ্ধ করেন:
“একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এসব উপদেশই দুনিয়া-আখিরাতের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। একমাত্র আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়াতা’আলা কাউকে পরহেজগারী ও উত্তমতার প্রতি আকর্ষিত করেন।”

এরপর শায়খ রাহিমাহুল্লাহ কারোর আমলের কার্যাবেক্ষণ সম্পর্কে উপদেশ দেন নিম্নে উল্লিখিত বাক্যগুলো দ্বারা:
“তোমার যাবতীয় দেহাংশকে শরীয়তসম্মত সকল নিষিদ্ধ ও ঘৃণ্য ক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। দূরে থাকতে হবে নিজেকে ওসব ব্যক্তির সঙ্গ থেকে যারা নিষ্ফলতার মধ্যে জড়িত আছে। যাকিছু দ্বারাই আল্লাহ তা’আলার সঙ্গে ব্যক্তির অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়, তা সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন। অকর্মাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকো। তোমাকে এ

কথাটিও মনে রাখতে হবে: যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নেই, সে অবশ্যই একজন অকর্মা ও মূল্যহীন ব্যক্তি।”

খলিফা

হযরত শায়খ রুকুনুদ্দিন আবুল ফাতাহ রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা ছিলেন শায়খ হামিদুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ।

ইন্তিকাল

যুগশ্রেষ্ঠ সুহরাওয়ার্দি ওলি হযরত রুকুনুদ্দিন আবুল ফাতাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৩৫ হিজরি [১৩৩৫ ঈ.] সনে মুলতানে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। প্রথমে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে দাদার কবরের নিকট সমাহিত করা হয়। পরে তাঁর মরদেহ বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত করেন মোগল সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক [মৃ. ১৩২৫ ঈ]। হযরতের সমাধিস্থলে একটি দৃষ্টিনন্দন ইমারতও নির্মাণ করেন এই মোগল সুলতান। আল্লাহ তা’আলা হযরত রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর দারাজাতকে বুলন্দ করুন।

হযরত শায়খ মুসলেহ উদ্দিন সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৬৯১ হিজরি [১২৯২ ঈ], সমাধি- সিরাজ, ইরান।)

ফার্সি ভাষার বিখ্যাত এ কবির পূর্ণ নাম হলো সরফউদ্দিন আবু মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি শায়খ সাদি নামে সুপরিচিত। সাদি ছিলো তাঁর কলম-নাম। সাদি সিরাজী নামেও তিনি পরিচিত। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ আবদুল্লাহ।

হিজরি ৫৮৯ সালে (১৩৩৩ ঈ.) ইরানের সিরাজ শহরে শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয়। তখনকার দিনে ইরানের রাজধানী ছিলো এই সিরাজ। মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানচর্চারও একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিলো এই শহরটি।

সাদি নামকরণের কারণ

সিরাজ শহরের রাজপরিবারকে বলা হতো 'আতাবক'। হযরত সিরাজী রাহিমাহুল্লাহর পিতা সিরাজের তখনকার আতাবক সাদ জঙ্গী কর্তৃক নিয়োগকৃত রাজকর্মকর্তা ছিলেন। অতি অল্প বয়স থেকেই শায়খ সিরাজী কবিতা রচনার প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। পিতার চাকুরির বদৌলতে তিনি শাসক সাদ জঙ্গীর সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন। সুতরাং কলম-নাম হিসেবে তিনি 'সাদি' ব্যবহার করা শুরু করেন।

বাল্যকাল

শায়খ সাদির পিতা একজন পরহেজগার তাক্বওয়াহ অবলম্বনকারী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং খুব অল্প বয়সেই পুত্র মুসলেহ উদ্দিনকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদান করেন। যেমন: কুরআন, ইবাদত, আধ্যাত্মিক সাধনা ইত্যাদির হাতেকড়ি হয় পিতার নিকটই। পিতার তত্ত্বাবধানে থেকে শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ অল্প বয়সেই অত্যধিক ইবাদত-বন্দেগি ও ধ্যান-ফিকিরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি তাহাজ্জুদের নামাজের প্রতি খুবই আকর্ষিত ছিলেন। পারতপক্ষে তাহাজ্জুদের নামাজ ত্যাগ করতেন না। এছাড়া বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতও ছিলো তাঁর নিত্যদিনের আমলের অন্তর্ভুক্ত। শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেন:

> এক রাতে আমি পিতার সঙ্গে বসা ছিলাম। আমরা পুরো রাতই সজাগ থেকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলাম। একদল সুফি-দরবেশ

আমাদের চতুর্দিকে ঘুমোচ্ছিলেন। আমি পিতাকে বললাম, 'হে পিতা! এদের কেউ তো জেগে ওঠে দুরাকাআত নামাজ আদায় করতেও আগ্রহশীল দেখছি না!' আমার পিতা ভর্ৎসনা করে বললেন, 'হে আমার পুত্র! তুমিও ঘুমিয়ে থাকলে ভালো হতো, তখন তুমি এভাবে অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করতে না!'"

শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ বাগাদাদে যেয়ে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর শিক্ষা শুরু হয় উস্তাদ শায়খ আবদুর রহমান ইবনে জাওযী রাহিমাহুল্লাহর নিকট।

দীর্ঘদিন নিযামিয়ায় অধ্যয়ন শেষে শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেও তিনি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অনুভব করতে থাকেন আধ্যাত্মিক শূন্যতা। তিনি জানতেন এ শূন্যতা পূরণ করার জন্য প্রয়োজন ইলমে তাসাওউফের ওপর চর্চা।

তাসাওউফচর্চা

অত্যন্ত অল্প বয়স থেকে শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ তাসাওউফের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তিনি সুফি-দরবেশদের ভালেবাসতেন এবং তাঁদের কথা, আচার-আচরণ তাঁকে আন্তরিকভাবে প্রশান্তি দান করতো। সুতরাং অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে গাম্ভীর্যতা, মিতাচার ও পরহেজগারীর গুণাবলী প্রবল হয়ে ওঠে। বাগদাদে থাকাকালে একজন আধ্যাত্মিক গুরুর সন্ধানে বেশিদূর তাঁকে যেতে হয় নি। তখন সে যুগের প্রসিদ্ধ শাইখুল মাশাইখ হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদেই বসবাস করছিলেন। সুতরাং হযরত শায়খ সাদি পীর হিসেবে তাঁকেই গ্রহণ করেন।

খিলাফত লাভ

হযরত শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ বেশ কিছুদিন স্বীয় পীর হযরত সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থাকেন। এরপর আধ্যাত্মিক শুদ্ধি লাভের পর সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শায়খ হিসেবে খিলাফত লাভ করেন পীরের নিকট থেকে।

তিন-ত্রিশ

শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ জীবনের ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন জ্ঞানার্জনে, আরো ত্রিশ বছর ভ্রমণে এবং বাকি ত্রিশ বছর লেখালেখি ও একাগ্রতায়। এ নব্বুই বছরের জিন্দেগীই ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

ভ্রমণ

হযরত শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘদিন ভ্রমণের মধ্যে কাটিয়েছেন। তিনি যেসব স্থানে ভ্রমণ করেন তার মধ্যে অন্তর্গত ছিলো এশিয়া মাইনোর, ইরাক, আজারবাইজান, জাযিরাতুল আরব, শাম (সিরিয়া), ফিলিস্তিন, বাইতুল মাক্বদিস, দামেস্ক, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থান। ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় তিনি বেশ কিছুদিন 'সুমনাথ'-এ থেকেছিলেন। তিনি সেখানকার পণ্ডিতদের কাজকর্ম মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করে তাদের ক্রিয়া-কলাপে প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

হযরত শায়খ সাদির সাহিত্যকর্ম

কে না শুনেছেন বিশ্ববিখ্যাত 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তাঁ' কিবাতদ্বয়ের কথা। হযরত শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর এ দুটো গ্রন্থ আজো সমস্ত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হচ্ছে। অসংখ্য সাহিত্যপ্রেমিক এগুলো পাঠ করে উপকৃত হচ্ছেন। এ গ্রন্থদ্বয়ে প্রাঞ্জল ফার্সি ভাষায় শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ সতর্কীকরণ, উপদেশ, প্রাজ্ঞতা ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন। মূল ফার্সি ভাষায় তো বটেই- এমনকি অনূদিত ভাষায়ও এগুলো পাঠ করলে পাঠকের মন-মানসিকতায় যোগান দেয় অপূর্ব সাহিত্যরস ও প্রশান্তি। অনুরূপ বিষয়গুলোর ওপর এরূপ উচ্চমানের লেখালেখি সত্যিই বিরল। বাস্তবে, উভয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উত্তম আখলাক গঠন ও আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেয় অর্জনের দিক-নির্দেশনা। আমরা যদি কিছুটা গভীরভাবে এ গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাবো যে, এতে সত্যিকার অর্থে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা হয়েছে উত্তম আখলাক গঠন ও আত্মশুদ্ধি লাভের উপায়-উপকরণ নিয়ে।

নিচে আমরা শায়খ কামরুজ্জামান সাহেবের গ্রন্থ 'আক্বওয়ালে সালাফ' থেকে এ গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে কিছু হৃদয়োন্মচনী আলোচনা তুলে ধরছি।

শায়খ কামরুজ্জামান বলেন: “আমার মন বলছে গুলিস্তাঁ’র প্রাথমিক অংশের উদ্ধৃতি দিতে- যাতে আছে অসাধারণ আবেগপূর্ণ ও সমন্বিত প্রশংসাসমৃদ্ধ রচনা।”

প্রশংসাসমৃদ্ধ রচনা

শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলার একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ হেতু তাঁরই ইবাদতকে নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন। আর তাঁর শুকরিয়া আদায় করলে তাঁর পক্ষ থেকে আরো বেশি বেশি অনুগ্রহ ও দয়া লাভ বর্ষিত হয়। আমাদেরকে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে শ্বাস গ্রহণ সাহায্য করে। আর আমরা যখন নিঃশ্বাস ফেলি, আমাদের আত্মায় প্রবাহিত হয় আনন্দের স্রোত। সুতরাং প্রতিটি দমে আছে দুটি অনুগ্রহ এবং আমাদের জন্য এটা ওয়াজিব যে, প্রত্যেকটি অনুগ্রহের জন্য শুকরগুজার করতে হবে তাঁর দরবারে। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا * وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

-“হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।” [সাবা : ১৩]

আল্লাহ তা’লার অসংখ্য দয়া ও অনুগ্রহের শুকুরগুজার ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বান্দার পক্ষে অসম্ভব। কারণ আল্লাহ তা’আলা (উক্ত আয়াতে করীমে) বলে দিয়েছেন: হে দাউদ পরিবার! আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা হেতু আমল করো। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প ব্যক্তিরাই কৃতজ্ঞ।

সুতরাং কোনো বান্দা যখন বুঝতে পারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে নিজের অপারগতা এবং সে তাঁর দরবারে এজন্য ক্ষমা চায়, তখন সে তাঁর প্রিয় বান্দায় রূপান্তর হয়ে যায়। বাস্তবে এটুকু ছাড়া কেউ কী তাঁর হক্ব অনুযায়ী শুকুরগুজার করার ক্ষমতা রাখে?

বিভিন্ন ঘটনা

১. পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালীন ঘটনা: শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর বিশেষ আকর্ষণ ছিলো পবিত্র হজ্জ পালন ও হারামাইন শরীফাইনের প্রতি। অধিকাংশ জীবনীকার বলেছেন, তিনি চৌদ্দ বার পবিত্র হজ্জ পায়দল পালন করেছেন। তবে শায়খ সাদি নিজে বলেন নি- তিনি ক’বার হজ্জ করেছিলেন। অবশ্যই পায়দল হজ্জ পালনের ব্যাপারটি বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

গুলিস্তাঁ কিতাবে তিনি বলেন: একদা মক্কা শরীফের নিকটস্থ মরুভূমিতে হাটতে হাটতে আমি এতোই ক্লান্ত হলাম যে, আর এক কদমও অগ্রসর হতে পারছিলাম না। আমি বালুকার ওপর কাত হয়ে বিশ্রাম নিলাম। আমাদের সঙ্গী কাফেলা নেতাকে বললাম, আপনারা চলে যান। আমি এখানেই পড়ে থাকবো। তিনি বললেন:

একজন পায়দল বেচারা আর কতোক্ষণ হাটতে সক্ষম হতে পারে? আমি দ্রুতগামী উটের চেয়েও তাড়াতাড়ি হেটেছি একটি মেদি দেহ নিয়ে। যদি আমার মতো কোনো মেদিদেহের লোক [দীর্ঘদিন হাটার কারণে] পাতলা চিপচিপে হয়ে পড়ে, তাহলে আপনার মতো পাতলা ব্যক্তিতো (হাটতে হাটতে) মারা যাবে!

ও আমার ভাই! মক্কার হারাম শরীফ আমাদের সম্মুখে। ওপরদিকে চোর-ডাকাতরা আমাদের পেছনে লেগে গেছে। আপনি যদি সাহস করে সামান্য আরো একটু অগ্রসর হন তাহলে মাঠের অপরপ্রান্তে পৌঁছুয়ে যাবেন। আপনি যদি এখানে পড়ে থাকেন ও নিদ্রামগ্ন হন তাহলে মউত ছাড়া আর কিছু আপনার সম্মুখে থাকবে না। বলা হয়ে থাকে:

যখন আপনি খোলা মরুভূমিতে ভ্রমণে থাকেন, মন বলে- আহ! যদি ঐ বাবলাবৃক্ষের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়তাম! কিন্তু আপনি তো তখন এ আনন্দ লাভের লালসায় নিজের জীবনও বিসর্জন দিতে পারেন, সেটা ভাববেনই না।[৮৮]

২. একব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছে হজ্জে যাবে নগ্নপদে, নগ্ন-মাথায়। সে কুফা থেকে বহির্গামী একটি কাফেলার সঙ্গী হলো যেটি যাচ্ছিলো হিযাজে। আমি অনুসন্ধান করে জানলাম, লোকটি ছিলো শূন্যহস্ত। তার হাতে একটি টাকাও নেই। এরপরও সে কাফেলার সাথে হেটে চলছিলো প্রেম-মাতাল হালে। সে আগে বাড়ছিলো আর বলছিলো এই কথাগুলো:

আমি না করেছি আরোহণ কোনো উটের পিঠে, না আমি বহন করছি ভারী কিছু উটের মতো। আমি না কোনো বাদশাহ কোনো প্রজাদের ওপরে, না আমি কোনো বাদশাহর গোলাম। না আমি দুঃখিত-পীড়িত

[৮৮] গুলিস্তাঁ দ্রষ্টব্য।

বর্তমান দ্বারা, না আমি চিন্তিত ভবিষ্যতের ভাবনায়। আমি আছি জ্যান্ত
সহজভাবে এবং জীবনকে করে দিচ্ছি অতিবাহিত অতিসহজে।

একজন উট-চালক তার দিকে তাকিয়ে বললো: "হে ফকির! তুমি কোথায় যাচ্ছো? ফিরে যাও! অন্যথায় তুমি ভীষণ কষ্টে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।" এ কথায় সে মোটেই বিচলিত হলো না। হাটতেই থাকে। এ আপাতদৃষ্টিতে কাকতালীয় ঘটনাটির প্রতি লক্ষ করো: যখন কাফেলা নাখলা বনি মাহমুদে যেয়ে হাজির হলো, ঐ ধনাঢ্য উট-চালক চলে গেলো পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চিরতরে। ফকির বেঠা তখন মরদেহের মাথার নিকট দাঁড়িয়ে বললো:

আমি তো কষ্টভোগ করে মরি নি, কিন্তু তুমি মরে গেলে দ্রুতগামী
উঠের সওয়ারী হয়েও।

৩. হযরত শাখ সাদী রাহিমাহুল্লাহ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন: আমার এক হজ্জের ভ্রমণকালে আমি কজন বন্ধু, খাদিম যুবক সুফিদের সঙ্গী হলাম। পথিমধ্যে তারা মাঝে মাঝে হালের অবস্থায় আবৃত্তি করতে থাকে মা'রিফতি কবিতা। কাফেলার একজন বুজুর্গ সদস্য ছিলেন। তিনি তাদেরকে এজন্য কঠোর ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেন। কাফেলা যখন নাকিখ বনি হিলাল নামক স্থানে পৌঁছুলো, তখন স্থানীয় এক আবিসিনীও ছেলে এসে শুরু করলো কবিতা আবৃত্তি। কবিতার কথাগুলো ছিলো হৃদয়-বিদারক ও ভেসে আসছিলো তার সুরের মাঝ থেকে ভীষণ যন্ত্রণার ছাপ। আকাশে মুক্তভাবে উড়ন্ত পাখিগুলোও থেমে যাচ্ছিলো সুরের লহরীতে। আমরা দেখলাম ঐ তিরস্কারকারী বুজুর্গের উটনী নৃত্যু শুরু করে দিয়েছে।

বুজুর্গ উটনীর পিঠ থেকে মাটিতে নেমে গেলেন। সাথে সাথে উটনী ছুটে ছললো মরুভূমির দিকে!

৪. শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন: আমরা হিযাজের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে কাফেলার মধ্যে একজন বুজুর্গ ছিলেন যার পরনে ছিলো ত্যানা। মিনায় কুরবানী দেওয়ার জন্য একজন ধনাঢ্য আরব ব্যক্তি তাকে ১০০ দিনার দান করলেন। এরপর ভ্রমণকালে একদল বনি কুফাজার ডাকাত আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের নিকট যা-ই ছিলো, তারা সব লুট করে নিয়ে যায়। কাফেলার সকল সদস্য সর্বস্ব হারিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারা হতাশায় চিল্লাচিল্লি শুরু করলেন। কিন্তু

ত্যানাবস্ত্র পরিহিত ঐ বুজুর্গ এতে মোটেই বিচলিত হলেন না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো কিছুই হয় নি! আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "হয়তো আপনার কাছ থেকে ডাকাতরা কেনো টাকা নেয় নি?" তিনি জবাব দিলেন, "তারা অবশ্যই নিয়েছে! কিন্তু এ ব্যাপারে আমার মনে কেনো ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় নি- কারণ আমি এ টাকার প্রতি কেনো আকর্ষণ বোধ করি নি।"

তোমার অন্তরকে কোনো কিছুর প্রতি জড়িয়ে রেখো না
না জড়িয়ে রাখো কারোর প্রতি।
ভাই! যখন তুমি জড়িয়ে যাবে তখন
এ থেকে আলাদা হয়ে গেলে- সইতে যে কষ্ট লাগবে।

৫. তিনি আরো লিখেছেন: আমরা এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ পেলাম। সে তার পুত্রকে বলছিলো:

يا بــني، إنك مسئـول يـوم القيامة ماذا اكتسبت ولا يـقال بمن انـتسْ

"হে আমার প্রিয় সন্তান! রোজ কিয়ামতে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যাকিছু অর্জন করেছো সে সম্পর্কে, তুমি (কোন বংশের সঙ্গে) কোথায় অধিভুক্ত ছিলে, সেটা জিজ্ঞেস করা হবে না।"

মানুষ কাবার গিলাফে চুমো খায়। এতে এটি তার নির্মাতা রেশমগুটি দ্বারা অতিরিক্ত মর্যাদা কিংবা সম্মানপ্রাপ্ত হলো না। বরং এটি মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে সম্মানিত বস্তুকে (কাবা শরীফ) জড়িয়ে রাখার কারণে।

৬. গুলিস্তাঁর সপ্তম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন: এক বছর পায়দল হজ্জে গমনের সময় যাত্রীদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। এ ভ্রমণকালে আমিও একজন পায়দল হজ্জযাত্রী ছিলাম। মূল কথা হলো, আমরা সবাই ঝগড়ায় জড়িত হয়ে পড়ি, অনেক গোনাহ করে ফেলি। কাফেলার একজন যাত্রী উঠের পিঠে বসা ছিলেন। তিনি আমাদের ঝগড়া-ঝাটি দেখছিলেন। আমাদেরকে ডেকে বললেন: "যখন কোনো হাতী চৌকুপি নকশাখচিত গালিচার ওপর পায়দল হেটে যায়, তখন আগের থেকে বেশি শান্ত থাকে। কিন্তু এসব হাজযাত্রী নগ্নপায়ে বিরাট দূরত্ব পাড়ি দিয়েও আগের থেকেও আরো বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে!

ওসব ঝগড়ায় লিপ্ত হজ্জযাত্রীর প্রতি আমার এ বার্তা পৌঁছুয়ে দাও
মানুষকে হত্যা ও ধ্বংস করো, ক্ষতিসাধন করো আল্লাহর সৃষ্টিতে,

ওদের বলো: 'তোমরা হজ্জযাত্রী নও! বরং হজ্জযাত্রী হচ্ছে তোমাদের
উটগুলো
কারণ, এসব বেচারা জন্তু কাটার বেদনা সয়েও ভারী বোঝা বহন করে।

৭. হযরত শায়খ সাদী রাহিমাহুল্লাহর হজ্জের ভ্রমণকালীন সর্বাধিক হৃদয়বিদারক ও ভয়ঙ্কর কাহিনী হচ্ছে এই:

আমি একজন সুফিকে দেখতে পেলাম কাবার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে নিজের মাথা নিজেই বুলাচ্ছেন। তাঁর চোখদুটো অশ্রুসজল। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছিলো এ কথাগুলো: "হে মহান করুণাময় ও ক্ষমাশীল! আপনি সর্বাধিক জ্ঞাত যে, একজন জালিম ও জাহিল লোক ভুলত্রুটি ও অপরিপক্ক আমল ছাড়া আর কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।"

আমার মাঝে না আছে আনুগত্যতা ও না আছে সঠিক আমল
যদ্দারা আমি পেতে পারি কিছুটা সবলতা,
সুতরাং তোমার সকাশে আমার দুর্বলতা হেতু
শুধু উপস্থাপন করছি ক্ষমাপ্রার্থনা।
পাপিরা তাওবাহ করে পাপের জন্যে
আর আ'রিফরা ক্ষমা চায়,
তাদের আমলের মধ্যে ত্রুটি হেতু।

অতিশয় আকুল উপাসকরা নিজেদের আমলের বদলা পেতে আবেদন জানায়। ব্যবসায়ীরা পণ্যের বিনিময়ে মূল্য চায়। কিন্তু আমি যে এক মূল্যহীন গোলাম। আমি এসেছি শুধু একটুকু আশা বুকে নিয়ে, আমার তো কোনো ভালো আমল নেই। আমি তোমার দরবারে এসেছি ভিক্ষা চাইতে। আমি আসি নি বাণিজ্য করতে।

اِصْنَعْ لِيْ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَـفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ

-আমাদের জন্য নিজের দয়া থেকে যাকিছু করার করুন। তবে আমাদের (পাপের) প্রাপ্য যাকিছু তা আপনি করবেন না।

যদি তুমি চাও গো প্রভু আমাদেরকে করে দিতে ধ্বংস; আর যদি তুমি চাও হে ক্ষমাশীল, আমাদারেকে ক্ষমা করেও দিতে পারো। আমাদের মস্তক ও মুখাবয়ব তব সকাশে অবনত। গোলাম তো নির্দেশ দেওয়ার

ক্ষমতা রাখে না। যাকিছু নির্দেশ তুমি দেবে তাতেই আমরা খুশি, যাকিছু তোমার সন্তুষ্টির কারণ তাতেই আমরা রাজি।

শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি দেখলাম একজন ভিক্ষুক বাইতুল্লাহ শরীফের দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করছে। তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছিলো এই হৃদয়নিংড়ানো কথাগুলো: "ও প্রভু! আমার টুটাফাটা আমল ও আনুগত্যকে কবুল করার জন্য আমি তোমাকে আবদার জানাচ্ছি না। তোমার দরবারে আমার একমাত্র আবদার হচ্ছে এই: আমার পাপের মাঝখানে একটিমাত্র মার্জনার রেখা টেনে দাও।"

৮. বুস্তাঁর একস্থানে শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: একজন হাজ্জী গজদন্তের তৈরি একটি চিরুনী আমাকে দান করলেন। আমি জানতে পেরেছি, এ লোকটি একদা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলো। এমনকি আমাকে কুকুর বলে গালি দেয়। একথা মনে পড়তেই আমি চিরুনীখানা তার প্রতি ছুড়ে ফেললাম। বললাম, 'এ হাড্ডি টুকরোর আমার কেনো প্রয়োজন নেই। আর কখনও আমাকে কুকুর বলে গালি দেবে না। আমি হয়তো শিরকা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি, তাই বলে এটা ভেবোনা যে, একজন মাংশাসী কর্তৃক নিজেকে অপমানিত হওয়া সহ্য করবো।[৮৯]

৯. বেদনাতুর মুনাজাত: বুস্তাঁর দশম অধ্যায়ে শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ একজন উন্মাদ হজ্জযাত্রীর কণ্ঠে উচ্চারিত বেদনাতুর ও হৃদয়বিদারক একটি মুনাজাত লিপিবদ্ধ করেছেন। যে কেউ এটি শুনবে, তার চোখ অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারবে না। মূল ফার্সি ভাষায় লিখিত এ দু'আটি অপূর্ব। এখানে আমরা যেটকু সম্ভব ভাবার্থ সরল বাংলায় তুলে ধরছি পাঠকদের জন্য। এ দুআর অনুসরণে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করার তাওফিক কামনা করছি যাতে অনুরূপভাবে তাঁর নিকট আবদার জানাতে সক্ষম হই।

শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি যখন হারাম শরীফের ভেতর এক পাগলের দু'আ শ্রবণ করলাম তখন আমার সমস্ত দেহের মধ্যে শুরু হয়ে যায় কম্পন।

[৮৯] বুস্তাঁ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

লোকটির চোখ থেকে অশ্রু ঝরে বুক ভিজে যাচ্ছিলো। সে কাঁদতে কাঁদতে মহান দয়াময়ের নিকট আবদার জানাচ্ছিলো:

“হে প্রভু! আমাকে ধরাশায়ী হতে দিয়ো না, কারণ কেউ আমার নেই, যে আমার হাতে ধরবে! তুমি যদি আমাকে করুণার সাথে ডাক দাও কিংবা তোমার দরোজা থেকে তাড়িয়ে দাও- উভয় ক্ষেত্রে আমি অন্য কারোর সম্মুখে আমার মাথা নতো করবো না।

হে প্রভু! তুমি তো জানো আমি নিঃস্ব ও নিরুপায়। আমার নিজের নফসে আম্মারার তোষামোদির মাঝে আমি বিলুপ্ত হয়ে গেছি। এই ভীষণ বিদ্রোহী নফস এমন এক পথে চলে তার রাজত্ব কায়েম করেছে- যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে আমার বুদ্ধিক্ষমতা।

কে আছে এমন, যে তার নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে? পিপীলিকা কী কখনো চিতাবাঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে?

ওহে আমার প্রভু! তোমার রাস্তায় যারা আছেন তাঁদের ওয়াসিলায় আমাকে দান করুন সীরাতে মুস্তাক্বিম। ঐ দুটি দুশমন (নফস ও শয়তান) থেকে বাঁচতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

ওহ আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও অনন্য অসীম নিরুপম সিফাতসমূহের ওয়াসিলায়, এই মহান হজ্জের মওসুমে লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত বাইতুল্লাহর হজ্জযাত্রী আপনার পাগলদের ‘লাব্বাইক’ ডাকের ওয়াসিলায়, মদীনা মুনুওয়ারায় কবর শরীফে শায়িতজন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওয়াসিলায়, ওসব মুজাহিদীন যারা উন্মুক্ত তরবারি হাতে ময়দানে থাকেন ও শত্রুদেরকে ‘নারীদের’ সঙ্গে তুলনা করেন, তাঁদের ওয়াসিলায়, সুফি-দরবেশদের অলঙ্কৃত ইবাদত-বন্দেগীর ওয়াসিলায়, যৌবনোদ্দীপ্ত যুবকদের সত্যবাদিতার ওয়াসিলায়, একটিমাত্র শ্বাসের

মধ্যকার দুর্ভাগ্য থেকে আমাকে দুবার ভিক্ষা চাওয়া থেকে পরিত্রাণ দিন।[৯০]

হে মহান! যেসব বস্তুর দিকে তাকানো আমার জন্য না-জায়েয, সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে আমার চোখযুগল ফিরিয়ে রাখো। তোমার অপছন্দ কোনো কাজ করার শক্তি আমাকে দেবে না।

হে প্রভু! তোমার এ মহাবিশ্বের মাঝে আমি একটিমাত্র ঝাররা (কণা) ছাড়া আর কিছু নয়। অন্ধকারের মাঝে আমার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বে কোনো পার্থক্য নেই- উভয়টি সমান।

তোমার দয়ার আপ্তাবের একটিমাত্র অংশু আমার জন্য যথেষ্ট। কারণ, আমাকে তো তোমার পক্ষ থেকে দানকৃত এ অংশু ছাড়া কেউ দেখতেই পাবে না।

হে প্রভু দয়াময়! তুমি যদি স্বীয় ইনসাফ ও সমধিকার দ্বারা কবজা করে নাও, আমি তোমার দরবারে ভিক্ষা চাইবো- কারণ, তোমার ক্ষমাশীলতার মাঝে এরূপ কেনো অঙ্গীকার নেই।[৯১]

হে আল্লাহ! তোমার এ দরোজা থেকে আমাকে বিফলমনোরথে ফিরিয়ে দিয়ো না। কারণ আর অপর কোনো দরোজা নেই যেথায় আমি যেতে পারি।

যদিও আমি কিছুদিনের জন্য অজ্ঞতা ও অপরিপক্কতা হেতু গাফিলতির মধ্যে থেকে থাকি, এখন দরোজাটি তুমি আমার জন্য বন্ধ করো না, প্রভু হে! কারণ আমি তো নিজেকে এখানে উপস্থিত করেছি।

---

[৯০] বাস্তবে এটা তাওহীদের হাক্বিক্বাত উন্মোচনের জন্য দুআ। একটি শ্বাসের মধ্যে দুজনের স্থান নেই। অন্য কথায়, দুর্ভাগ্যে পতিতাবস্থায়ও তাওহীদের ওপর অটল থাকতে হবে- এটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। - আক্বওয়ালে সালাফ।

[৯১] অর্থাৎ, তোমার ক্ষমাশীলতা এসেছে তোমার রাগের পূর্বে।

ওহ দয়াময়! আমার লজ্জাজনক অপরাধের কারণ হেতু কী অজুহাত দিতে পারি- শুধুমাত্র তোমার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ছাড়া?

ওহ অসীম ধনাঢ্য মহাপ্রভু! আমি গবীর-নিঃস্ব! আমাকে আমার পাপের দরুণ কব্জা করবেন না। একজন ধনী লোকের দয়া তো গরীবের ওপরই নিপতিত হয়।

আমার দুর্বল অবস্থার ওপর কীভাবে কাঁদবো? তবে আমি দুর্বল হলেও যাঁর ওপর ভরসা করি তিনি তো সর্বক্ষমতার অধিকারী!

ও আল্লাহ! আমি আমার অঙ্গীকার গাফিলতির কারণে ভেঙ্গে ফেলেছি। আমার প্রচেষ্টার শক্তিমত্তা কী-ই বা প্রর্দশনে সক্ষম তবো নির্দেশনার সম্মুখে?

আমার পরিকল্পনা দ্বারা কিছুই অর্জন করতে পারবো না। হে প্রভু দয়াময়! এ ব্যাপারটিই কী যথেষ্ট নয় আমাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য?

প্রভু গো আমার! যাকিছু আমি করেছি, তুমি তা আবর্জনায় ফেলে দিয়েছো। আমি কীভাবে তোমার পবিত্রতার সম্মুখে দাঁড়াতে পারি?

হে প্রভু! তোমার নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে কখনও মুক্ত করতে পারবো না। কারণ তোমার এ নিয়ন্ত্রণ তো আমার ওপর স্বয়ংক্রিয় আছে।”[৯২]

হযরত শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর বুস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ হচ্ছে মা’রিফাতের সাগর ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার মহামূল্যবান কোষাগার। যুগ যুগ ধরে ফার্সি সাহিত্যপ্রেমীরা এ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন অমূল্য সাহিত্যরসপূর্ণ রত্নালঙ্কার। তরীকতের সালিকরা এতে খুঁজে পান সীরাতে মুস্তাক্বিমে চলার দিক-নির্দেশনা। কালজয়ী এ গ্রন্থদ্বয় থেকে রোজ কিয়ামত

[৯২] সুবহানাল্লাহ! হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কী সুন্দরই না বলেছেন, “শায়খ সাদির এ কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিৎ।” -আক্বওয়ালে সালাফ।

পর্যন্ত গণনাতীত বিদগ্ধ আত্মাসমূহ গ্রহণ করতে থাকবে জ্ঞান-প্রজ্ঞার মূল্যবান খনিজসম্পদ ও হৃদয়োন্মুচনী উপদেশসমূহ। কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ইচ্ছে থাকাসত্ত্বেও এ দুটো মহামূল্যবান গ্রন্থ থেকে অতিরিক্ত আর কিছু লিখতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত সবার নিকট। তবে সুখবর হচ্ছে, উভয় কিতাবের অনুবাদ বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় হয়েছে। আগ্রহী পাঠকরা চাইলে কিতাব দুটো অধ্যয়ন করতে পারবেন সহজেই। এ প্রসঙ্গে মুসলিহুল উম্মাত হযরত মাওলানা ওয়াসিউল্লাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। তিনি প্রায়ই নিম্নোক্ত কাহিনীটি তুলে ধরতেন:
“আমি একজন আরব বাদশাহ সম্পর্কে শুনেছি যে, তিনি তার বাইতুল মালের উজিরকে বলেন: ‘ওসব কর্মীদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করে দাও- কারণ, তারা সব সময় আমার নির্দেশ পালনে অপেক্ষারত থাকে। একই সময়, অপর কর্মীরা সময় কাটায় খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনে। তারা আমার নির্দেশ পালনে খুবই অলস।’

এক বুজুর্গ যখন ব্যাপারটি সম্পর্কে জানলেন, তাঁর কণ্ঠ থেকে সাথে সাথে উচ্চস্বরে এক হৃদয়বিদারক চিৎকার ধ্বনিত হলো। লোকজন ছুটে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কী দেখেছেন, শায়খ? কিসের জন্য এতো উচ্চস্বরে চিৎকার দিলেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আল্লাহ তা’আলার দরবারে উপস্থিত তাঁর বান্দাদের অবস্থা ঠিক অনুরূপ (বাদশাহ যাদের বেতন-ভাতা বাড়ালেন)।’

দুটি দিনের জন্য যদি কেউ বাদশার খিদমতে থাকে
তৃতীয় দিনের আগমনক্ষণে অবশ্যই বাদশাহ নামদার
এ গোলামের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন।

আমি আশাকরি মহান প্রভু তাঁর একান্ত অনুগত বান্দাদেরকে স্বীয় নৈকট্য দান থেকে বঞ্চিত করবেন না।”

মূল্যবান বাণী

১. প্রথমেই আমরা শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর কয়েকটি পংক্তি তুলে ধরছি। এসব কবিতা মূলত তাওহিদ সম্পর্কে মূল্যবান বাণী।

(ক)
যদি মানুষ তোমাকে যাতনায় ফেলে, দুঃখিত হয়ো না

নিজেকে সান্ত্বনা দাও- আরাম ও আঘাত বাস্তবে মানুষ থেকে আসে না।

(খ)
বন্ধুত্ব ও শত্রুতা আল্লাহ থেকে আসে বলে চিবেচনা করো
কারণ, শুধু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন শত্রু ও মিত্র উভয়ের হৃদয়।

(গ)
যদি তুমি জ্ঞাত থাকো, কোনো বিশেষ সংবাদ হৃদয়ে বেদনা দেবে
চুপ হয়ে যাও (এটা উচ্চরণ করো না), অপরকে এটা বলতে দাও।
হে বুলবুলি! গুলবাগের সুসংবাদ আমাদেরে বলো-
আর যতো দুঃসংবাদ- পেঁচার জন্য রেখে দাও।[৯৩]

২. সুফিদের বিশুদ্ধ পথ: শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

আমি শুনেছি, আল্লাহর ওলিরা নিজেদের শত্রুদের হৃদয়কেও সংকোচন করেন নি। তাহলে, তুমি কীভাবে তাঁদের স্তরে উন্নীত হবে- যদি তুমি বন্ধুদের সাথেও বিতর্কে জড়িয়ে ঝগড়া করো?

৩. সত্যিকার ভালোবাসার স্বরূপ: তিনি বলেন:

সত্যিকার আনুগত্যশীল গোলামদের ভালোবাসা নৈকট্য ও দূরত্ব উভয় ক্ষেত্রেই সমান থাকে। অনুপস্থিতিতে তারা কখনো তোমার ত্রুটি খুঁজবে না। না তারা উপস্থিতিতে একেবারে অতিআনুগত্যতা প্রদর্শন করবে।

অপরদিকে (স্বার্থপর বন্ধুত্ব হচ্ছে):

সে যখন তোমার সম্মুখে আসবে, সে নিঃস্ব আনুগত্যশীল বকরির মতো। যখন সে তোমার পেছনে যাবে তখন সে ভয়ঙ্কর নেকড়ের মতো হিংস্র।

লক্ষণীয়: *এ যুগের বন্ধুত্বের স্বরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে। একে ‘মুনাফিকী’ বলে। এখন এটা এতো বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, যুগের মুদ্রাই যেনো এ মুনাফিকী! শত্রু ও মিত্রকে আলাদাকরণ এখন প্রায় অসম্ভব। আপনার*

---

[৯৩] গুলিস্তাঁ - অধ্যায় ৮, পৃ. ২১৯।

উপস্থিতিতে দেখবেন কেউ খুব বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব-কণ্ঠে কথা বলছে। একইসময় তার মনে কিন্তু লুকানো আছে আপনার প্রতি অশুভ কামনা ও বিদ্বেষ। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তরা এই মুনাফিকী রোগ থেকে মুক্ত। আমরা তাঁর দরবারে আশ্রয় কামনা করি।

৪. তাসাওউফের বাস্তবতা:

কিছু লোক শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন: 'তাসাওউফের বাস্তবতা কী?' তিনি জবাব দিলেন, "অতীতকালে একদল লোক ছিলেন, যাদেরকে বাহ্যিক দিক থেকে দেখেতে মনে হতো তারা ভীষণভাবে মর্মপীড়িত। বাস্তবে আন্তরিকভাবে তারা ছিলেন অত্যন্ত প্রশান্ত-প্রসন্ন। কিন্তু এ যুগে আমরা দেখতে পাই অনেক লোক বাহ্যিকভাবে খুবই শান্ত-শিষ্ট মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তারা আভ্যন্তরীণভাবে ভীষণ মর্মপীড়িত।

> তোমার হৃদয় যখন নিরুদ্দেশ হয়ে যাযাবর থাকে সর্বদা
> তুমি কখনো পারবে না হৃদয়কে নীরব-নির্জনতায় থেকে পবিত্র করতে।
> কিন্তু তুমি যদি মালিক হও টাকা-কড়ি, ক্ষমতা-ব্যবসা ও সবকিছুর-
> একই সময় তোমার হৃদয়টি ধ্যানস্থ থাকে আল্লাহর প্রতি-
> তাহলে তুমি সত্যিই নির্জন ও একাকী আছো প্রভুর সাথে।

শানিত-দন্তের চিতাবাঘের জন্য আক্ষেপ অনুভব করা আর বকরির পালের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে সামর্থবোধক।"[৯৪]

শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর প্রতি পীরের উপদেশ

হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ প্রিয় মুরিদকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপদেশ প্রদান করেন। শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে বলেন: "আমার পীরজাদা হযরত শিহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ সমুদ্রে ভ্রমণকালে আমাকে দুটি উপদেশ দেন:

১. অতিমাত্রায় আত্মগর্ব ও অহঙ্কার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো।

---

[৯৪] এ বাক্যটির মাধ্যমে অন্যায় নির্যাতনের অবজ্ঞেয়তা ও নির্যাতনকে সহায়তার ঘৃণ্যতা ফুটে ওঠেছে। আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয়প্রার্থী।

২. অপরের প্রতি কখনো কুদৃষ্টিপাত করো না।[৯৫]

জ্ঞানের সঙ্গে উত্তম চরিত্রের যোগসূত্র

হযরত সাদি রাহিমাহুল্লাহ গুলিস্তাঁয় একটি শ্লোকে লিখেন:

একটি মাত্র দিবসের আমল থেকে ব্যক্তির চরিত্রকে মাপা যাবে,
একই সময় জানা যাবে তার জ্ঞানের স্তরকেও।

গুলিস্তাঁর এ মহামূল্যবান শ্লোকটি থেকে এ যুগের মানুষ আরো বেশি উপকৃত হতে পারেন। এ যুগের মানুষের অবস্থা সত্যিই করুণ। উক্ত শ্লোকের আলোকে আমরা নিজেদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে লেগে গেলে বিরাট ফায়দা হাসিল হবে নিঃসন্দেহে। এ কথাগুলো দ্বারা যে কেনো সত্যান্বেষী উৎসাহ-উদ্দীপনা পাবেন- তা তো স্পষ্ট।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের হৃদয়-মনের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করা জরুরি। আভ্যন্তরীণ অবস্থার পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান না চালালে সত্যিকার অর্থে 'তাযকিয়ায়ে নফস' অর্জন সম্ভব নয়।[৯৬] অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থার প্রতি ধ্যানস্থ হয়ে দেখুন- আপনি অনেক ব্যাপার আবিষ্কার করে চমকিত হয়ে ওঠবেন। উৎকণ্ঠিত হবেন নিজের মধ্যে লুকানো অসংখ্য আবর্জনা দেখে। একই সময় জ্ঞান-প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের গভীরতা কতটুকু তা-ও নিরুপন করতে হবে। যে পরিমাণ জ্ঞান আমরা ধারণ করি তার স্বরূপ, সত্যসিদ্ধতা ও বুঝ কতটুকু আছে তা কী কখনও গবেষণা করে দেখেছি? আমাদের অভ্যন্তর যখন নূরান্বিত হয়ে ওঠবে তখনই সবকিছু উন্মোচন হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহর দরবারে আবদার জানাই- তিনি যেনো আমাদের ভেতর-বাইর হাক্বিকাতের নূরা দ্বারা নূরান্বিত করে তুলেন।

---

[৯৫] সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব দুটি বাক্য! এ দুটো কথা প্রত্যেকের হৃদয়ে খোদাই করে রাখা উচিৎ। এর ওপর দৃঢ়পদ থাকাই হচ্ছে তাসাওউফ- বাস্তবে এটাই হচ্ছে এ রাস্তার আত্মা ও নির্যাস!

[৯৬] আত্মানুসন্ধান হচ্ছে তাসাওউফের একটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল। নিজের মধ্যে দোষ-ত্রুটি, আমল-ঈমানের ঘাটতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে আল্লাহপ্রাপ্তি তথা মা'রিফাত লাভের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গাঢ় পর্দা বা বাঁধা। এজন্য বলা হয়ে থাকে: "মান আ'রাফা নাফসাহু - ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু" - যে নিজেকে জেনে নিয়েছে, সে তার প্রভুকেও জেনে নিয়েছে। এ কালজয়ী বাণীর দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্যে: নিজেকে জানো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করে। এরপর যতো ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিষ্কার হবে তা অপসারণের সাধনায় লেগে যাও। সফল হতে পারলে, দেখবে হাক্বিক্বাতের নূর তোমার মধ্যে স্থায়ী হয়ে যাবে- আল্লাহর পরিচিতি লাভে ধন্য হবে। -গ্রন্থকার

হযরত মাসিহুল উম্মাত মাওলানা শাহ ওয়াসিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ উক্ত শ্লোকটি প্রায়ই আবৃতি করে বলতেন:

> "আমরা অপরের প্রতি দোষারোপ করতাম। কিন্তু যখনই আমাদের চক্ষু খুলে গেলো, দেখতে পেলাম আমাদের হৃদয় ভুল-ত্রুটি সংরক্ষণের গোদামে পরিণত হয়ে গেছে!"[৯৭]

অনুরূপ বাণী এসেছে এ যুগের আরেক বুজুর্গ হযরত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ থেকে:

> "আমাদের অন্তর চক্ষু খুলে যাওয়ার পর থেকে
> আমরা নিজেদের বাহ্যিক চক্ষুর স্তর থেকে নিচে নেমে গেছি।"[৯৮]

মুর্শিদে বরহক্ব কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলতেন:

> "অন্তরের চোখ উন্মোচনের উপায় হচ্ছে রাসূলের [সা.] ইত্তিবাহ করা ও নিয়মিত জিকির-আজকার আদায় করা। এভাবে অন্তর চক্ষু খুলে যাওয়ার নামই হচ্ছে 'কাশফ'।"

আল্লাহ চাহে তো যদি আপনার অন্তর চক্ষু সত্যিই উন্মোচন হয়ে পড়ে, তাহলে আপনি হয়ে যেতে পারেন একজন কাশফওয়ালা হাক্বিক্বাতের অধিকারী ব্যক্তি। এ স্তরে উপনীত হলে নিজের ও অপরের বাস্তব মূল্য আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। আপনি তখন দেখতে পাবেন, নিজের ও অপরদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বাস্তবে নিষ্কলুষ নয়। কখনো পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টি লাভ হবে না। মানুষের বাহ্যিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে কী পরিমাণ পার্থক্য ও অসামঞ্জস্যতা বিরাজমান তা আপনার নিকট দিবালোকের মতো আত্মপ্রকাশ করবে।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরা যায়। শায়খুল মাশাইখ হযরত আবদুল খালিক্ব গিজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে একজন ইয়াহুদি মুসলিম বেশে গমন করলেন। বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছিলো তিনি খুবই ধার্মিক। শায়খকে তিনি

---

[৯৭] আক্বওয়ালে সালাফ (ইংরেজি অনুবাদ) খ. ৩, পৃ. ৬৪২।

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪২

(পরীক্ষার নিয়তে) জিজ্ঞেস করলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ

-মু’মিনের অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক থেকো, অবশ্যই সে আল্লাহর নূর দ্বারা অবলোকন করে।”

শায়খ গিজদাওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন: “তোমার কোমরবন্ধ (অমুসলিমদের পরিচিতিমূলক বেল্ট) খুলে ফেলো! এটা তো তোমার জুব্বার নিচে লুকানো আছে।”

ইয়াহুদি ব্যক্তি বললেন: “কী যে বলেন, আমার কোমরে জুন্নার (কোমরবন্ধ) থাকবে কেনো? [কারণ তিনি তো মুসলমান!]”

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এক খাদিমকে নির্দেশ দিলেন: “যাও! তার জুব্বা তুলে কোমর থেকে বেল্টটি খুলে নিয়ে এসো!” খাদিম নির্দেশ পালন করলেন। দেখা গেলো, সত্যিই একটি জুন্না ইয়াহুদির পরনে ছিলো। ইয়াহুদি ব্যক্তি হযরতের নিকট ছুটে গিয়ে বললো: “ইয়া শায়খ! এক্ষুণি আমাকে সত্যধর্ম ইসলামে দীক্ষিত করুন।” সুবহানাল্লাহ! কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টির কী অপূর্ব নিদর্শন।

নির্ভীক এক আবিদের কাহিনী থেকে উপদেশবাণী

হযরত শায়খ মুসলেহ উদ্দীন সিরাজী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বুস্তাঁয় একজন নির্ভীক আবিদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ‘ই’তরাফে জুনূব’ কিতাবে হযরত শাহ ওয়াসিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ এটি বর্ণনা করে বেশ কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর এ কাহিনীর শেষের দিকে কিছু উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো এ প্রসঙ্গে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যে গোনাহগার আল্লাহকে ভয় করে, সে ঐ আবিদ থেকেও উত্তম যে লোকদেখানো ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করে।”[৯৯]

---

[৯৯] এখানে নফল ইবাদত উদ্দেশ্যে। -গ্রন্থকার

এ কথা দ্বারা হযরত এটাই বুঝাচ্ছেন যে, ঐ গোনাহগার ব্যক্তি রিয়াকারী থেকে সুলুকের ওপর অধিক জ্ঞান রাখে। কারণ, ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মা'রিফাত (আল্লাহপরিচিতি) লাভ করা। এটা সত্য যে, পাপ মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তবে ইবাদত যদি ইখলাসহীন হয়, লোকদেখানো হয় কিংবা কারো থেকে বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এ আবিদ কখনও নৈকট্যের ধারেকাছেও যাবে না। অপরদিকে কম ইবাদতকারী একজন তাক্বওয়াওয়ালা ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থী থাকবে। ফলে সে নৈকট্য হাসিলে সক্ষম হতে পারে।

কেউ যদি ইবদাত করার পর সে গর্ববোধ করে তাহলে বুঝতে হবে, তার ইবাদত তার নিজের জন্যই ছিলো- আল্লাহর জন্য নয়। এরূপ আবিদ কখনও পুণ্যবান হতে পারে না- বরং সে হলো একজন পাপিষ্ঠ লোক।[১০০]

মা'রিফাতের একটি উক্তি

শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ একজন মা'রিফাত লাভকারী সুফির উক্তি তুলে ধরেছেন যা আমাদের জন্য হতে পারে তকদির উন্মোচনী প্রেরণা। তিনি লিখেছেন:
"ঐ স্বল্পদৈর্ঘ্য হস্তধারী সুফি কী অপূর্ব একটি কথা উচ্চারণ করতেন, যখন তিনি গভীর রাতে তাওবাহর মধ্যে নিমগ্ন হতেন সুবহে সাদিক পর্যন্ত। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যদি কাউকে তাওবাহ করার প্রেরণা দেন, তখনই ঐ ব্যক্তির তাওবাহ তিনি কবুল করে নেন। এরূপ তাওবার ওপর কঠোরভাবে বহাল থাকও সম্ভব হয়। ভাই! আমাদের প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার তো খুবই দুর্বল।"

হযরত শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর আরো কিছু আহরিত বাণী

১. পেট যখন খালি হয়, দেহ পরিণত হয় আত্মায়। পেট পরিপূর্ণ হলে আত্মা হয়ে যায় দেহ।
২. সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি এর মূল্য কী তা জানে না, যতক্ষণ না সে দুর্ভাগ্যের আস্বাদন পেয়েছে।
৩. মানুষ কেঁদে পাগল ময়ূরের ঝকঝকে চাকচিক্যপূর্ণ পালক পেতে, এবং সে তার কদর্য পায়ের পাতাকে সুশ্রী ভাবে!

---

[১০০] ই'তরাফে জুনূব - পৃ. ১০৭ (Confession of Sins, p. 120)।

৪. যখনই তুমি নিজের থেকে প্রজ্ঞাবান কারোর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হবে এ আশায় যে, তোমার জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রতি অন্যরা শ্রদ্ধাশীল হবে, তখন মনে রেখো- তারা অবশ্যই তোমার অজ্ঞতা আবিষ্কার করে ফেলবে।

৫. আল্লাহ সর্বাধিক বেশি ভালোবাসেন ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে যার মধ্যে গরীবদের মতো দীনতা বিদ্যমান এবং ঐ গরীব ব্যক্তিকে যার মধ্যে ধনীদের মতো মহানুভবতা বিদ্যমান।

৬. আমি আল্লাহকে ভয় করি- এবং ওদেরকে ভয় করি যারা তাঁকে ভয় করে না।

৭. অল্প ও অল্প মিলে হয়ে যায় অনেক; শস্যাগারের অঢেল শস্য একেকটি শস্যদানা থেকে হয়েছে; এবং ফোটা ও ফোটা মিলে বন্যায় সব ভাসে।

৮. গোলাপ ও কাটা এবং দুঃখ ও সুখের মধ্যে আছে সামঞ্জস্য।

৯. যে কেউ তার কাঁধকে গর্বভরে বাড়িয়ে দেয়, তাকে শত্রুরা ঘেরাও করে চতুর্দিক থেকে।

১০. প্রথমে অনুধ্যান, কথা হবে শেষে; কারণ, দেওয়ালের পূর্বে ভিত্তি আসে।

১১. জীবন থেকে হাত গুটিয়ে নেয় যারা, যাকিছু আছে হৃদয়ে ব্যক্ত করে তারা।

১২. হতাশা হেতু শত্রুর তরবারিকে ধরে ফেলে খালি হাত।

১৩. রত্ন যদিও কাদায় পড়ে- মূল্য তার থেকেই যায়, ধূলা যদিও আকাশে উড়ে- তবুও সে মূল্যহীন।

১৪. সবুজ-সতেজ কাষ্ঠখণ্ড বক্র করা যায়। কিন্তু যখন এটি শুষ্ক হয়, একমাত্র অগ্নি দ্বারা একে সোজা করা সম্ভব।

১৫. যে গাছে ফল ধরে না, সে গাছে কেউ ইট-পাটকেল ছুড়ে মারে না।

১৬. মেঘ থেকে একফোটা বৃষ্টি নিচের দিকে পড়ছে। সামনে সাগর দেখে লজ্জা পেয়ে বলে, 'যেখানে সাগর সেখানে আমি কী?' সাগরের একটি ঝিনুক এ বেচারাকে জড়িয়ে ধরে নেয় এবং তাকে পরিণত করে মুক্তায়।

১৭. যে তার মাথায় লালন করে গর্ব ও গৌরববোধ, সে কখনো বুঝবে না হাক্বিক্বাত কী জিনিস।

১৮. তুমি যদি হাতীকে দেখভালের যোগ্য না হও, হাতী রাখালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না।

১৯. আরব ঘোড়ার ক্ষিপ্র গতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু দিবারাত্র যেটি চলে সেটি হচ্ছে ধীরগতির উট।

২০. তুমি যদি বেদনা সইতে না পারো, মৌছাকের ভেতর হাত নাহি রাখো।

২১. দশজন দরবেশ একই লেপের নিচে ঘুমোতে পারে, কিন্তু দুজন বাদশাহ একই রাজ্যের রাজা হতে পারে না।

হযরত শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর কালজয়ী কবিতা বালাগাল ’উলা ....

পাঠক, আপনারা সবাই অবগত আছেন বিখ্যাত এ কবিতা রচনার ইতিহাস সম্পর্কে। ভেবেছিলাম এ সম্পর্কে নিরব থাকবো- কিন্তু সুফি কবি শায়খ সাদির জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনায় যদি এ কবিতা রচনার কাহিনীটি উল্লেখিত না হয়, তাহলে সবকিছু যেনো অপূর্ণ থেকে যায়। তাই আসুন, আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এ কাহিনীটি আবারও শুনে নেই।

হযরত শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মি’রাজের ওপর একটি রুবাইয়াত লিখার উদ্যোগ নেন। তিনি লিখলেন:

বালাগ্বাল ‘উলা বি-কামালিহি
কাশাফাদ-দুযা বি-জামালিহি
হাসুনাত জামী’উ খিসওয়ালিহি
....

এখানে এসে শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহ থেমে গেলেন। রুবাইয়াত পূর্ণ করার জন্য শেষের লাইনটি কী লিখবেন তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এভাবে তো কোনো দিন হয় নি? কী লিখবেন তা কিছুতেই কল্পনায় আসছিলো না। ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অসংখ্য সাহাবায়ে কিরামও হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “হে সাদি! কী হয়েছে? তুমি কিসের জন্য এতো চিন্তিত?” তিনি জবাবে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রসংশাসূচক একটি রুবাইয়াত লিখছিলাম। কিন্তু শেষের লাইনটি কী লিখবো তা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।” প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি যা লিখেছো, তা আমাকে পড়ে শোনাও।”

শায়খ সাদি তিনটি লাইন আবৃত্তি করলেন। ‘হাসুনাত জামী’উ খিসওয়ালিহি’ বলে থেমে যাওয়ার পরই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সাল্লু

'আলাইহি ওয়া'আলিহি।" সুবহানাল্লাহ! হযরত সাদি রাহিমাহুল্লাহর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। অশ্রুভরা কণ্ঠে শেষের লাইনটি লিখে বিখ্যাত এ রুবাইআত পর্ণূ করলেন।[১০১]

এবার এই কবিতাটির বঙ্গানুবাদ তুলে ধরছি:

যিনি (সাধনায়) পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন,
যাঁর সৌন্দর্যের আলোকে অন্ধকার দূর হয়েছে,
যাঁর আচরণ – ব্যবহার ছিল সৌন্দর্যের আকর,
দরুদ তাঁর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর।

এখন আমরা শায়খ সাদি রাহিমাহুল্লাহর একটি দু'আ তুলে ধরছি। তিনি এটির মাধ্যমে তাঁর বুস্তাঁ কিতাবটির সমাপ্তি টানেন। আমরাও এটির মাধ্যমে এ মহান ব্যক্তির জীবন ও কর্মের ওপর আমাদের সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা শেষ করবো।

হযরত শাখ সাদি রাহিমাহুল্লাহ দু'আ করতেন:

"যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিসসালাম মিশরের ক্ষমতা লাভ করলেন, তিনি কী তাঁর ভাইদেরকে ক্ষমা করে দেন নি? তাঁদের হাতে বিরাট নির্যাতন সয়ে, মিশরের জেলখানায় নির্দোষ থাকাসত্ত্বেও কঠোর বন্দী জীবন কাটিয়ে, তিনি সবাইকে মাফ করে দিলেন। এর কারণ হলো, উত্তম চরিত্র সর্বদাই রাজকীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত বস্ত্রে আবৃত থাকে। সুতরাং, তিনি অপরাধের জন্য তাঁদেরকে জেলে পুরে বদলা নেন নি। না তিনি তাঁদের প্রদানকৃত মূল্যহীন বিনিময় গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন।

ও আল্লাহ! হে সর্বশক্তিমান! আমি আশাকরি তোমার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ হেতু এ বেচারা বান্দাকে ক্ষমা করে দেবে। আমি তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি শূন্যহাতে- আমার একমাত্র সম্বল- একটুকু আশা। হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমাশীলতার প্রতি এ আশাটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

-হে পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

---

[101] ruhani.wordpress.com ; aulia-e-hind.com

ইন্তিকাল

"কুল্লু নাফসিন জা-ইক্বাতুল মাউত" - মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এই চিরশাশ্বত বাণীর কখনো বত্যয় ঘটেনি, ঘটবেও না কিয়ামত পর্যন্ত। মানুষ মরণশীল। জন্মিলে একদিন মরতেই হবে। ইহজীবনের ইতি যেদিন ঘটে যাবে সেদিনই মালাকুল মাউত হাজির হবেন। তখন মায়াবী এ ধরার কোল থেকে চলে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আমরা সাধারণ পাপীদের মৃত্যুকালে কী অবস্থা হবে- তা-ই ভীষণ চিন্তার ব্যাপার। হে আল্লাহ! অনুগ্রহ করে মৃত্যুকালে তোমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে তোমা কর্তৃক দানকৃত জগতসমূহের সবকিছু থেকে মহামূল্যবান 'দৌলতে ঈমান' সংরক্ষণ করুন। হে আল্লাহ! সকল মু'মিন মুসলমানের খাতিমা বিল খাইর নসিব করুন। আমীন।

আমাদের আলোচিত মহান ওলি ও কাতিব কবি-সাহিত্যিক হযরত শায়খ মুসলেহ উদ্দীন সিরাজী সাদি রাহিমাহুল্লাহ এ ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন ৬৯১ হিজরি সনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ইরানের সিরাজ শহরে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। নূরান্বিত করুন তাঁর বিশ্রামস্থল কবরকে।

শায়খ মাওলানা জিয়াউদ্দিন নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৭৫১ হিজরি, সমাধি- বাদাউন, ইউপি, ভারত।)

তাঁর নাম ছিলো জিয়াউদ্দিন এবং তিনি বাদাউনের বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাঁর জন্মস্থান ছিলো বুখারার নাখশাব। এ কারণে তিনি নিজেকে কবিতার মধ্যে নাখশাবী বলে সম্বোধন করতেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় একাকী নির্জনে কাটিয়েছিলেন। তবে তিনি লোকজনের নিকট সুপরিচিত ছিলেন উত্তম কর্ম ও গুণাবলীর অধিকারী হওয়া হেতু। হযরত নাখশাবী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম সন ছিলো ৬২৫ হিজরি।

তাঁর কোনো কোনো জীবনীকার বলেছেন, তিনি চিশতি শায়খ হযরত নিযামুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ ছিলেন। তবে 'আখবারুল-আখইয়ার' গ্রন্থে লিখা আছে:

> "হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া রাহিমাহুল্লাহর সময় তিনব্যক্তি জীবিত ছিলেন যাদের নাম ছিলো 'জিয়াউদ্দিন': (১) হযরত জিয়াউদ্দিন সিনামী- তিনি শায়খকে পরিত্যাগ করেন, (২) জিয়াউদ্দিন বারনী- যিনি শায়খ নিযামুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ ছিলেন এবং (৩) জিয়াউদ্দিন নাখশাবী- যিনি না শায়খকে গ্রহণ করেন না পরিত্যাগ করেন।"[১০২]

'খাজিনাতুল আসফিয়া' নামক কিতাবে আছে: মাওলানা জিয়াউদ্দিন নাখশাবী রাহিমাহুল্লাহ হযরত শায়খ ফরিদ রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন সুলতানুত তারিকীন শায়খ হামিদুদ্দিন নাগরি রাহিমাহুল্লাহর নাতি। সুতরাং হযরত নাখশাবী একজন সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শায়খ ছিলেন।

একাগ্রতা ও খিলওয়াত

হযরত জিয়াউদ্দিন নাখশাবী রাহিমাহুল্লাহ একাকী থেকে ইবাদতে মশগুল থাকতে খিলওয়াত অবলম্বন করে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। তিনি বেশি মানুষের সংসর্গে থাকা পছন্দ করতেন না। তবে নির্জন থাকাবস্থায় ইবাদত বন্দেগী

[১০২] আখবারুল আখইয়ার, পৃ. ৯৮।

ছাড়াও তিনি গ্রন্থ রচনায় সময় কাটাতেন। তাঁর গ্রন্থাদির মাধ্যমেই আমরা তাঁকে বেশি চিনতে পেরেছি।[১০৩]

হযরত নাখশাবী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত গ্রন্থাদি

'সুলুকুস সালিকীন' নামক তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি এতে সুলুক ও মা'রিফাত লাভের উপায়-অবলম্বন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থে তাসাওউফ সম্পর্কিত আইন-কানুন ও আমলাদি নিয়ে আলাদা কয়েকটি অধ্যায়ে বর্ণনা এসেছে। সমগ্র বইটিতে মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে আমরা এ বই থেকে কিছু আকর্ষণীয় উদ্ধৃতি তুল ধরছি।

> **এক জযাগায় তিনি লিখেছেন:** একজন খাজা সাহেব দাসী এক মহিলাকে ক্রয় করে নিয়ে আসলেন। রাতে নিদ্রা যাওয়ার প্রারম্ভে দাসীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন: 'হে দাসী! আমার বিছানা ঠিক করে দাও- আমি ঘুমুবো।' দাসী জিজ্ঞেস করলো: 'হে আমার মালিক! আপনার কী কেউ আছেন, যিনি আপনার মালিক?' খাজা সাহেব জবাব দিলেন: 'হ্যাঁ, আছেন।' দাসী আবার জিজ্ঞেস করে: 'তিনিও কী নিদ্রা যান?' খাজা সাহেব বললেন: "না!" দাসী বললো: "আপনার কী লজ্জা হয় না? আপনি যখন ঘুমান তখন আপনার মালিক সজাগ থাকেন?'[১০৪]

এরূপ একটার পর আরেকটা কাহিনী লিখে হযরত নাখশাবী রাহিমাহুল্লাহ পাঠককে উপদেশ দিতে থাকেন। প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে তিনি বলেন, "শ্রবণ করো! শুনো!" যেমন এই কাহিনীটি:

> শুনো! শুনো! হযরত মূসা আলাইহিসসালামকে একবার নির্দেশ দেওয়া হলো, তোমার ক্বওমের সকল ভালো ও মন্দ লোকদের দুটি দলে বিভক্ত করো। মূসা আলাইহিসসালাম সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে একটি সাধারণ ঘোষণা দিলেন। সবাই বেরিয়ে আসলো। আল্লাহ তা'আলা বললেন, "সকল পরহেজগারদের আলাদা করো।" তিনি ৭০ জন পরহেজগার ব্যক্তি বের করে নিয়ে আসলেন। এবার আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন: "মূসা! এ ৭০ জনের মধ্যে সর্বাধিক

---

[১০৩] বাযম সুফিয়্যাহ, পৃ. ৩৪৮, সূত্র: আক্বওয়ালে সালাফ, ইংরেজি অনুবাদ, খ. ৩, পৃ. ৭৮৩।

[১০৪] যে মালিকের কথা দাসী বলছিলো তিনি তো ছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা।

পরহেজগারদের বের করো।” তিনি এদের মধ্য থেকে তিন জন মাত্র বের করলেন। আল্লাহ তা’আলা বললেন: “ও মূসা! এ তিন জন তো সর্বাধিক পাপিষ্ঠ! তুমি যখন ঘোষণা করলে পরহেজগাররা বেরিয়ে আসো, এরা নিজেদেরকে নিজেরাই ইবাদতগুজার পরহেজগার মনে করে বেরিয়ে এসেছিলো।”[১০৫]

হে আমার প্রিয়জন! কেউ যদি ইবাদত-বন্দেগী করে না, সে ঐ লোক থেকেও উত্তম যে ইবাদত করার ফলে গৌরববোধ করে। শরীয়তে দোষী অভিযুক্তকে জেল দেওয়া হয়। কিন্তু তরিকতে জেলের শাস্তি ভোগ করে অভিযোগকারী। -কী সুন্দর ব্যাখ্যা!

আরো দেখুন:

শুনো, শ্রবণ করো! এক বুজুর্গ কিছু একটা ক্রয় করতে বাজারে যেতে চাইলেন। তিনি বাড়িতে থেকেই দিনারগুলো ওজন করে বেরিয়ে পড়লেন। দিনারগুলো যখন বাজারে আবার ওজন করা হলো, বাড়ির পরিমাণ থেকে কমে গেলো। বুজুর্গ এতে কাঁদতে থাকেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, ‘হে শায়খ! আপনি কাঁদছেন কেনো?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি যেটা বাড়িতে ওজন করলাম, সেটা যদি এখানেই (বাজারে) আসার পর কমে যায়- তাহলে, আমাদের দুনিয়াবী আমলগুলো আখিরাতের পাল্লায় কেমনে ভারী হবে?”

তিনি আরো লিখেন:

শুনো! শুনো! কানে-মনে শুনো! হযরত ওয়াহহাব বিন মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘সাহাবী হযরত কা’ব বিন আহবার রাদ্বিআল্লাহু আনহু মসজিদের জামা’আতে নামায আদায়কালে শেষের কাতারে দাঁড়াতেন। কেউ একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ‘শেষের কাতারে দাঁড়ানোর পেছনে কোন প্রজ্ঞা কাজ করে, একটু বলুন?’ তিনি জবাব দিলেন: ‘আমি তাওরাত কিতাবে পাঠ করেছি, উম্মাতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু ব্যক্তি থাকবেন, যাঁরা সর্বশেষ কাতারে শরীক হওয়া মুসল্লির সকল গুনাহ মাফ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা ওঠাবেন না। এ কারণেই আমি পেছনের কাতারে

[১০৫] অর্থাৎ, এরা নিজেদের পরহেজগারী যাহির করতে চাইলো, আত্মগরিমা হেতু।

দাঁড়াই। আগের কাতারসমূহের মুসল্লিদের ওয়াসিলায় যাতে আমি অধম মাফি পেয়ে যাই!''

ওহে নাকশাবী! মানুষের সাথে নিজেকে তুলনা করো না। একটি মাত্র বন্যার পানির ফোটা সম্পর্কে কে জ্ঞান রাখে? সমগ্র পৃথিবী তোমার অনুগত হবে যদি তুমি নিজে আনুগত্যশীল হও তাঁর (আল্লাহ তা'আলার)।

শায়খ মুহাম্মদ ওয়াসী' রাহিমাহুল্লাহ একজন ইবাদতগুজার পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনে করতেন, এ বিরাট প্রশস্ত পৃথিবী একটি পিঁপড়ার চোখ থেকেও ক্ষুদ্র! তিনি বলেছেন: 'যদি নাফরমানী ও পাপের কোনো দুর্গন্ধ থাকতো, তাহলে কোনো ব্যক্তিই আমার কাছে বসতে পারতো না।"

একব্যক্তি জুবাইদার কক্ষের দরোজার বাইরে এসে বললো, "আমি জুবাইদাকে ভালোবাসি!" যখন এ কথাটি জুবাইদার কানে গেলো, তিনি ঐ লোকটিকে ভেতরে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। পর্দার আড়ালে থেকে তাকে বললেন, "সাবধান! এ বাক্যটি পুনরায় উচ্চারণ করবে না।" লোকটি বললো, "আমি কেনোভাবেই নিরব থাকতে পারবো না।" জুবাইদা বললেন, "ঠিক আছে। আমি তোমাকে নিরব থাকার জন্য উৎকোচ হিসেবে ২,০০০ দিরহাম দেবো।" সে বললো, "তাতেও হবে না। আমি নিরব থাকতে পারবো না।" জুবাইদা এবার বললেন, "৪,০০০ দিরহাম দেবো।" সে বললো, "তাতেও পারবো না।" এভাবে সে বার বার অস্বীকৃতি জানায় এবং জুবাইদা দিরহামের মাত্রা বাড়াতে থাকেন। যখন এক লক্ষ দিরহামে ওঠলো, তখন সে বললো, "আমি তা গ্রহণ করলাম।" জুবাইদা সাথে সাথে তার পরিচারিকাকে দিয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসলেন। বললেন, "এই লোকটির মাথা কেটে ফেলো! সে বাহ্যিকভাবে আমার প্রতি ভালোবাসা দেখাচ্ছে, অথচ অন্তরে ভালোবাসার লেশ মাত্র নেই!"

হে প্রেমাস্পদ! তুমি যদিও এ [সুলুকের] রাস্তায় চলন্ত থাকো হাজার বছরব্যাপী, এবং একটিবার মাত্র এ ধারণা তোমার মনে এসে যায়, 'তোমার দু'আ' গ্রহণীয় হওয়া উচিৎ' তাহলে অবশ্যই তুমি তোমার নিজের নফসের উপাসনা করছো। তুমি আল্লাহপ্রাপ্তির অন্বেষায় পাড়িই জমাও নি।

শুনো! শুনো! যখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তাঁকে দগ্ধ করার জন্য তৈরিকরা অগ্নিকুণ্ডের কাছে গেলেন, তিনি দেখলেন আগুনের মধ্যে কোনো ক্ষমতা নেই। উচিৎ ছিলো আগুনকে নবীর এ করুণ পরিণতির জন্য বিলাপ করা- কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটা হলো। নবী ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আগুনের অক্ষমতা দেখে কিছুটা সহানুভূতি অনুভব করলেন! এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لو لاك لما خلقت الأفلاك

- হক্বের জন্য আমার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মতো এতো বেশি কষ্ট আর কেউ সহ্য করে নি।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, হযরত জাকারিয়া আলাইহিসসালামকে কেটে দিখণ্ডিত করা হয়। তাঁদের এ ভীষণ কষ্টও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব কষ্ট-ব্যথা-বেদনা সহ্য কেরেছিলেন তার সমান ছিলো না।

শুনো! শুনো! নাখশাবী শূন্যতার ঊর্ধ্বে ওঠে এসেছে। হৃদয়ে যন্ত্রণা আসে শুধুমাত্র হৃদয়ের আলোর মাধ্যমে। হৃদয়শূন্যতা হচ্ছে অকেজো হওয়ার চিহ্ন। সত্যিকার প্রেমিকের হৃদয় কখনাও শূন্য নয়।

কিছু লোক হযরত রাবিয়া বসরী রাহিমাহাল্লাহকে প্রশ্ন করলো: "শয়তানকে কী আপনি দুশমন মনে করেন?" তিনি জবাব দিলেন: "না!" তারা জানতে চাইলো: "কেনো?" তিনি বললেন: "আমি আমার বন্ধুকে (আল্লাহকে) নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে, আমার দুশমনকে নিয়ে ভাবনারই সময় পাই না।"

এক বুজুর্গকে প্রশ্ন করা হলো: "এ দুনিয়ার উপমা কী হয়?" তিনি জবাব দেন: "এ দুনিয়া এতোই মূল্যহীন ও তুচ্ছ যে, একে অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনাই করা যাবে না।"

একব্যক্তি একজন বুজুর্গের কাছে গিয়ে বললো: "আমি ভাবছি কিছুদিন আপনার সুহবতে কাটিয়ে দেবো।" বুজুর্গ বললেন: "আমার মৃত্যুর পর তুমি কার সুহবতে থাকবে?" সে উত্তর দিলো: "আল্লাহ তা'আলার।" তিনি বললেন: "মনে করো

আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এখন থেকেই তুমি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে থেকো।"

একদিন, দুনিয়াদার এক লোক একজন বুজুর্গের বাড়িতে গিয়ে পানি পান করতে আবদার জানালো। বুজুর্গ তাকে দুর্গন্ধযুক্ত ফুটন্ত পানি দিলেন! লোকটি বললো: "ইয়া শায়খ! এ পানির মধ্যে দুর্গন্ধ আছে। এছাড়া এটি গরম।" বুজুর্গ বললেন: "হে খাজা! আমরা তো কয়েদি। আর কয়েদি কখনও পান করার জন্য উত্তম পানীয় পায় না।"

কেউ একজন ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহিমাহুল্লাহকে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হলো?" ইয়াহইয়া জবাব দিলেন, "আমাকে যখন উপস্থিত করা হলো, তখন জিজ্ঞাসিত হলাম, 'তুমি দুনিয়া থেকে কী নিয়ে এসেছো?' জবাব দিলাম, 'আমি তো একটি কারাগার থেকে এসেছি। ওখান থেকে কী নিয়ে আসবো? আমার কিছু থাকলে ৭০ বছর যাবৎ ঐ কারাগারে পড়ে থাকতাম না!'"

কিছু মুরিদ তাদের মুর্শিদকে প্রশ্ন করলো, 'আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে কোন রাস্তায় চলবো?' পীর সাহেব জবাব দিলেন, "তোমরা কোন রাস্তা দিয়ে আসলে যে, রাস্তাটিও চিনলে না?"

একজন ভদ্র ব্যক্তি তিনি- যিনি অভদ্রদের আচরণ হেতু বিচলতি ও দুঃখিত হন না। একজন বুজুর্গ বলেছেন, "ফুজাইল ইবনে আয়াজের মৃত্যুর পর পৃথিবীর জমিন তার দুঃখকে ভুলে গেছে।"[১০৬]

হযরত নাখশাবী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

আখবারুল আখইয়ার ও খাযিনাতুল আসফিয়ায় উল্লিখিত আছে, হযরত মাওলানা জিয়াউদ্দিন নাখশাবী রাহিমাহুল্লাহ ৭৫১ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বাদাউনে সমাহিত আছেন। আল্লাহ সুবনাহু ওয়াতা'আলা তঁর বিশ্রামস্থলকে নূরান্বিত করুন। তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাক্বামে।

---

[১০৬] এ থেকে এটাই জানা গেলো যে, হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহিমাহুল্লাহ আখিরাত নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকতেন।

হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল কুরাইশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৭৪৯ হিজরি, সমাধি- বামহারওয়ালী, ইলাহাবাদ, ভারত।)

বংশ পরিচয়

তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুহরাওয়ার্দি শায়খ বাহাউদ্দিন মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর নাতি। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ সদরউদ্দিন আ'রিফ মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ। শায়খ ইসমাঈল কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহ 'বামহারওয়ালীর মাখদুম শাহ' নামে সর্বাধিক পরিচিত।

ঈসায়ী ১২৬০ সাল, মুবাতিক ৬৫৮ হিজরি সনে হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইসামঈল কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয়।

শিক্ষা ও সুলুকের রাস্তায় পাড়ি

প্রথামিক শিক্ষা শেষে মাখদুম শাহ রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পিতা ও পিতামহের দিকনির্দেশা হেতু সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমান খুব অল্প বয়সেই। তাঁর বড় ভাই হযরত রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহও সুহরাওয়ার্দি তরিকার গদিনশীন শায়খ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও তিনি তরিকতের সবক নেন। ছোট ভাইয়ের প্রতি রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর বিশেষ নজর ছিলো। তাঁকে যখন দিল্লির সুলতান শাহ আলাউদ্দিন খিলজী আমন্ত্রণ করে দিল্লিতে নিয়ে যান তখন স্বীয় ভাই মুহাম্মদ ইসমাঈল কুরাইশীকেও সাথে নিয়ে যান। এ ভ্রমণে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে চিশতি শায়খ হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে।

মুলতান থেকে ইলাহাবাদ

মুলতানের খানক্বায় থেকে হযরত শায়খ ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ শিক্ষা ও ইসলাহী কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। স্বীয় ভাই রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকালের পূর্বে হঠাৎ একদিন তাঁর মধ্যে ইলহামী নির্দেশনা এলো মুলতান ছেড়ে ইলাহাবাদে চলে যেতে।

তিনি প্রথমে দিল্লিতে যান এবং সেখানে শাহ আলাউদ্দিন খিলজী ও তাঁর সভাসদগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কিছুদিন পর তিনি ইলাহাবাদে যেয়ে উপস্থিত হন।

কিরা এলাকা দিয়ে ভ্রমণ করে 'বামহারওয়ালি' নামক স্থানে পৌঁছুয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

হযরত সাইয়্যিদ শা'বান মিল্লাত জৌনসী রাহিমাহুল্লাহর খিদমাতে

এক রাতে হযরত ইসামঈল কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর দাদা হযরত বাহাউদ্দিন মুলতানী রাহিমাহুল্লাহকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি বললেন: হে আমার বংশধর! যে আধ্যাত্মিক অনুদান এখনও তোমার প্রাপ্তির প্রয়োজন রয়ে গেছে, তা গ্রহণ করতে হবে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার বিশিষ্ট শায়খ সাইয়্যিদ শা'বানের নিকট থেকে। এ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি চলে যান শায়খ শা'বানের সুহবতে। স্বীয় দাদার কথা অবগত করার পর সত্যিই তাঁর প্রতি আধ্যাত্মিক অনুদান প্রদান করেন শায়খ শা'বান।[১০৭]

শরীয়তের প্রতি পাওবন্দ

শরীয়তের প্রতি পুরো আনুগত্য ছিলো হযরতের জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি শরীয়তের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। শরীয়তবিরোধী একটি কাজও তিনি কখনও অনুমোদন দেন নি। সামা'র নামে গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দন তিনি দেখতে পারতেন না। তিনি সর্বদা বলতেন, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্ট- এবং তা হতে হবে আল্লাহর পছন্দসই রাস্তায়। সুতরাং তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজেই জীবন কাটিয়েছেন।

মসজিদ নির্মাণ

গঙ্গা নদীর তীরে হযরত ইসমাঈল কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহ একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করেন। একটি ছোট্ট টিলার ওপর এটি দাঁড়িয়ে আছে। আলহামদুলিল্লাহ! শত শত বছর পরও এই আকর্ষণীয় মসজিদটি আজো বিদ্যমান আছে। যুগে যুগে এটির আয়তন বৃদ্ধিসহ সংস্কার কাজ হয়েছে।

ইন্তিকাল

মাখদুমে হিন্দ খেতাবে ভূষিত এ মহান ওলি ৭৪৯ হিজরি সনে ইলাহাবাদে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ইলাহাবাদের

---

[১০৭] তারিখে মাশাইখে ইলাহাবাদ, পৃ. ৯৩।

বামহারওয়ালীতে স্বীয় নির্মিত মসজিদের পাশেই সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাক্বামাতকে বুলন্দ করুন।

হযরত ইসমাঈল কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহর কবরের একক বৈশিষ্ট্য

তাঁর কবরের ওপর কোনো মিনারা নেই। তবে একটি সুন্দর গম্বুজ আছে। এ যুগের মিলাদ, উরুস কিংবা অন্য কেনো বিদআতী কাজ তাঁর কবরপাশে হয় না। হযরতের কঠোরভাবে শরীয়ত অবলম্বনের প্রমাণ এ থেকেই ফুটে ওটেছে। মৃত্যুর পরও শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ তাঁর কবরের নিকট হচ্ছে না।

হযরতের ইন্তিকালের পর সাহেবাজাদা হযরত শিহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ স্থলাভিষিক্ত হন। 'মিরাতুল আসরার' নামক কিতাবের প্রণেতা মোগল সম্রাট শাহজাহানের [১৫৯২-১৬৬৬ ঈ.] আমলে হযরত ইসমাঈল কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহর মসজিদ ও কবর জিয়ারতে যান। তিনি উল্লেখ করেন, এ স্থানটি অত্যন্ত বরকতময়।

খলিফা

হযরত কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহ লুকানো ওলি ছিলেন। তাঁর আসল অবস্থা খুব অল্পজনই জানতো। কিরা, মানিকপুর, জৌনপুর, জৌনসী এবং অন্যান্য অঞ্চলের অনেকেই তাঁর সুহবতে থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তবে তিনি মাত্র তিন ব্যক্তিকে খিলাফত প্রদান করেন। তাঁরা হচ্ছেন:

১. শায়খ আবদুর রহিম রাহিমাহুল্লাহ।
২. শায়খ আলী রাহিমাহুল্লাহ।
৩. শায়খ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ শাহ কিরাক মজযুব আবদাল রাহিমাহুল্লাহ।

শেষোক্ত শায়খ ৭১০ হিজরি সনে ইলাহাবাদের অন্তর্গত মানিকপুরের কিরা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনিই হযরতের প্রধান খলিফা ছিলেন। তাঁকে নিজের শায়খ থেকে সবাই বেশি জানতো-চিনতো। আল্লাহ তা'আলা আবদাল রাহিমাহুল্লাহর সমাধিস্থলকে নূরান্বিত করুন।

হযরত শায়খ সাইয়্যিদ আলী শা’বান মিল্লাত জৌনসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৭৬০ হিজরি, সমাধি- জৌনসী, ইলাহাবাদ, ভারত।)

তাঁর নাম ছিলো সাইয়্যিদ আলী মর্তুজা রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর কুনিয়াত আলী শা’বান এবং শা’বান মিল্লাত। তিনি শা’বান বাইবানী নামেও পরিচিত। শা’বান নামকরণের কারণ হলো তিনি লাইলাতুল বারা’আতের (১৫ শা’বান) রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরদাদা ছিলেন সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মক্কী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর পিতার নাম ছিলো সাইয়্যিদ বদরে আলম বদরুদ্দিন।

আলী শা’বান রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয় সিন্ধু প্রদেশের সুখখুর ও বুখখুর এর নিকটস্থ লানদি নামক জনপদে। বর্তমানে এ অঞ্চলটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

মুর্শিদের সন্ধানে

হযরত আলী শা’বান রাহিমাহুল্লাহর বয়স তখন ত্রিশ বছর। হঠাৎ অন্তরের মধ্যে আল্লাহপ্রাপ্তির ভীষণ ক্ষুধা জাগ্রত হয়ে ওঠলো। তিনি বেশ অস্বস্থি বোধ করতে লাগলেন। প্রেমাস্পদের নৈকট্য পেতে তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু কার মাধ্যমে তীব্র এ আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করা যায়? তাঁর যুগে জীবিত বিভিন্ন ওলির দরবারে ছুটে যেতে থাকেন। প্রত্যেকর সান্নিধ্যে এক দু’দিন কাটিয়ে দিতেন- কিন্তু অন্তরের চাওয়ার সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একদিন চলে আসলেন পীরের সন্ধানে মুলতানে।

মুলতানে তখন বসবাস করছিলেন আ’রিফ বিল্লাহ হযরত শামসুদ্দিন আ’রিদ রাহিমাহুল্লাহ। হযরত আলী শা’বান তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে মুরিদ হওয়ার ইচ্ছে পেশ করলেন। আ’রিফ বিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। এগুলোর জবাব শুনে বললেন: “বাবা আলী! তোমার আকাঙ্ক্ষা এখানে পূরণ হবার নয়। তোমাকে অন্যত্র যেতে হবে। তোমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ‘ওলায়েতে সুলুক’, কিন্তু আমি প্রশিক্ষণ দিই ‘যজ্ব’ এর ওপর।” তিনি তাসাওউফ শাস্ত্রের এ দু’টো কথার মর্ম বুঝতে পারলেন না। বললেন, “হযরত! আমাকে উপদেশ দিন কোথায় যেয়ে যেটাই আমার জন্য নির্দিষ্ট আছে তা খুঁজে পাবো?” তিনি জবাব দিলেন, “তোমাকে যেতে হবে যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত রুকুনুদ্দিন আবুল ফাহাত সুহরাওয়ার্দির দরবারে। তিনি

হচ্ছেন হযরত মাখদুম শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর নাতি।”

কালবিলম্ব না করে হযরত আলী শা’বান রাহিমাহুল্লাহ ছুটে গেলেন হযরত রুকুনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর দরবারে। শায়খ রুকুনুদ্দিন তাঁকে দেখেই আনন্দে কাছে টেনে নিলেন। চোখের ওপর চোখ পড়লো। বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ! একটি সিংহ আমার বাসায় আগমন করেছে!” হযরত আলী শা’বান সাথে সাথে শায়খের প্রতি ভীষণ আকর্ষণ বোধ করলেন। তিনি জানতেন, যে পীরের সন্ধানে দীর্ঘদিন হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন- তিনি তাঁর সম্মুখে অবস্থান করছেন। তাঁর অনুসন্ধান পর্বের ইতি ঘটেছে।

দীর্ঘ দুবছর যাবৎ হযরত শায়খ রুকুনুদ্দিনের খিদমাতে থাকলেন হযরত আলী শা’বান রাহিমাহুল্লাহ। কিন্তু তখনও তাঁকে মুরিদ করলেন না। একদিন তাঁর শায়খকে তিনি বললেন, “ইয়া শাইখী! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।”[১০৮] তিনি বললেন, “সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকানুযায়ী প্রথমেই তোমাকে একাধারে চল্লিশ দিন রোযা রাখতে হবে। এরপর প্রত্যেক সপ্তাহের শনিবারে আরো চল্লিশটি রোযা রাখার পর আমি তোমাকে যা বলার বলবো।”

হযরত আলী শা’বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহ শায়খের নির্দেশ মতো রোযাগুলো রাখলেন। এবার শায়খ বললেন, “চল্লিশটি ইসমে সিফাতুল্লাহ তোমাকে নিয়মিত জিকির করতে হবে।” নির্দেশ মতো এ জিকিরে নিমগ্ন হলেন হযরত আলী শা’বান। জিকিরে থাকাবস্থায় একদিন হযরত খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। এ সক্ষাতে তাঁর বিরাট উপকার হয়। আরো কিছুদিন পর তিনি শায়খকে আবদার জানালেন, “ইয়া শাইখী! আমি কী আপনার পবিত্র হাতে বাইআত গ্রহণ করতে পারি?” যে উত্তর তিনি পেলেন তাতে তাঁর মনটা ভারী হয়ে ওঠলো। শায়খ রুকুনুদ্দিন বললেন, “তোমার এ বাসনা এখানে পূর্ণ হবার নয়! তোমাকে যেতে হবে শায়খ মিনহাজুদ্দিন হাসান হাজি হারামাইনের দরবারে। তিনি বিহারে বসবাস করেন। সেখানে যেয়ে তোমাকে তাঁর মুরিদ হতে হবে।”

---

[১০৮] এটা ছিলো মুরিদ হওয়ার জন্য আবদার।

হযরত মাখদুম শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহর মন চাইলো না দীর্ঘদিন যার সুহবতে থেকেছেন তাঁর নিকট থেকে চলে যেতে। কিন্তু শায়খের নির্দেশ তো মানতে হবে। অশ্রুবিসর্জন দিতে দিতে তিনি বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বিহার শহরের নিকটবর্তী হয়ে এক আশ্চর্য ব্যাপার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি দেখলেন হযরত মাখদুম শাহ মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ শহরের বাইরে এসে প্রধান প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছেন। যেনো কারোর অপেক্ষা করছেন!

হযরত মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর চোখে হযরত আলী শা'বান রাহিমাহুল্লাহর অবয়ব দৃষ্টিগোচর হতেই সজোরে বলতে লাগলেন, "এসো! এসো! আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় আছি!"

শা'বান রাহিমাহুল্লাহ সওয়ারী থেকে নেমে ছুটে গেলেন শায়খের নিকট। তাঁর পায়ে চুমো খেলেন। হযরত মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে স্বীয় খানক্বায় নিয়ে গেলেন আদর করে। পীরের খাদিম হিসেবে এখানে তিনি শুরু করলেন দীর্ঘ বারো বছর স্থায়ী বসবাস। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, রিয়াজত, মুজাহাদা, মুরাক্বাবা, জিকির-আজকর ও কঠোর ইবাদত-বন্দেগিতে এক যুগ কেটে যাওয়ার পরও হযরত আলী শা'বানকে হযরত মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ মুরিদ করলেন না। তবে এ দীর্ঘ অপেক্ষার ইতি একদিন ঘটলো অবশেষে। হযরতকে ডেকে এনে শায়খ মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় মুরিদ করলেন। মুরিদ হয়ে শায়খ শা'বান রাহিমাহুল্লাহ অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন। একই সময় শুকরিয়া জানান মহান আল্লাহর দরবারে, "প্রভু গো! অবশেষে তুমি আমাকে তোমার ওলির এক নগন্য শাগরিদের মর্যাদা দান করেছো। আমি এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করার ভাষা পাচ্ছি না।"

হযরত শা'বান রাহিমাহুল্লাহর দীর্ঘদিনের সাধনা অবশ্যই বিফলে যায় নি। নিয়মমাফিক মুরিদ হওয়ার কয়েকদিনের ভেতরই তিনি সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় স্বীয় পীরের কাছ থেকে খিলাফত লাভ করলেন। পীর সাহেব বললেন, "তোমার আবাসস্থল হচ্ছে শায়খপুরা। তোমাকে ওখানে যেয়ে ইসলামের খিদমাত করতে হবে।" সুতরাং শায়খপুরা যেয়ে দীর্ঘ দুবছর থাকলেন। এরপর পীরের সান্নিধ্যে থাকতে ফিরে আসলেন বিহারে। আরো বেশ কিছুদিন এখানে কাটালেন।

হযরত মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ প্রিয় খলিফাকে একদিন ডেকে আনলেন নিকটে। বললেন, "গতরাতে স্বপ্নযোগে আমার সাক্ষাৎ নসিব হয়েছে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাকে পারিয়াগে যেতে হবে। ওখানে কুফরি খুব বেশি মাথাছাড়া দিয়ে ওঠেছে। ওখানে যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া তোমার জন্য অবশ্যকরণীয়।"

এ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে ইলাহাবাদের পারিয়াগের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি পঞ্চাশ জন আহলুল্লাহ সমবিভ্যাহারে ইলাহাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। যাত্রাপথে কাফেলা জৌনসীতে[১০৯] পৌঁছুল। সে যুগে এ স্থানের নাম ছিলো হারবাংপুর। তখন রাজা হারবাং এ অঞ্চল শাসন করছিলেন। জৌনসীর দ্রাবিড় প্রান্তের দিকে তখন অনেক বনাঞ্চল ছিলো। হযরত শা'বান রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর পঞ্চাশজন সঙ্গীসাথী এ বনাঞ্চলে তাঁবু স্থাপন করেন। যখনই নামাযের ওয়াক্ত হতো তখনই এ মুবারক দরবেশগণদের একজনের কণ্ঠে গঙ্গা তীরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে আজানধ্বনি উচ্চারিত হতো। আজানের অপূর্ব সুর-লহরী অদূরবর্তী কুফরিস্থানে যেয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। অচিরেই এর প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। কুফরিস্থানের জনপদের মধ্যে অস্বস্থির ছোঁয়া লাগলো। একদিন স্বয়ং রাজা হারবাংয়ের কানে ওলিআল্লাহদের কণ্ঠে উচ্চারিত আজানধ্বনি পৌঁছুয়ে গেলো। রাজা তাঁর সভাসদদের ডেকে পাঠালেন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রশ্ন করলেন, "আমাদের কোন্ স্থান থেকে এসব অবিশ্বাসীরা আজানধ্বনি তুলছে?"

ক্ষমতা ও গরিমায় মাতাল রাজা হারবাং ওবস ফকিরদের কোনো তোয়াক্কাই করলেন না। তিনি জানতেন না কোন্ অদৃশ্য শক্তি এ দরবেশদের পেছনে ছিলো। তাঁরা তো ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফিলা!

যাক, রাজা একজন দূত মারফর 'ফকিরদের' নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করলেন, "তোমরা হচ্ছো মুসলাম। এ অঞ্চল কিন্তু হিন্দুদের আবাসস্থল। এক্ষুণি তোমাদেরকে এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখানে অবস্থান তোমাদের জন্য মেটোই বৈধ নয়!"

---

[১০৯] জৌনসী বা জানসি বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি জিলাশহর।

হযরত মাখদুম শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহ দূতকে বললেন, "যাও! রাজাকে যেয়ে বলো, আমি এখানে এসেছি আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ওলি আমার শায়খের নির্দেশে। আমি এখানেই বসবাস করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি না রাজার নির্দেশে এখানে এসেছি, না আমি এ স্থান পরিত্যাগ করবো তার নির্দেশে। ভালো করে জানো, আমরা এখানে এসেছি দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। তাকে আরো বলো, আমরা না এখান থেকে চলে যাবো- না এখান থেকে পালাবো।"

দূতের নিকট থেকে রাজা হারবাং এ কথাগুলো শুনে খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি সাথে সাথে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন গঙ্গাতীরের দিকে। নির্দেশ দিলেন: "যাও! এ লোকগুলোর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে আসো!"

সৈন্যরা হযরত শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহর তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলো উন্মুক্ত তরবারি হাতে। কিন্তু তারা জনাতো না, এ মুবারক কাফিলার সাথী ছিলো খোদায়ী মদদ। হযরত শায়খ শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহ আগোয়ান সৈন্যদের দেখে তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন। তাঁর কণ্ঠে কিছু বাক্য উচ্চারিত হলো। কী আশ্চর্য! দেখা গেলো সকল সৈন্যের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে!

রাজার নিকট এ সংবাদ পৌঁছুনোর পর রাগে-গোস্বায় তিনি আরো অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠলেন। বিরাট সৈন্যদলসহ নিজেই রণক্ষেত্রে আগমন করলেন। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

যুদ্ধশেষে দেখা গেলো হযরত শায়খ শা'বানের সাথীদের মধ্যে শাহাদাতবরণ করেছেন ৭ জন ওলি। তবে রাজা হারবাংয়ের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার অসংখ্য সৈন্যের লাশ ধরাশায়ী হয়েছে। যুদ্ধে এক বিরাট বিজয় অর্জিত হয়েছে আল্লাহর রহমতে।

জৌনসীর কেল্লায় কম্পন

হযরত মাখদুম শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহর নজর পড়লো জৌনসীর কেল্লার ওপর। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিসহ খুব জোরো-সুরে চিৎকার দিলেন। সাথে সাথে দেখা গেলো কেল্লার মধ্যে কম্পন শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছিলো বিরাট এক ভূমিকম্পে

আক্রান্ত কেল্লাটি। সত্যিই তা-ই। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো কেল্লা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো। রাজার সৈন্য-সামন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। সুবহানাল্লাহ! আজো জৌনসীর সেই কেল্লার ধ্বংসস্তুপ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রচণ্ড এ ভূমিকম্পে এলাকার হিন্দুরা আতঙ্কিত হলেন। তারা ছুটে আসলেন হযরত মাখদুম শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহর দরবারে। সত্যধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন সবাই।

হযরত মাখদুম শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহ জৌনসীতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। কয়েকজন সাথীকে দায়িত্ব দিয়ে অন্যদের নিয়ে সাইয়েদ সারাইয়ার নিকটস্থ চারি'ইর দিকে অগ্রসর হলেন। এখানে এসে তিনি ইবাদত-বন্দেগি ও জিকির-আজকারে মশগুল হলেন।

ওদিকে বিহারে অবস্থানরত হযরতের শায়খ হযরত মিনহাজুদ্দিন হাজি হারামাইন রাহিমাহুল্লাহ মক্কা মুকাররমায় যেতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিহার ছেড়ে এ উদ্দেশ্যে যাত্রা করে জৌনসীতে আসলেন। মানুষের কাছ থেকে মাখদুম শা'বান রাহিমাহুল্লাহ কোথায় আছেন জেনে নিলেন। মানুষের কথা মতো তিনি চার'ই নামক স্থান কোথায় আছে খুঁজতে লাগলেন। যাত্রাপথে সাইয়িদ সারাইয়ার নিকটস্থ একটি বাগান এলাকায় তিনি যাত্রাবিরতি করেন। এদিকে স্বীয় পীরের আগমনের ব্যাপারটি কাশফের মাধ্যমে জেনে নেন হযরত শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহ। তিনি যে তাঁরই সন্ধানে আছেন তা-ও তিনি অবগত হলেন। এর ফলে তাঁর মধ্যে অস্থিরতার জন্ম নিলো। কেউ একজন তাঁর নিকট কিছু দুধ নিয়ে এসেছিলো। এ দুধটুকু ও কিছু ভাত খাদ্য হিসেবে তাঁর কক্ষে ছিলো। একটি পাত্রে ভাত ও দুধ একত্রিত করলেন। এরপর এ পাত্রটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পীরের সন্ধানে।

তিনি খুঁজতে খুঁজতে চলে আসলেন ঐ বাগানবাড়িতে যেখানে অবস্থান করছিলেন মাখদুম মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। পীর সাহেব দূর থেকে দেখতে পান স্বীয় খলিফা এগিয়ে আসছেন দ্রুত গতিতে। তার ভাব ও অঙ্গভঙ্গির মধ্যে ফুটে ওঠেছে পীরের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যতা ও বিনয়। শায়খ তাঁর এ প্রিয় শাগরিদকে দেখেই উচ্চারণ করলেন হাসিমুখে:

تعال! تعال! يا سيدي مرحبا

এসো! এসো! হে সায়্যিদী, স্বাগতম!

হযরত মাখদুম মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ দুধ মিশ্রিত ভাত খেলেন আনন্দভরে। কিছুটা তাঁর খলিফাকেও খেতে দিলেন। বললেন, "খাও! তোমার বংশধর ও মুরিদান কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে খাবে।" শায়খ এবার তাঁর এ প্রিয় শাগরিদকে আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জু প্রদান করে আরো বেশি মালামাল করলেন। বললেন, "হে শা'বান! হে আমার পুত্র! তুমি তোমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছো।"

হযরত মাখদুম মিনহাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ কিছুদিন চার'ইতে অবস্থান করার পর মক্কা মুয়াজ্জমার উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করেন। বিদায়ক্ষণে তিনি সায়্যিদ শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "আমি যাচ্ছি পবিত্র নগরী মক্কায় এবং সেখানেই আমার মৃত্যু হবে। তোমাকে বিহারে যেতে হবে। সাথে নিয়ে যাবে খিলাফতের খিরক্বা। এ খিরক্বা আমাকে আমার শায়খ নাজমুদ্দিন ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লাহ প্রদান করেছিলেন। তিনি এটি প্রাপ্ত হন হযরত শায়খ রুকুনুদ্দিন আবুল ফাতাহ রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে। এখন তুমি এটির মালিক হলে। এটি পরিধান করে বিহারে চলে যাও। ওখানে কিছুদিন অবস্থান করো। আমার পুত্র সদরুদ্দিনকে তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণে সহায়তা করবে। এরপর জৌনসীতে ফিরে আসবে।"

হযরত মাখদুম মিনহাজুদ্দিন হাজি হারামাইন রাহিমাহুল্লাহ মক্কা মুয়াজ্জমার উদ্দেশ্যে যাত্র করলেন। এদিকে সাইয়্যিদ শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহ পীরের নির্দেশে যাত্রা করলেন বিহারের দিকে। গন্তব্যে পৌঁছুয়ে জানতে পারলেন, সাহেবজাদা শায়খ সদরুদ্দিন পিতার প্রস্থানের পর থেকে সিন্ধুক খুলে বস্ত্র পরিধানের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু চাবি দিয়ে কিছুতেই সিন্ধুক খুলতে পারছিলেন না। তবে শায়খ শা'বান রাহিমাহুল্লাহর আগমনের সাথে সাথে সিন্ধুকটি সহজেই খুলে গেলো। সদরুদ্দিন এবার পিতার বস্ত্রাদি পরিধান করতে সমর্থ হলেন। শায়খ শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহ কিছুদিন বিহারে থেকে সদরুদ্দিনকে তরিকতের দীক্ষা দিলেন। এরপর ফিরে চলে যান জৌনসীতে।

তাসাওউফ ও তাওহিদের মাঠে হযরত সাইয়্যিদ শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহ সুফিদের নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন চিশতি শাইখুল মাশাইখ মাখদুম আলাউদ্দিন সাইয়্যিদ আলী সাবির কালিয়ারী কুদ্দিসা সিররুহুর সমসাময়িক শায়খ। তাঁর সঙ্গে

হযরতের সাক্ষাৎ ঘটে। হযরত সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলিইহি ছিলেন বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর উজূদানী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা।

কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন- আউলিয়াদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ হওয়া সত্য। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একটি বিশ্বাসও বটে। হযরত মাখদুম শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমেও বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছিলো। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি জৌনসী বিজয়কালে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তার বিকাশ- যা মূলত কারামত ছিলো। আরো অসংখ্য ছোট বড়ো কারামতের বর্ণনা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। তবে আমরা এগুলো এ প্রসঙ্গে আর উল্লেখ করতে আগ্রহবোধ করছি না।

অত্যাশ্চর্য একটি স্বপ্ন[১১০]

হযরত মাওলানা ইসমাঈল কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর একজন বংশধর। মাওলানার কবরটি ইলাহাবাদের বামহারওয়ালীতে অবস্থিত। তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়, তিনি একদিন এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। স্বীয় দাদা হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সম্মুখে এসে বললেন: "আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার আমার পক্ষ থেকে যেটুকু তোমাকে দান করবো তা আসবে সাইয়্যিদ শা'বানের মাধ্যমে- যিনি হচ্ছেন আমাদের তরিকার একজন খলিফার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কাছে রক্ষিত আছে আমাদের বংশের ধনভাণ্ডারও।" এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত মাখদুম ইসমাঈল কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহ হযরত মাখদুম সাইয়্যিদ শা'বান মিল্লাত রাহিমাহুল্লাহর দরবারে ছুটে যান। তিনি হযরতকে পিতামহের নির্দেশ অবগত করেন। হযরত শা'বান এ নির্দেশ মুতাবিক হযরত কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহকে মুরিদ করেন ও তাসাওউফের রাস্তায় ভ্রমণশেষে খিলাফত প্রদান করেন। আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের সীমা-পরিসীমা নেই।

সন্তানাদি

হযরত সাইয়্যিদ শা'বান মিল্লাত জৌনসী রাহিমাহুল্লাহ দুজন পুত্র ও দুজন কন্যাসন্তানের পিতা ছিলেন। এক পুত্রের নাম ছিলো আলী আমির ওরফে উমর শহীদ। তিনি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিলো শায়খ তকিউদ্দিন

[১১০] এ বর্ণনাটির সূত্র হচ্ছে হযরত কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী প্রণীত- আক্বওয়ালে সালাফ (ইংরেজি অনুবাদ), খ. ৪, পৃ. ৪৮-৪৯ থেকে।

রাহিমাহুল্লাহ। পরবর্তীতে তাঁর জীবনালোচানা হবে ইনশাআল্লাহ। কন্যাদের নাম ছিলো সালিহাহ এবং হাইফাহ। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন।

ইন্তিকাল

হ্যাঁ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর প্রিয় বন্দা ও বন্ধুদেরকেও চিরজ্ঞীবী করেন নি। করবেনও না। তিনি যখন ইচ্ছে, যাকে খুশি মৃত্যুমুখে পতিত করেন। তবে আমাদের ভয় হচ্ছে, খাতিমা বিল খায়ের হবে তো? দৌলতে ঈমানটুকু সংরক্ষিত থাকবে কী মৃত্যুকালে? হে আল্লাহ! উম্মাতে মুহাম্মদীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তর্ভুক্ত সবার ঈমান তুমি আমৃত্যু সংরক্ষণ করুন। আমাদেরকে খাতিমা বিল খাইর নসিব করুন। প্রিয় পাঠক! এতোক্ষণ আমরা যে মহান সুহরাওয়ার্দি শায়খের জীনব ও সাধনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তিনিও একদিন ইন্তিকাল করলেন। চলে গেলেন তাঁর মাহবুবের নিকট চিরতরে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হিজরি ৭৬০ সনে জৈনসীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হযরতের বয়স হয়েছিলো ১০০ বছর। তিনি জৌনসীতেই সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত রহস্য সংরক্ষণ করুন। বুলন্দ করুন তাঁর মাক্বামাতকে। নূরান্বিত করুন হযরতের সমাধিস্থল।

হযরত মাখদুম শায়খ তকিউদ্দিন জৌনসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৭৮৫ হিজরি, সমাধি- জৌনসী, ইলাহাবাদ, ভারত।)

তাঁর নাম সদরুল হক। কুনিয়াত আলী আকবর। তাঁর উপাধিসমূহ হচ্ছে কুদওয়াতুল আরিফীন, ইমামুল মুত্তাক্বীন, সিরাজুল আউলিয়া, মাকশুফুল আসরার, হযরত মাখদুম ইত্যাদি। তিনি সর্বাধিক পরিচিত হযরত শায়খ সাইয়্যিদ তকিউদ্দিন জৌনসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামে। তাঁর পিতা ছিলেন শায়খ সাইয়্যিদ আলী শা'বান মিল্লাত জৌনসী রাহিমাহুল্লাহ।

জন্ম

হযরত তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ ৭২০ হিজরি সনে জৌনসীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনি শিক্ষা শেষে পরিণত বয়সে পদার্পণ করেই তিনি স্বীয় পিতার মুরিদ হন। তিনি সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার কামিল পিতার কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন সুলুকের।

বুখারায় সফর

পিতার নির্দেশে হযরত তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ উজবেকিস্তানের বুখারা শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছুয়ে তিনি সাক্ষাৎ পান হযরত মীর সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বুখারী রাহিমাহুল্লাহর যার পিতার নাম ছিলো শায়খ আবদুল হক কবির রাহিমাহুল্লাহ। মীর সাইয়্যিদ ছিলেন নকশবন্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহিমাহুল্লাহর পিতা।

হযরত মীর সাইয়্যিদ রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে দীর্ঘ ১২ বছর কাটিয়ে দেন হযরত তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। এসময় তিনি আধ্যাত্মিক গভীর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। মীর সাইয়্যিদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ বিশিষ্ট শাগরিদকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। সুতরাং তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ শায়খের বিশেষ সুনজর হেতু বিশেষভাবে উপকৃত হন।

খিদ্বরাবিয়া নামক একটি তরিকাভুক্ত ছিলেন মীর সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর দুজন সন্তান ছিলেন। এর একজন ছিলেন খাজা বাহাউদ্দিন

নকশবন্দ রাহিমাহুল্লাহ। অপরজন ছিলেন মেয়েসন্তান। তাঁর নাম ছিলো রুকমাহ বেগম। মীর সাইয়্যিদ তাঁর প্রিয় শাগরিদ হযরত তকিউদ্দিন জৌনসীর সাথে এই মেয়েকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন।

মীর সাইয়্যিদ রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তাঁর পুত্র বাহাউদ্দিন এসে বললেন, হে আমার প্রিয় পিতা! আমি আপনার নিকট বাইআত গ্রহণ করতে আগ্রহী। মীর সাহেব বললেন, "না! তুমি বরং হযরত আমির কুলাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরিদ হও। এতেই তোমার লাভ হবে। আমার যা আছে সবই তকিউদ্দিনকে প্রদান করেছি।" এরপর তিনি শায়খ তকিউদ্দিনকে সম্বোধন করে বললেন, "বাবা তকি! যেটুকু আধ্যাত্মিক সুফল আমার শায়খ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলাম তা আমি তোমাকেই দান করলাম।" এ ক'টি বাক্য উচ্চারণ করেই মীর সাইয়্যিদ রাহিমাহুল্লাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর থেকে হযরত তকিউদ্দিন জৌনসী রাহিমাহুল্লাহকে মানুষ 'শায়খ' হিসেবে সম্বোধন করতে থাকে। এ কারণেই পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন, 'আমার বংশধরদের যারা এই তরিকায় অধিষ্ঠিত থাকবে তারা সবাই হবে শায়খ।'

ভারতে প্রত্যাবর্তন

সাইয়্যিদ মীর মুহাম্মদ বুখারী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকালের পর শায়খ তকি রাহিমাহুল্লাহ স্বপরিবারে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লিতে পৌঁছুয়ে নিজেকে হযরত সুলতান নিযামুদ্দিন আউলিয়া রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করেন। এ মহান চিশতি শায়খের সুহবতে থেকে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন। হযরত নিযামুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দেন। ভূষিত করেন 'মুফতিয়ে তাসাওউফ' খেতাবে।

একটি স্বপ্ন

হযরত মাখদুম তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ একদা একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন, সুলতান হাবুওউ তাঁকে রেশমি কাপড়ের জুব্বা প্রদান করছেন। এ স্বপ্ন দেখার পর তিনি সুলতানের নিকট গমন করেন। তাঁর নিকট স্বপ্নের বর্ণনা দেন। সুলতান হাবুওউ বললেন, "হ্যাঁ, আমিও একটি স্বপ্ন দেখেছি, আপনি সুলতান শাহ নিযামুদ্দিন আউলিয়া রাহিমাহুল্লাহর দরবারে থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তিনি

আপনাকে খিলাফত প্রদান করেছেন।” তিনি আরো বললেন, “এখন আপনার দায়িত্ব হলো হযরত আলাউদ্দিন জৌনসী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।”

সুতরাং হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহ জৌনসীতে যেয়ে হযরত আলাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিছুদিন তাঁর সুহবতে থেকে চলে যান হযরত বদিউদ্দিন শাহ মাদার মখনপুরী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে। মাদার রাহিমহুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুনোর জন্য আপনি কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন?” তিনি জবাব দিলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!” মাদার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “লা ইলাহা কী, এবং ইল্লাল্লাহ কী? এ ‘অস্বীকৃতি’ ও ‘স্বীকৃতি’র মা’না কী?” হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “এর অর্থ হচ্ছে নিজের অস্তিত্বের অস্বীকৃতি ও হাক্বিক্বাতের (আল্লাহ তা’আলার চিরস্থায়ীত্বের) স্বীকৃতি।” এবার মাদার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকা কী?” তিনি জবাব দিলেন, “নিজ-এর বিলুপ্তি”। আবার প্রশ্ন আসলো, “নিজ কী? এবং আল্লাহ কী?” তিনি বললেন, “নিজ হচ্ছে কাল্পনিক এবং আল্লাহ হচ্ছেন হাদ্বির ও অস্তিত্বশীল।”

উক্ত বাক্যালাপ বেশ কিছু লোকদের সামনে হয়েছিল। উপস্থিত সবাই শুনেছেন। এরপর উভয় বুজুর্গ তিন দিনের জন্য একত্রে নির্জনে থাকলেন। ঐ সময় উভয়ের মধ্যে কী কী আলাপচারিতা, প্রশ্ন-উত্তর বা বাক্যালাপ হয়েছিল তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানলো না। তিনদিন পর উভয় বুজুর্গ জনসমক্ষে বেরিয়ে আসলেন। হযরত শাহ মাদার রাহিমাহুল্লাহ খুব আদবের সঙ্গে মাখদুম তকি সাহেবের সম্মুখে উপবেশন করে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ! আমি একজন আল্লাহর ওলিকে এই মহাসাগরের মধ্যে দেখেছি।” এরপর হযরত মাখদুম তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বিদায় গ্রহণ করেন।

হযরত মাখদুম সাহেবের একটি কবিতা

যদি তুমি চাও যারা পৌঁছুয়েছে তাদের ভাগ
তোমাকে নিছক কথার ঊর্ধ্বে ওঠে আসতে হবে
প্রবেশ করতে হবে আধ্যাত্মিক হালের মাঝে।
তাওহিদের মৌখিক উচ্চারণে তুমি হবে না মুওয়াহহিদ,
চিনি নিয়ে শুধু কথা বললে

তোমার জিহ্বায় মিষ্টির আসল স্বাদ পাবে না।[১১১]

বিভিন্ন ঘটনাবলী

একব্যক্তি হযরত তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন, "হে শায়খ! মাতাল তাওহিদের অর্থ কী?" তিনি জবাব দিলেন, "জানা বিষয়-আসয় ভুলে যাওয়া এবং কাল্পনিক সবকিছু বিলুপ্ত করা।"

শাখয় তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "ফকির হওয়ার পর থেকে আমি খাবার খাইনি, পান করি নি, ঘুমাই নি, সজাগ থাকি নি, বসি নি, দাঁড়াই নি, দেখি নি, শুনি নি কিংবা জানি নি।"[১১২]

হযরতের হালের অবস্থা ও উচ্চতা ঐ পর্যায়ে পৌঁছুয়েছিল যে, তিনি নিজের মুরাক্বাবা সম্পর্কেও অনাবগত থাকতেন। এমনকি দিন-ক্ষণ, মাস-বছর কী ছিলো সেটাও তিনি বুঝতে পারতেন না। একদিন একব্যক্তি এক টুকরো কাগজ নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হলো। সে তাঁকে বললো, "ইয়া শায়খ! অনুগ্রহ করে এ কাগজে আপনার নামটি লিখে দিন।" তিনি কলম হাতে নিলেন- কিন্তু মনে হলো কিংবর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়ে গেছেন। তাঁর খাদিম বুঝতে পারলেন, হযরত নিজের নামটি ভুলে গেছেন! সুতরাং তিনি তাঁকে স্মরণ করে দেন, "আপনার নাম শায়খ তকি!" এরপরই তিনি ঐ কাগজের মধ্যে নিজের নাম লিখতে সক্ষম হলেন।

একদিন তিনি জামে মসজিদে গেলেন। দরোজার সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর খাদিম বুঝতে পারলেন, হযরত ভুলে গেছেন তাঁর ডান পা কোনটি ছিলো! সুতরাং তিনি হযরতের ডান পায়ে হাত বুলালেন। এরপর হযরত মাখদুম প্রথমে ডান পা ঢুকিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন।[১১৩]

---

[১১১] আক্বওয়ালে সালাফ (ইংরেজি অনুবাদ), খ.৪, পৃ. ৫২-৫৩।

[১১২] এ কথাগুলো দ্বারা হযরত ফানালিল্লাহর হালের বর্ণনা দিয়েছেন।

[১১৩] লক্ষণীয় যে হযরত তকিউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ এসব ঘটনার সময় অসুস্থ ছিলেন না। বরং তিনি উচ্চতর হালের অবস্থায় থাকায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যান। -গ্রন্থকার

হযরতের সন্তানাদি

হযরত শায়খ তকিউদ্দিন জৌনসী রাহিমাহুল্লাহর দুজন মাত্র সন্তান ছিলেন। একজনের নাম ছিলো আলী আকবর। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু জাফর। তাঁকে মানুষ সায়্যিদ শাহ মুহাম্মদ আবু জাফর বলে সম্বোধন করতো। তিনি জৌনসীতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। এ সময় হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহ জীবিত ছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের নাম ছিলো হযরত শাহ উসমান আকবর। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আলী আসগর। তিনি ৭৩৭ হিজরি সনে জৌনসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় হিজরি ৮২১ সনে। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৮৪ বছর।[১১৪]

হযরত মাখদুম রাহিমাহুল্লাহর চিরবিদায়

জিলহাজ্জ মাসের ৭ তারিখ, ৭৮৫ হিজরি সনে তিনি এ ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে হযরতের বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর। হে মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, আল্লাহ! আপনার এ প্রিয় বান্দার মাক্বামাতকে বুলন্দ করুন। তিনি জৌনসীতে সমাহিত আছেন।

[১১৪] তাযকিরাহ আউলিয়া জৌনসী।

হযরত শায়খ তকি মাহসুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৮০২ হিজরি, সমাধি- মাহসু, বিহার, ভারত।)

তিনি ছিলেন তরিকায়ে সুহরাওয়ার্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর আরেক বিশিষ্ট খলিফা। আরবভূমি ছেড়ে তিনি চলে আসেন মাহসু নামক জনপদে। এসময় তাঁর পীর শায়খ শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহ জীবিত ছিলেন। হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহ মাহসুতে একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

মাহসু

বর্তমান বাংলাদেশের পশ্চিম দিনাজপুর জিলায় রায়গঞ্জ ও দিলকৌলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে মাহসু নামক এ গ্রামটি অবস্থিত।[১১৫] আমাদের পূর্বসুরী ওলি-আবদালগণ বিহার ও বাংলায় যে ইসলামপ্রচার করেছিলেন সে ব্যাপারে কেনো সন্দেহ নেই। মাহসু ছাড়াও গৌড়, পাণ্ডুয়া, চামনি বাজার ও পৌরনিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ওলিদের সমাধিস্থল এখনও বিদ্যমান থাকাই এর প্রমাণ।

হযরত শায়খ তকি রাহিমাহুল্লাহ সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রসার ঘটান বাংলা-বিহারে। তিনি স্থানীয় এক মুসলিম পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁর দুজন পুত্রসন্তান ছিলেন। একজনের নাম শায়খ নিযামুদ্দিন ও অপরজনের নাম শায়খ সদরউদ্দিন। হযরতের একজন মেয়েসন্তানও ছিলেন।

সংস্কারকাজে অবদান

হযরত তকি মাহসুবী রাহিমাহুল্লাহ দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী করেন। আরব ভূমি থেকে ভারতের এক অজানা-অচেনা জনপদে আসেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে। এখানকার মানুষের ভাষা ও কৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর কেনো ধারণাই ছিলো না। তবে তিনি অচিরেই স্থানীয়দের ভাষা শিখে নেন। সত্যধর্ম ইসলামের দাওয়াতী কাজে নিজেকে

---

[১১৫] এ তথ্যটি এসেছে হযরত শায়খ কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী প্রণীত আক্বওয়ালে সালাফ, খ. ৪, পৃ. ১৬৪ থেকে। তবে আমি (গ্রন্থকার) অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারি, মাহসু নামক গ্রামটি ভারতের বিহার প্রদেশের আওরঙ্গবাদের কুতুম্বা তেহসিলে অবস্থিত।

পুরোদমে জড়িয়ে রাখেন। তাঁর উত্তম চরিত্র, পরহেজগারী, আকর্ষণীয় দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে অমুসলিমরা প্রভাবিত হয়। দলে দলে লোকজন এসে তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মালামাল হতে থাকে।

'মুনিসুল ক্বুলুব' নামক একটি কিতাবে আছে, হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহ হিন্দু প্রথা 'সতীদাহ' বন্ধের জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনা করেছিলেন। তাঁর এক মুরিদের নাম ছিলো আবু মুসলিম। তাঁর মাতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী থাকাবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়। হিন্দু ধর্মমতে এ মহিলাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার আয়োজন করা হলো মৃত স্বামীর সাথে। কিন্তু তিনি এর বিরোধিতা করেন। প্রাণ বাঁচাতে ছুটে আসেন হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহর নিকট এবং স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হন। এসময় তাঁর সাথে নিয়ে আসেন একমাত্র পুত্র আবু মুসলিমকে। হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহ এ ইয়াতিম ছেলেকে নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। পরিণত বয়সে তাকে মুরিদ করে সুলুকের রাস্তায় উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করতে সহায়তা করেন।

হযরতের খুলাফা

আবু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা। তিনি নিজের কোনো সন্তানকে খিলাফতি প্রদান করেন নি। হযরত আবু মুসলিমের পর খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন হযরত আমিন জাহিরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। তিনি দ্বীনের দাওয়াতী কাজে আরো বেশি তৎপর ছিলেন।

হযরত শায়খ তকি রাহিমাহুল্লাহর আরো বেশ কয়েকজন খলিফা ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত শায়খ সালমান সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একদিকে তরিকতের শায়খ ছিলেন এবং অপরদিকে সে যুগের একজন বড়ো ধনী ব্যক্তিও ছিলেন। খুব বিরল এ মিলনটি সত্যিই ইসলামের জন্য বিশেষ নিয়ামত বলা যায়। হযরত সালমান রাহিমাহুল্লাহ মুরিদ হওয়ার পর নিজের জীবন ও সম্পদ দ্বীনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। স্বীয় শায়খের নিকট থেকে তরিকতের উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে তিনি জান-মাল বিলিয়ে দেন ইসলামের প্রচার-প্রসারে। হাজার হাজার মুসলিম, অমুসলিম তাঁর নিকট ছুটে আসেন। তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন অনেকেই। যারা অমুসলিম ছিলো তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়। এ মহাত্মন ওলিআল্লাহ ও দ্বীনের বিশিষ্ট দায়ী ৭৫২ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত সালমান সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকালের পর মাহসুতে অবস্থিত খানক্বার দায়িত্ব নেন তাঁরই খলিফা হযরত মাখদুম হুসাইন গরীব দাহকারপৌষ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি দীর্ঘদিন খানক্বার খিদমাত আঞ্জাম দেওয়ার পর ৮০২ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর তিনজন খলিফা হযরত জিয়াউদ্দিন সুহরাওয়ার্দি চান্দুসী, হযরত শায়খ নাসির ও হযরত শায়খ ফখরুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম অত্র অঞ্চলে তরিকতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ অব্যাহত রাখেন।

পৌরনিয়া ও এর আশপাশ অঞ্চল হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহর সমসাময়িক আরো কয়েকজন বিখ্যাত সুহরাওয়ার্দি শায়খের পদার্পণে ধন্য হয়েছে। এদের মধ্যে হযরত শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর খলিফাবৃন্দ ছিলেন অন্যতম।

হযরত জালালুদ্দিন তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহ সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের (মৃ. ১২৩৬ ঈ) আমলে পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন। তিনি এখানে এসে ভূমি ক্রয় করে একটি খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছরব্যাপী দ্বীনের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত থাকেন। হযরত তাবরিযী রাহিমাহুল্লাহ শেষ বয়সে আসামের গৌহাটিতে যান। আর এখানেই (মৃ. ৬৪২ হি. / ১২৪৪ ঈ.) তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরতের ৩৬০টি আধ্যাত্মিক আস্তানা বাংলা-বিহার-আসামে ছিলো বলে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়। তবে এখন এগুলোর অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় নি। অন্য বর্ণনায় আছে, সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর সত্তুরজন মুরিদ-খলিফা উক্ত অঞ্চলে এসে সুহরাওয়ার্দি সুফি তরিকার খিদমাত করেছিলেন।

হযরত খাজা আহমদ দামেস্কী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর একজন বিশিষ্ট খলিফা। তিনি উক্ত অঞ্চলে এসে ইসলাম ও তরিকতের প্রসার ঘটান। পাণ্ডুয়া থকে ১৫ মাইল দূরে দেওতলা নামক একটি গ্রামে তাঁর এক বিশিষ্ট খলিফার সমাধি অবস্থিত। এখানে একটি খানক্বাও ছিলো।

কিতার জিলায় অবস্থিত ‘বারসুই’ নামক স্থানের নিকটস্থ একটি জনপদের নাম জালকি। সুহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার একজন প্রবীণ ওলি হযরত মাখদুম হুসাইন

তীগ রাহিমাহুল্লাহর একটি খানক্বাহ এখানে স্থাপিত ছিলো। তিনি খানক্বায় থেকে অসংখ্য মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে নিসবত সৃষ্টিতে সহায়তা করেন।[১১৬]

হযরত তকি রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকাল

হযরত তকি মাহসুয়ী রাহিমাহুল্লাহ ৮০২ হিজরি সনে বিহারের পৌরনিয়া জিলাধীন স্বীয় কর্মক্ষেত্র মাহসুতে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর সমাধি এখানেই অবস্থিত। হে আল্লাহ! আপনার এই বিশিষ্ট ওলির ওপর বর্ষণ করুন রহমতের বারিধারা।

[১১৬] পৌরনিয়া কি দো ওয়ালি- ভূমিকা, পৃ. ৬।

হযরত শায়খ মাখদুম হুসামুদ্দিন চিশতী সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৮৫৫ হিজরি, সমাধি- ফতেহপুর, ইউপি, ভারত।)

নাম ও বংশ

তাঁর নাম হুসামুদ্দিন। পিতার নাম মুহাম্মদ আকবর। তবে তিনি বেশি পরিচিত হযরত মাখদুম হিসেবে। জ্ঞানবান-প্রজ্ঞাবান ওলিআল্লাহ ব্যক্তি হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর।

পরিবারের দিল্লিতে আগমন

হযরত মাখদুম রাহিমাহুল্লাহর পূর্বপুরুষগণ আরব ভূমি ছেড়ে প্রথমে (বর্তমান ইরানের) সুহরাওয়ার্দে আসেন। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন দীর্ঘদিন। এরপর পরিবারের একটি শাখা গজনিতে যেয়ে বসবাস শুরু করেন। সম্ভবত হযরত মাখদুমের জন্ম হয় গজনিতেই। তিনি হয় একাকী না হয় তাঁর পিতার সাথে মুলতানে আসেন। এরপর এখান থেকে চলে আসেন ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। হযরতের বয়স তখনও অল্প ছিলো। দিল্লিতে এসে তিনি কাজি আবদুল মুক্তাদির দেহলবীর নিকট ইলমে শরীয়তের পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর মুরিদও হয়েছিলেন।

যে সময় হযরত মাখদুম দিল্লিতে আসেন তখন কাজি মুক্তাদির দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র ও শাগরিদদের সংখ্যা ছিলো অনেক। তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেন শায়খ কাজি শিহাবুদ্দিন দৌলতপুরী রাহিমাহুল্লাহ ও শায়খ আবুল ফাতাহ জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহর মতো উচ্চ পর্যায়ের শায়খদ্বয়। এবার শায়খ মাখদুম হুসামুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহও এ দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন। সঙ্গত কারণেই অনেক ছাত্র-শাগরিদের মধ্যে এ তিনজন বিশেষভাবে কাজি সাহেবের নজর কাড়েন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে মনেরমতো করে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান।

কাজি আবদুল মুক্তাদির দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁরই নাতি ও শাগরিদ হযরত আবুল ফাতাহ জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে এক বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে হযরত মাখদুম রাহিমাহুল্লাহর। একই সময় তিনি তাঁকে খুব সম্মানের চোখে দেখতেন- কারণ তিনি ছিলেন নিজের উস্তাদের নাতি।

ফতেহপুরে আগমন

হযরত শায়খ আবুল ফাতাহ সিদ্ধান্ত নেন জৌনপুরে যাত্রা করবেন। হযরত মাখদুম তাঁর সঙ্গী হতে ইচ্ছাপোষণ করলেন। এক বিরাট কাফেলা জৌনপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে কাফেলা যখন ফতেহপুর বারানবানকিতে এসে যাত্রাবিরতি করে তখন আবুল ফাতাহ রাহিমাহুল্লাহ মাখদুম রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, "আপনি এখানেই থেকে যান। অত্র অঞ্চলে দ্বীনের দাওয়াত দিন। তরিকতের খিদমাত করুন।" হযরত মাখদুম এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ও ফতেহপুরে বসবাস শুরু করেন।

ইতোমধ্যে তিনি চিশতিয়া তরিকায় খিলাফত লাভ করেছিলেন হযরত কাজি আবদুল মুক্তাদির দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে। ফতেপুর এসে তিনি শায়খ সারং লৌখনবী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে সুহরাওয়ার্দি তরিকায় দীক্ষা নেন ও খিলাফত লাভ করেন। সুতরাং তিনি উভয় তরিকার শায়খ হিসেবে পরিচিত হন।

হযরতের খানক্বাহ

ফতেহপুরে কিছুদিন অবস্থানের পরেই তিনি খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করেন। আগের যুগে খানক্বাভিত্তিক দ্বীনের কাজ হয়েছে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র। খানক্বায় থাকতো শরীয়ত ও তরিকত এ উভয়টির তা'লিম-প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা। হযরত মাখদুম রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায় দিন দিন মানুষের আগমন বাড়তে থাকে। অসংখ্য ব্যক্তি খানক্বায়ী কার্যক্রম দ্বারা উপকৃত হন।

ফতেহপুর ও আশপাশ অঞ্চলে একবার দীর্ঘ দু বছরব্যাপী অনাবৃষ্টি চলে। হযরত শাহ কলন্দর রাহিমাহুল্লাহ তাঁর প্রণীত 'হুজ্জাতুল আরিফীন' কিতাবে উল্লেখ করেন:

> "অনাবৃষ্টির ঐ দিনগুলোতে হযরত মাখদুম শায়খ হুসামুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর ধন-সম্পদ এতো বেশি ছিলো যে, প্রত্যেকদিন ২০০০ গরিব হতদরিদ্র মানুষ তাঁর খানক্বায় এসে আহার করতো। এছাড়া তাঁর নিজস্ব সঙ্গী-সাথী ও মুরিদান তো ছিলেনই যারা খানক্বায় নিয়মিত হযরতের সঙ্গে খাবার খেতেন।"

গুরুত্বপূর্ণ একখানা পত্র

হযরত মাখদুমের বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো হযরত মাখদুম আখি জমশেদ রাজগরী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে। তিনি তাঁর বন্ধুর নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখেন। এখানে এটি তুলে ধরা হলো।

“বেচারা হুসামুদ্দিন হচ্ছে সালিকীনের পদধূলির সমান। একটি অপবিত্র কুকুর ফকির-দরবেশদের প্রবেশদ্বারের। সে এ জনশূন্য জমিনের ওপর আত্মবিস্মৃত ও নিরুদ্দেশ। সে জানে না কী করতে হবে ও কীভাবে করতে হবে। একজন কবি বলেন:

হৃদয়ে থাকে যদি বহুদেবতাবাদ, সিজদায় কী উপকার হতে পারে?
বিষ যখন হৃদপুরীতে প্রবেশ করে নিয়েছে
কী এখন উপকার হবে প্রতিষেধক ঔষধে?

যখন থাকে তাওহিদ, তখন- নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত সবকিছুই উপকারী হয়। আর যদি তাওহিদ থাকে না- সবকিছু অকেজো। যারা আল্লাহওয়ালা ও যারা আল্লাওয়ালা নয়, এদের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। বাইরের দিকে আমাদেরকে মানুষের মতো লাগে ঠিকই। বাস্তবে আমরা ওদের থেকে অধম- মানুষই নয়। আজকাল সকলেই শায়খ হওয়ার জন্য ব্যকুল। কিন্তু এসবই বাতুলতা। এটা বাস্তবে ‘আত্মউপাসনা’ ছাড়া কিছু নয়। এতে আল্লাহর ইবাদতের কিছু নেই। আমাদের হৃদয় যেটি পছন্দ করে সেটিকেই ‘প্রভু’ বানিয়ে ফেলেছি। শুধুমাত্র ‘আল্লাহ তা’আলা এক’ বলাটাই যথেষ্ট নয়। কারণ, আমল ছাড়া ইলম হচ্ছে বিপর্যয়। আর আমল ছাড়া উপদেশবাক্য অবশ্যই একটি নির্যাতন![১১৭] যখনই হৃদয়ের কর্ম ও জিহ্বার কথার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে, তখনই বলা যাবে এটা তাওহিদ।

আমার তো সত্যিকার একত্ববাদী কাউকে চেনারও ক্ষমতা নেই। তবে আপনার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসার ওপর আমার আশা আছে। ঠিক যেভাবে আপনি কুফরির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আমি আপনাকে আবদার জানাচ্ছি যে, এ অধম পাপীকে আপনার পবিত্র সুহবতে স্থান দিন। তাকে পবিত্র করুন অবিশ্বাস ও শিরকের পঙ্কিলতা থেকে। এ পাপী পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে ডুবে যাচ্ছে। সে সবদিকে

[১১৭] আজ থেকে প্রায় ৬ শত বছর পূর্বেও যদি মানুষের আমল-ঈমানের অবস্থা এরূপ নাজুক হয়ে থাকে- তহালে চিন্তার ব্যাপার আজকের অবস্থা কতটুকু নিম্নপর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুয়েছে। ঈমান-আমলের অবস্থা এখন নিভুনিভু বললে অত্যুক্তি হবে না। আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন। -গ্রন্থকার

তার হাত-পা প্রসারিত করে ভেসে থাকার চেষ্টায় জলে আঘাত হানছে। হাবুডুবু খাচ্ছে। যাকিছু হাতের নাগালে পাচ্ছে তাতে আঁকড়ে ধরে ঠিকে থাকতে চেষ্টা চালাচ্ছে।

আমার অন্তরে একটি ভাবনা এসে দানা বেঁধেছে। আল্লাহ-প্রেমের দুটি মাত্র রাস্তা আছে। হয় তা আসবে স্বীয় মুর্শিদের স্নেহময় দৃষ্টির মাধ্যমে, না হয় আসবে তা কেনো আহলুল্লাহ আপনজন থেকে। দুর্ভাগ্যবশত এ অধমের না আছেন কেনো মুর্শিদ, না কেনো আহলুল্লাহ আপনজন পৃথিবীর বুকে।

পাপী খুঁজছে হন্যে হয়ে আল্লাহ-প্রেমের ছোঁয়া। কিন্তু সে শুধু দেখতে পায় অহংবাদী ও আত্মউপাসকদের! হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিচে উদ্ধৃত বাণীটি আমাকে একাকী থাকতে উদ্বুদ্ধ করে:

هٰذَا زَمَانُ السُّكُوْتِ - وَلُزُوْمُ الْبُيُوْتِ

-এটি একটি নিরব থাকার যুগ ও গৃহে পড়ে থাকার যুগ।

একই সময় নিচে উদ্ধৃত হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর কথাটি নিয়েও আমি ভাবি:

اَلْعُزْلَةُ مُقَارَبَةُ الشَّيْطَانِ - وَالصُّحْبَةُ رِضَاءُ الرَّحْمٰنِ

-একাকীত্ব কাউকে শয়তানের কাছে নিয়ে যায়, অপরদিকে সুহবত আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়।

উপরের কথাটি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীকে সমর্থন করে:

الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَمِنَ الْأِثْنَيْنِ بَعِيْدٌ

-যে কেউ একাকী তার সঙ্গে শয়তান থাকে, কিন্তু দুজন থেকে সে দূরে।

আপনি অবশ্যিই একজন সত্যিকার ইনসান। আমি আশাকরি যাকিছু বলেছি তা সত্য বলে মেনে নিবেন। একই সময় এ অধমকে আপনার দুআর সময় ভুলে যাবেন না।

আমি আপনার নিকট আবদার জানাচ্ছি, যখন দুআ করবেন তখন বলবেন: "আল্লাহ তা'আলা যেনো অমুক অমুক ব্যক্তিকে মুসলমান হতে সাহায্য করেন।"

খাজা আহওয়াদ বলেছেন:
"ওহ আহওয়াদ! তুমি তোমার সম্পদের অপ্রতুলতা হেতু বিষণ্ন হতে পারো না। তোমাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করা হয়েছে। এরপরও তুমি তাওবাহ করো নি! তুমি পরতে পারো সবুজ বস্ত্রাদি, সুফির আসনে বসতে পারো, সবার নিকট শায়খ হিসেবে পরিচিত হতে পারো- এসব ব্যাপার হয়েছে হয়তো, কিন্তু তুমি এখনও সত্যিকার মুসলমান হও নি!"

এমন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিত্বও যদি তাঁর ইসলাম সম্পর্কে এরূপ বলে থাকেন, আমাদের মতো পাপীরা কীভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

হে তুমি (নিজ) গাফিল অসতর্ক লোক! তুমি ঘুমের ঘোরে, অপরদিকে শিকার তোমাকে কব্জা করতে ওঁৎপেতে বসে আছে। এটা কী বুদ্ধিমানের কাজ হলো?

ওয়াসসালাম।"

হযরত মৌলবী মাসউদ আলী সাহেব যিনি হচ্ছেন হযরতের পরিবারভুক্ত, এ চিঠির ওপর একটি আকর্ষণীয় মন্তব্য করেন। তিনি বলেন:

> "হযরত মাখদুম শায়খ হুসামুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর বদান্যতা, পরহেজগারী ও সনির্বন্ধতার সাক্ষর এ চিঠি বহন করে। সুলুকের রাস্তায় আত্মগৌরব ও নিজের প্রতি উচ্চ ধারণা হচ্ছে অতি মারাত্মক দুটি গভীর গর্ত। এগুলো প্রত্যেক বাঁক ও উঁচু-নীচুতায় অপেক্ষা করছে। আর বিষয়টি তখন আরো ক্ষতিকর হয়ে ওঠে যখন সালিক নিজেই বুঝতে পারে না যে, সে এরূপ একটি গর্তে পতিত হয়ে গেছে! অথচ দেখুন, কী উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন শায়খ মাখদুম রাহিমাহুল্লাহ। কাজি আবদুল মুক্তাদি রাহিমাহুল্লাহ মুরিদানের মাজমায় বসে গৌরবের সঙ্গে বলতেন, "আমরা শায়খ হুসামুদ্দিনকে মুরিদ হিসেবে পেয়ে গর্বিত।"

সাধারণ মানুষ তো বটেই, তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুজন ও আত্মীয়স্বজন তাঁকে যুগের কুতুব হিসেবে জানতেন। তিনি ছিলেন বিরাট সংখ্যক মানুষের মুর্শিদ ও পথপ্রদর্শক। এসব ক্ষেত্রেও দেখুন, উক্ত চিঠিতে তাঁর বদান্যতা ও আত্মম্ভরিতাহীনতা কী সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। আমি মনে করি, তাঁর উচ্চ পর্যায়ের ওলায়েত ও মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য বহন করে এই পত্রটি। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য।

হযরত মাখদুম রাহিমাহুল্লাহর সন্তানাদি

হযরতের একজন মাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। তিনি মাখদুম মিনহাজুদ্দিন নামে পরিচিত। তাঁর একজন কন্যাসন্তানও ছিলেন। শায়খ মিনহাজুদ্দিনের নাতির নাম ছিলো মাখদুম কুতুবুদ্দিন এবং তাঁর সন্তানের নাম ছিলো মাখদুম আবদুল গনি। শেষোক্ত ব্যক্তির অনেক সন্তানাদি ছিলেন। তাঁদেরই বংশধর আজকের ফতেহপুরে বসবাসকারী মাখদুম পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গ।[১১৮]

ইন্তিকাল

বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্রে জানা যায়, ৮৫৫ হিজরি সনে হযরত শায়খ সারংয়ের খিলাফত প্রাপ্তির সময় হযরত মাখদুম রাহিমাহুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এর এক বা দু বছর পরে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাবানকি জিলাধীন ফতেহপুরেই সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলার তাঁর বিশ্রামস্থলকে নূরান্বিত করুন। বুলন্দ করুন তাঁর মাক্বামাতকে।

---

[১১৮] সূত্র: 'মাখদুম জাদগান ফাতাহপুর'- মাওলানা মাস'উদ আলী।

হযরত শায়খ সাইয়্যিদ কুতুবুদ্দিন কৌরাহ জাহানাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৯৪৬ হিজরি, সমাধি- কৌরাহ, জাহানাবাদ, ভারত।)

তাঁর নাম সাইয়্যিদ কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। পিতার নাম সাইয়্যিদ হিবাতুল্লাহ সানী। হযরত কুতুবুদ্দিন নিজেই বলেন, আমার জন্ম হয় ফতেহপুর হানসুতে ৮৬৩ হিজরি সনে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

দুটি বছর বয়স মাত্র হযরত কুতুবুদ্দিনের। প্রিয় আম্মাজান চিরবিদায় গ্রহণ করলেন একটি দুর্ঘটনা হেতু। মাতৃসূলভ আদর-যত্নের ভার পড়লো তাঁর দাদীজানের ওপর।

স্থানীয় একটি মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষার্জন শেষে তিনি জৌনপুরে যেতে ইচ্ছাপোষণ করেন। এ সময় শারক্বী সুলতানের তত্ত্বাবধানে জৌনপুর ইলম ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। দ্বীনে জ্ঞানবান অনেক উচ্চ পর্যায়ের উলামা ও গবেষকবৃন্দ দ্বারা তখন জৌনপুর আলোকিত হয়ে গেছে। হযরত কুতুবুদ্দিন জৌনপুরে পৌঁছুয়ে শামসুল হক হক্কানী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহর পরিচালিত মাদরাসায় আসেন।

হযরত শামসুল হক হক্কানী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ: তিনি ছিলেন জৌনপুরের বয়োজ্যেষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উস্তাদ ও পীর ছিলেন হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তাজ রাহিমাহুল্লাহ। শামসুল হক রাহিমাহুল্লাহ শরীয়ত অনুসরণের ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। মানুষকে ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের দিকনির্দেশনা দিতেন। শরীয়তকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে জৌনপুরের শাসকদেরকেও তিনি ছাড় দেন নি। সর্বদা তাদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। তাঁর এসব কার্যক্রম হেতু মানুষ তাঁকে হক্কানী উপাধিতে ভূষিত করে।

মোটকথা, হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ শাসমুল হক হক্কানী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহর মতো একজন উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষক ও সুফির নিকট ইলমে শরীয়তের উচ্চতর পাঠ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ছাত্রের প্রতি উস্তাদের দয়া-মায়া

উস্তাদ যখন তাঁর ছাত্রের গুণাবলী ও মেধা সম্পর্কে অবগন হন তখন স্বভাবতই তার প্রতি বিশেষ দয়া-মায়া ও আকর্ষণ তৈরি হয়। সুতরাং শায়খ কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ সহপাঠীদের তুলনায় উস্তাদের বেশি দয়া-মায়ার পাত্রে পরিণত হন। কোনো কেনো সময় দেখা যেতো বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে হযরত কুতুবুদ্দিনের তর্কের ওপর স্বয়ং উস্তাদ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এর দ্বারা হযরতের জ্ঞান-প্রজ্ঞার ব্যাপ্তির বিকাশ ঘটতো। শায়খ শামসুল হক রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকেই হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ শরীয়তের সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

মাদরাসার শিক্ষক

জৌনপুরের যে মাদরাসায় অধ্যয়ন করেছিলেন, সেখানেই হযরত কুতুবুদ্দিন শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতায়ও তাঁর একক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। তিনি সহজেই নতুন ছাত্রদের বুদ্ধিমত্তা ও মেধার মাত্রা ধরতে পারতেন। যেমন কোনো নতুন ছাত্র মুহতামিম (শায়খ শামসুল হক) সাহেবের সম্মুখে হাজির হলেই প্রশ্ন করতেন: "তুমি কোথায় কোন শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া করেছো?" এটা জানার পর মুহতামিম সাহেব ছাত্রের মেধা অনুধাবন করে পাঠিয়ে দিতেন হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর নিকট।

মাদরাসার শিক্ষক থাকাবস্থায় একদা হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন, কুতবে আলম হযরত শায়খ নূরুল হক পাণ্ডুবী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতে যাবেন। কিন্তু শায়খ শামসুল হক রাহিমাহুল্লাহ যাওয়ার অনুমতি দিলেন না।

সম্মানের পাগড়ি

স্বীয় উস্তাদের সুহবতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর শায়খ কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ আলাদাভাবে দ্বীনি খিদমাত আঞ্জাম দেওয়ার অনুমতি পেলেন। শায়খ শামসুদ্দিন জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ একদিন কুতুবুদিন রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর হামজামাতী হুসাইন ইবনে তাহির রাহিমাহুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন। উভয়কে বিশেষ সনদপত্রসহ সম্মানের পাগড়ি পরিয়ে দিলেন। উপদেশ দিলেন, "তোমরা এবার নিজেদের উদ্যোগে দ্বীনি খিদমাত আঞ্জাম দিতে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলো।"

তাসাওউফচর্চা

বাহ্যিক ইলম অর্জনের পর হযরত কুতুবুদ্দিন আভ্যন্তরীণ ইলম তথা তাসাওউফের প্রতি মনোযোগ দেন। আর তাসাওউফের জ্ঞান কিতাব থেকে অর্জন সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন কোনো মুর্শিদের সুহবত লাভ। শায়খ কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ এ লক্ষ্যর্জনে চলে যান হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন ইবনে শায়খ নাতু জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে। উচ্চ পর্যায়ের এই ওলিআল্লাহ ছিলেন চিশতিয়া-নিযামিয়া এবং সুহরাওয়ার্দিয়া-শাত্তারিয়া সিলসিলার শায়খ।

খিলাফত লাভ

বেশ কিছুদিন শায়খ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে থেকে তরিকতের বিভিন্ন মাক্বামাত পাড়ি দিলেন হযরত শায়খ কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। এরপর একদিন পীর সাহেব তাঁর এ বিশিষ্ট শাগরিদকে ডেকে কাছে নিয়ে আসলেন। বললেন:

> তরিকতের আকাবিরদের থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, তোমাকে যেনো খিলাফত দানে ভূষিত করি।

হযরত কুতুবুদ্দিন বিনয়ের সুরে বললেন, হযরত! এ গুরুদায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু শায়খ বললেন, তোমাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অনেক মানুষ তোমার দ্বারা উপকৃত হবে। এর কদিন পর শায়খ নিজের হাতে খিলাফতের খিরক্বা পরিয়ে দিলেন হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ গায়ে। বললেন, হে শায়খ কুতুবুদ্দিন! এখন থেকে তুমি মুরিদ করার অনুমতি পেলে।

এক বন্ধুকে পাওয়া গেলো, দায়িত্বও দেওয়া হলো।
সব প্রশংসা আল্লাহর, উভয় কর্ম সাধন হলো।

ফতেহপুরে প্রত্যাবর্তন

সেই ছোট্ট ছেলেটি, যাকে তাঁর দাদা নিজের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চান নি। কিন্তু ছেলের আগ্রহ তীব্র ছিলো। তিনি চলে গেলেন। এবার সে-ই ব্যক্তি পরিণত বয়সে পদার্পণ করে, শরিয়তের গভীর জ্ঞানী ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার শায়খ হওয়ার মর্যাদাসহ ফিরে আসলেন নিজের পূর্বপুরুষের বাসস্থানে।

ফতেহপুর পৌঁছার পর শায়খ মাখদুম সেখানকার আরেক বুজুর্গ কাজি শায়খ নিযামুদ্দিন ফতেহপুরী রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকেও চিশিতিয়া-সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় খিলাফত লাভ করেন।

অন্যান্য আকাবিরদের থেকেও ইজাযত লাভ

আল্লাহ তা'আলার দয়ার সীমা নেই। তিনি যাকে ইচ্ছে হাক্বিকাতের নূরে মালামাল করেন এবং এ জন্য বেছে নেন তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তাঁকে ওয়াসিলা হিসেবে। হযরত কুতুবুদ্দিন কৌরাহ জাহানাবাদীও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া-মায়ার পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁকে প্রথমে জৌনপুরে নিয়ে যান। শরিয়তের উচ্চতর পর্যায়ের জ্ঞানার্জন শেষে হযরত বাহাউদ্দিন জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে খিলাফত লাভ করেন। ফতেহপুর ফিরে এসে চিশতিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায়ও খিলাফত প্রাপ্ত হলেন। এ সব কিছুই মহাপ্রভুর করম ও রহমের কারণে হয়েছিল। এরপরও হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর মধ্যে আরো উচ্চতর মাক্বামে আরোহণের চেষ্টা-সাধনা থেমে যায় নি।

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهُ

-কেউ যখন নিজেকে আল্লাহর অনুরক্তির মধ্যে ডুবিয়ে দেয় তখন আল্লাহ হয়ে যান তারই।

মানিকপুরে হযরত জাহানাবাদী

মানিকপুরে একটি খানক্বাহ ছিলো। সেখানে অবস্থান করছিলেন, কুতবে আলম শায়খুল মাশাইখ হুসামুদ্দিন এবং শায়খ মিরা সাইয়্যিদ হামিদ শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। হযরত কুতুবুদ্দিন জাহানাবাদী রাহিমাহুল্লাহ এ দুজন ওলির সুহবত লাভের আশায় চলে আসেন মানিকপুরের খানক্বায়। এখানে তিনি আরও সাক্ষাৎ লাভ করেন হযরত মাখদুম জাদাহ রাজী সাইয়্যিদ নূর রাহিমাহুল্লাহর। মুবারক এ খানক্বায় যেটুকু সময় তিনি কাটিয়েছিলেন তা থেকে কী পরিমাণ আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করেন তা ভাষায় বলা যাবে না। এছাড়া সাইয়্যিদ নূরা রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে খিলাফতও প্রদান করেন। বরকতের জন্য নিজের জায়নামায উপহার দেন।

হিজরতের নিয়তে ফতেহপুর ত্যাগ

কোনো এক ঐশি ইশারায় একদা পরিবার-পরিবর্গসহ হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ পবিত্র হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মাত্র ত্রিশ মাইল অতিক্রমণের পর জাহানাবাদের কৌরাহ শহরে আগমন করেন। এ শহরটি একদিন শরীয়ত ও তরিকতের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। চিন্তা করুন, আল্লাহর এক প্রিয় বান্দাহ ফতেপুর ত্যাগ করলেন পবিত্র হাজ্জ পালনের নিয়তে হিজাযে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু জাহানাবাদের কৌরাহতে আসার পর আকাবিরগণ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তোমার কর্মস্থল এখানেই। সুতরাং তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কৌরাহকে বেছে নিলেন। তিনি মনোযোগ দিলেন এ শহরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে রূপান্তরে।

শিক্ষা ও দিকনির্শেনা দান

জাহানাবাদের কৌরাহতে বসবাস শুরুর পর তিনি মনোযোগ দেন মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশা দানে। তিনি কেনো এ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করলেন তার ব্যাখ্যা হযরত নিজেই দিয়েছেন:

> "কৌরাহতে আসার পর দেখলাম এ শহরে কোনো দ্বীনি শিক্ষার পরিবেশ নেই- আর এ কারণে শিক্ষার্থীও অনুপস্থিত। আমি ভাবলাম, এ শহরটি দ্বীনের ব্যাপারে গরীব হয়ে গেছে! এখানে ছাত্রদেরকে একত্রিত করতে হবে। কিন্তু কোথায় থেকে আসবে তারা? সুতরাং নিজেকে আরো গভীরভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে নিমজ্জিত করি। এরপর দেখা গেলো অনেক ছাত্র এসে দারসে শরীক হতে লাগলো। আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছে করেন তাদেরকে হিদাআত করেন। আল্লাহ বলেন:
>
> وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا * وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
>
> -যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। [আনকাবুত: ৬৯]
>
> আমার মুরুব্বিদের সহযোগিতায়, আমি নিজেকে শিক্ষক হিসেবে জড়িয়ে রাখার প্রেরণা পাই।"[১১৯]

---

[১১৯] আক্বাওয়ালে সালাফ (ইংরেজি অনুবাদ), খ. ৪, পৃ. ৪৮৬।

দারসদানের পদ্ধতি

হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর দারসদানের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ছিলো। সে যুগে ইতোপূর্বে তাঁর মতো দারসদান কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। একটি নমুনা দেখলে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে।

হযরত রাহিমাহুল্লাহ পবিত্র কুরআনের এই আয়াতাংশ:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

-নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। [হাশর: ৯ (অংশ)]
-এর ব্যাখায় বলেন:

"এ আয়াতটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শানে নাজিল হয়েছে। তিনি মেহমানদের খাবার পরিবেশন করেন কিন্তু অতিরিক্ত খাবার অবশিষ্ট না থাকায় নিজে অনাহারে থাকেন। অপর আরেক রিওয়াত থেকে জানা যায় এ আয়াতটি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শানে নাজিল হয়েছিল। বর্ণিত আছে, একদা তাঁর ঘরে খাবার তৈরি হলো। তিনি যখন তা ভক্ষণ করতে বসেছেন, তখন একজন ভিক্ষুক এসে খাবার চাইলো। তিনি নিজে না খেয়ে ভিক্ষুককে সব খাবার দিয়ে দিলেন। অনুরূপ পরের দিন একই ঘটনা ঘটলো। তৃতীয় দিনও ভিক্ষুক এসে আবদার জানাল তিনি খাবার দিয়ে দিলেন। অন্যান্য মুফাসসিরীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন, এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে হযরত তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্যে করে। এছাড়া আয়াত নাজিলের কারণ হিসেবে অন্যান্য সাহাবিদের আমলের কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। তবে ব্যাপারটি হলো কোন্ সাহাবির শানে এটি নাজিল হয়েছিলো সেটি বড়ো কথা নয়। কারণ আয়াতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি বর্ণিত সকল সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের শানে এ পবিত্র আয়াতটি নাজিল হয়েছে।" সুবহানাল্লাহ! কী যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।

এবার আমরা একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় হযরত কী বলেছেন তা দেখতে পারি। হাদিসটি এই:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»

-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও হালকা কৌতুকও করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোটভাইকে [কৌতুক করে] বলতেন: “ওহ আবু উবাইর! কোথায় গেলো নুগাইর?” [উল্লেখ্য, পরবর্তীতে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন]: “আমার ছোট ভাই উবাইরের একটি ‘নুগাইর’ (ছোট) পোষা পাখি ছিলো। সে এটিকে নিয়ে খেলাধূলা করতো। একদিন এ পাখিটি মারা যায়। সুতরাং কৌতুক করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ও আবু উমাইর! তোমার নুগাইর কোথায় গেলো?” [সহীহ বুখারী]

হযরত কুতুবুদ্দিন জাহানাবাদী রাহিমহুল্লাহ বলেন:

“এই হাদিস থেকে কয়েকটি বিষয় আমরা অবগত হলাম:

১. ছোট্ট বাচ্চাদের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শন।

২. কারো প্রতি যখন কোনো বিপদ পতিত হয় কিংবা কেউ যদি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় তাহলে আমাদের উচিৎ হবে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান।

৩. আইনসম্মত হালকা কৌতুক করা।

৪. শিকারের জন্য পাখিদেরে পোষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৫. কথাকে আকর্ষণীয় করতে ছন্দের ব্যবহার।

উপরোক্ত প্রতিটি কাজ মুস্তাহাব আমল। এছাড়া, আমরা জানতে পারলাম যে, সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য হলেও জবর ব্যবহার করা বৈধ।”

নামাযে আল্লাহ-চেতনা

হযরত মাখদুম রাহিমাহুল্লাহর নামাযের অবস্থা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলো। সময় আসার আগেই তিনি নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। ঠিক সময় উপস্থিত হয়ে গেলেই দেখা যেতো তিনি মুসাল্লায় উপস্থিত হয়েছেন। সুন্নাত নামায থাকলে পড়ে নিতেন। তিনি যখন বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে যান তখন খাদিমরা তাঁকে নামাজে দাঁড়াতে সাহায্য করতেন। এরপর নিজে নিজেই পুরো নামায আদায় করতেন। এ

সময় তাঁর তেমন কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হতো না- অথচ, নামাজ ছাড়া অন্যান্য সময় খুব কষ্ট করে চলাফেরা করতেন।

নামাযে 'তা'দিলে আরকান'[১২০] পালনের ক্ষেত্রে তিনি বলতেন:

> "নামায তা'দিলে আরকানের মাধ্যমে পড়তে হবে। কারণ নামায হচ্ছে সকল ফিরিশতাদের বিভিন্ন অবস্থার সমষ্টি। তাঁদের একদল আছেন ক্বিয়াম অবস্থায়, আরেকদল আছেন রুকু অবস্থায়, অন্যরা আছেন সিজদাবনত অবস্থায়। একটি দল আছেন সর্বদা অনড়, অপর একদল আছেন শুধুমাত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের মধ্যে। আরো একদল তাসবিহ পড়ছেন ও অপর আরেকদল ব্যস্ত আছেন তাকবির উচ্চারণের মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া হেতু আমাদের নামাযের মধ্যে এসব বিভিন্ন দল ফিরিশার আমলকে একত্রিক করে দিয়েছেন। বাড়িয়ে দিয়েছেন বনি আদমের নামাযের মর্যাদাকে বহুগুণে।"[১২১]

এসব ব্যাপার হযরতের নামাযকালীন অবস্থায় প্রভাব ফেলতো। দেখা যেতো তিনি কোনো কোনো সয়ম নামাযের অবস্থায় নিরবে বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

ফরয নামাজ পরে তিনি হাত তুলে দু'আ করার সময়ও বেশ কাঁদাকাটি করতেন। তাঁর এ অবস্থা উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলতো। তাঁরাও হযরতের সঙ্গে কাঁদতেন।

সময় বণ্টন

সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের গুরুত্ব দেওয়া তাসাওউফের একটি অন্যতম উসূল। ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'রিসালাতুল কুশাইরী'[১২২] গ্রন্থে 'ওয়াক্ত' এর ওপর একটি পুরো অধ্যায় রচনা করেছেন। আমার

---

[১২০] এর অর্থ হচ্ছে নামাযের প্রতিটি কাজ: যেমন, দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদি সুন্নাত মুতাবিক সঠিকভাবে আদায় করা।

[১২১] শায়খ কামরুজ্জামান, খ. ৪, পৃ. ৪৮৯।

[১২২] আলহামদুলিল্লাহি! খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ থেকে ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহর তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর প্রণীত প্রামাণ্যগ্রন্থ 'রিসালাতুল কুশাইরী ফি ইলমিত তাসাওউফ' রচনার হাজার বছর পরে প্রথমবারের মতো মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ হয়েছে। অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।

শায়খ হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ বলতেন, একটি সেকেন্ডও বিফলে যেতে দেবে না। একবার এক কারণে অসুস্থ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত থেকে তাঁকে গাড়ি দিয়ে অন্যত্র নেওয়া হয়েছিলো পরীক্ষার জন্য। কিন্তু বাস্তবে এটা ভুল ছিলো। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অন্য রোগির বদলে তাঁকে নিয়ে যাওয়ায় ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব রাগান্বিত সুরে বললেন, "হেই মিয়া ইঞ্জিনিয়ার! কেনো আমার ১ ঘণ্টা সময় নষ্ট করলে? জবাব দাও!" আমি বিষয়টি অবগত ছিলাম না। তবে তাঁর রাগ দেখে নিরব রইলাম। তিনি আরো বললেন, "আমি এই এক ঘণ্টায় অন্তত দুই পারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতাম।"

হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর দৈনন্দিন ২৪ ঘণ্টার আমলের একটি সময়-তালিকা নির্দিষ্ট ছিলো। যেমন: আছর থেকে মাগরিবের সময়টুকুতে একাকী থাকতেন। এ নিয়মটি বিশেষভাবে পালিত হতো জুমু'আবারে। একমাত্র মেহমান, ছাত্র ও মুরিদ ছাড়া এসময় কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতেন না।

অন্যান্য সময় যদি কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আসতেন, তিনি আগন্তুকের দিকে পুরোপুরি ঘুরে তাকাতেন। আগন্তুত ছাত্র হলে, তার ইলমি সংশয়-প্রশ্নের জবাব দিতেন। অনেকে আসতো শরীয়ত কিংবা তাসাওউফের বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে। তিনি সঠিক জবাব দিয়ে বিদায় করতেন। কেউ কেউ আসতো শুধুমাত্র সুহবত লাভের আশায়। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন। এরপর তিনি নিজের আমল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন:

> "বিভিন্ন জিকির-আজকার ও ওজায়িফ সময়মতো আদায় না হলে এগুলোর কাজা আদায় করা যেতে পারে। রাতে যা কাজা হয়েছে দিনে পূরণ করে নেওয়া যায়। অনুরূপ দিনের কাজা জিকির-আজকার রাতে পূরণ করে নিলেই হয়। অরপদিকে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায় আগত ব্যক্তিদের নসিহত না করার কাজা তো আদায় হবার নয়!"

সম্রাট হুমায়ুনের আগমন

মোগল সম্রাট হুমায়ুন ৯৩৭ হিজরি সনে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। একদা তিনি বেঙ্গালাহ থেকে দিল্লির পথে যাত্রাকালে জাহানাবাদে এসে হযরত কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হযরত তাঁকে বেশ কিছু নসিহত করেন। হুমায়ুন তাঁকে খুব তাজিম করেন এবং বিদায়কালে হযরতের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের আশা

পোষণ করেন। কিন্তু সিঁড়ি থেকে পড়ে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করায় আর সাক্ষাৎ ঘটে নি।

দুনিয়ার সম্পদের প্রতি অনাসক্তি

হযরতের ধন-সম্পদ কম ছিলো না। তিনি কখনও এগুলোর দেখভাল করেন নি। এর কারণ হলো তিনি দুনিয়ার সম্পদের প্রতি মোটেই আকর্ষণ বোধ করতেন না। তিনি এ ব্যাপারে বলতেন: “কোনো সুফি যদি দুনিয়ার কিছু প্রাপ্ত হয়, তাকে এসব বস্তুর প্রতি নিজের হৃদয়ের আকর্ষণ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে হবে। এর কারণ হলো পরহেজগারী ও ধন-সম্পদ একটা আরেকটার বিপরীত। এ দুটো একত্রিত হওয়ার কোনো উপায় নেই।”

সন্তানাদি

হযরতের তিন জন পুত্রসন্তান ছিলেন:

১. হযরত শাহ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লা।

২. হযরত শাহ জামালুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ- তিনি অল্প বয়সে মারা যান।

৩. হযরত শাহ আলাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ। তিনি শাহ হুসাইন নামেও পরিচিত ছিলেন।

হযরত শাহ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ উচ্চ পর্যায়ের সুহরাওয়ার্দি শায়খ ছিলেন। পরবর্তীতে আমরা তাঁরই জীবনালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইন্তিকাল

হযরত শায়খ সাইয়্যিদ কুতুবুদ্দিন কৌরাহ জাহানাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ ৪১ বছর কৌরাহে বসবাসের পর মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে এখানেই চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর কিছুদিন পূবে তিনি বলেছিলেন:

> “আহ্বানকারী আহ্বান করছে। আল্লাহ তা’আলা থেকে প্রেরিত আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও। অন্যান্য আকাবিরও প্রস্থান করে নিচ্ছেন।”

কিছুদিন পর তিনি খবর পেলেন মায়া কাজী খান ইন্তিকাল করেছেন। এরূপ খবর এলো শায়খ লাদুন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ[১২৩] চলে গেছেন মায়াবী এ ধরা থেকে। হযরত বললেন, “এবার আমার পালা।” সত্যিই তা-ই হলো। আল্লাহর এ মহান ওলি ৯৪৬ হিজরি সনের ২৭শে রবিউস সানী দুনিয়া থেকে বিদায় হন। তিনি এ পৃথিবীতে ৮৩ বছর জীবিত ছিলেন।[১২৪] তিনি কৌরাহতেই সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর মাক্বামাতকে বুলন্দ করুন।

[১২৩] তাঁর নাম ছিলো আবদুল গফুর। তিনি মাওলানা সামা’উদ্দিন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহর নাতি ছিলেন। তিনি দিল্লিতে শিক্ষাদান এবং শরীয়ত ও তরিকতের ওপর বয়ান করেছেন। মানুষ তাঁকে ‘শায়খ লাদুন’ নামেই চিনতো। অনেকে তাঁর আসল নাম জানতো না। -আক্বওয়ালে সালাফ।

[১২৪] কাশবাহ কাওরাহ তারিখ ওয়া শাখসিয়্যাত, পৃ. ১২১-১৪১।

হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন ইবনে সাইয়্যিদ কুতুবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৯৮৫ হিজরি, সমাধি- কৌরাহ, জাহানাবাদ, ভারত।)

তিনি ছিলেন মাখদুম সাইয়্যিদ কুতুবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাখদুম সাহেব স্বীয় মুর্শিদের নামানুসারে তাঁর এ পুত্রের নাম রাখেন বাহাউদ্দিন।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শায়খ বাহাউদ্দিন জন্মস্থান কৌরাহতেই পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেন। এছাড়া বালিগ হওয়ার পরই স্বীয় পিতাকে নিজের মুর্শিদ হিসেবে বেছে নেন। এরপর তিনি চলে যান জৌনপুরে। সেখানে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে উচ্চতর শিক্ষার্জন করেন। ফিরে এসে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

খিলাফত লাভ

নিজের কামিল পিতার সুহবতে থেকে দীর্ঘদিন সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর খিলাফত লাভ করেন পিতার কাছ থেকে। তাঁকে মুরিদ করার অনুমতি দেওয়া হয় ৯২৪ হিজরি সনে। চারটি সিলসিলায় তিনি মুরিদ করার অনুমতি লাভ করেছিলেন। এগুলো হলো চিশতিয়া, নিযামিয়া, শাত্তারিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকা।

দুই মাদরাসা ও দুই খানক্বাহ

হযরত বাহাউদ্দিনের পিতা হযরত মাখদুম রাহিমাহুল্লাহ ৯৪৬ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। ফলে হযরতের দায়িত্ব আরো ভারী হয়ে ওঠে। একদিকে মাদরাসার দেখভাল ও শিক্ষাদান এবং অপরদিকে মুরিদানদের সঠিক দিকনির্দেশনা করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া হযরতের উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি হেতু বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এসে জড়োত হতে থাকেন। এর ফলে কৌরাহতে দুটি মাদরাসা ও দুটি খানক্বাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত শাহ বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ও খানক্বার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তাঁর ছোটভাই শাহ আলাউদ্দিনকে আরেকটি মাদরাসা ও খানক্বাহ প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়। সুতরাং

কৌরাহতে তখন জোড়া মাদরাসা ও খানক্বাহ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে দ্বীনের স্বার্থে। এগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ কৌরাহতে ঠিকে থাকে স্বগৌরবে।

হযরত বাদাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে গুণিজনের মতামত

'বাহর দাক্কার' নামক কিতাবের লেখক তাঁর সম্পর্কে বলেন:

> "তিনি ছিলেন সংযমীদের ইমাম ও স্বীয় কীর্তিমান পিতার সুযোগ্য খলিফা।"

'বায়াতুল আউলিয়া' কিতাবের লেখক বলেন:

> "তিনি নিজেকে আধ্যাত্মিক সাধনা ও চেষ্টার মধ্যে সম্পৃক্ত রাখতেন। তিনি ছিলেন কাশফ-কারামাতওয়ালা ওলি।"

হযরতের পুত্র শায়খ মাখতুম জাহানিয়া সানী রাহিমাহুল্লাহ 'আসরার সালারি' নামক স্বরচিত গ্রন্থে লিখেন:

> "এক রাতে আমার পিতাজী 'আল্লাহ! আল্লাহ!' জিকির করছিলেন। দেখা গেলো সময় সময় তিনি দৈহিক দিক থেকে বড়ো হয়ে যাচ্ছেন এবং পরবর্তীতে আবার ছোট হতে হতে খুব ক্ষীণ হয়ে গেছেন। আমি এ আশ্চর্য ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখে অবাক হয়ে যাই। একদিন ভোরে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি তখন নাস্তা করছিলেন। দেখলাম তাঁর বুক থেকে 'হু! হু!' আওয়াজ উঠছিলো।"

শায়খ ইয়াহইয়া সান্দেলবী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর একজন জলিলুল কদর খলিফা।

উচ্চমানের এ লেখক তাঁর 'নাজহাতুল খাওয়াতির' কিতাবে লিখেছেন:

> "মহান ওলিআল্লাহ শায়খ বাহাউদ্দিন ইবনে সালাহ হানাফি কাওসারী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মাশাইখে আজমের মধ্যে একজন। তিনি কৌরাহতে জন্মগ্রহণ করেন ও বড়ো হন। কৌরাহ কানপুর ও ফতেহপুরের মধ্যবর্তী একটি ছোট্ট শহর। তিনি ছিলেন আলিম-উলামা ও পরজেহগার একটি পরিবারের সদস্য। তিনি স্বীয় পিতার তরিকার উত্তরাধিকার ছিলেন। তাঁর দ্বারা বৃহৎ এক জনগোষ্ঠি উপকৃত হয়েছিল।"

দুর্ভাগ্যবশত হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কিত আর কোনো কিতাব বা সূত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। এরপরও উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ একজন উচ্চ পর্যায়ের সুহরাওয়ার্দি শায়খ ছিলেন। তিনি অন্যান্য প্রসিদ্ধ তরিকারও শায়খ হিসেবে শরীয়ত ও তাসাওউফের খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। উপকৃত হয়েছেন অসংখ্য আল্লাহর বান্দা-বান্দী। এছাড়া নিজের তিন সন্তানসহ বেশ ক'জন খলিফা রেখে যান- যাঁরা তাঁর কার্যাদি অব্যাহত রাখেন তিন প্রজন্ম পর্যন্ত।

খুলাফা

'আসরার জাহানী' নামক কিতাবে আছে হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর খলিফা ছিলেন একুশ জন। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন তাঁর পুত্র হযরত শাহ হামিদুদ্দিন মাখদুম জাহানিয়ান সানী রাহিমাহুল্লাহ।[১২৫]

হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর চিরবিদায় গ্রহণ

আমরা হযরতের সঠিক জন্ম ও মৃত্যুতারিখ জানতে পারি নি। তবে অধিকাংশ মতে তিনি ৯৮৫ হিজরি সনের পরে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর সন-তারিখ সম্পর্কে তাঁর পুত্র হযরত মাখদুম জাহানিয়ান সানী রাহিমাহুল্লাহ লিখেন:

"আমার পিতা ২৯ জুমাদাউস সানী ৯৮৫ হিজরি শুক্রবার দিন আমার সম্মুখে উপস্থিত থেকে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন।"

এ তথ্য থেকে এটাই নিশ্চিত হওয়া গেলো যে তিনি ৯৮৫ হিজরি সনে জীবিত ছিলেন। এক বর্ণনানুযায়ী মৃত্যুকালে হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর। তাঁর তিনজন সন্তান ছিলেন: ১. শাহ হামিদুদ্দিন (মাখদুম জাহানিয়ান সানী), ২. শাহ মুনাওয়ার, ৩. শাহ নিযামুদ্দিন।

হযরত বাহাউদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ কৌরাহতেই সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ বন্ধুজনের মাক্বামাতকে বুলন্দ করুন। তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাক্বামে। তাঁর বিশ্রামস্থলকে কিয়ামত পর্যন্ত নূরান্বিত ও বরকতময় রাখুন।

---

[১২৫] তারিখে কৌরাহ জাহানিয়া, পৃ. ১৪৩।

হযরত মাওলানা শায়খ মুবারক সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ৯৮৮ হিজরি, সমাধি- আদিলপুরাহ, বুরহানপুর, ভারত।)

তাঁর নাম ছিলো শায়খ মুবারক। তিনি সিন্ধুতে বসবাস করতেন। এ কারণেই তিনি শায়খ মুবারক সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহ নামে পরিচিত হন।

জন্ম ও শিক্ষা
বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুর পাথার শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ও হযরত শায়খ তাহির মুহাদ্দিস রাহিমাহুল্লাহর পূর্বপুরুষরা এ অঞ্চল সর্বপ্রথম আবাদ করেছিলেন। হযরত মুবারক এ শহরেই বেড়ে ওঠেন। প্রাথমিক শিক্ষার্জন শেষে তিনি চলে যান মাওলানা মাখদুম আব্বাস ইবনে শায়খ জালাল সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহর কাছে। এখানে ইলমে শরীয়তের উচ্চতর জ্ঞানার্জন করে তিনি আলিম হন।[১২৬]

আহমদাবাদে অবস্থান
আলিম হওয়ার পর নিজের জন্মস্থান ছেড়ে হযরত মাওলানা মুবারক রাহিমাহুল্লাহ গুজরাটের আহমদাবাদে আসেন। এখানে কয়েক বছর থেকে শিক্ষকতা করেন।

বুরহানপুরে আগমন
আবারো ভ্রমণের ইচ্ছে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হলো। তিনি আহমদাবাদ ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ শেষে চলে আসলেন বুরহানপুরে। তিনি জানতে পেরেছিলেন এখানে অনেক ওলিআল্লাহ বসবাস করেছেন। মসজিদে মুলকে তিনি বসবাস শুরু করলেন। ধীরে ধীরে গড়ে তুলেন একটি মাদরাসা। তাঁর উচ্চমানের শিক্ষাপদ্ধতির সংবাদ অচিরেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক ছাত্র এসে তাঁর মাদরাসায় ভর্তি হলেন।

বুরহানপুরের শাসক হযরত মাওলানা মুবারক রাহিমাহুল্লাহর উচ্চতর জ্ঞান-প্রজ্ঞার কথা জানতে পেরে চৌপরা নামক তাঁর কাজিকে অব্যাহতি দিয়ে হযরতকে কাজি

[১২৬] তারিখে আউলিয়ায়ে কিরাম বুরহানপুর, পৃ. ২২৭।

হিসেবে নিয়োগদান করেন। তিনি বেশ কিছুদিন এ দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

আইলচপুরে গমন

হযরত মাওলানা মুবারক রাহিমাহুল্লাহর যুগে বিরার অঞ্চলের শাসকের নাম ছিলো দরিয়া ইমাদ শাহ [শাসনকাল: ১৫৩০-১৫৬১]। তার প্রধান উজিরের নাম ছিলো তাফাদুল খান- যিনি জ্ঞানচর্চার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি যখন হযরত মুবারক রাহিমাহুল্লাহর জ্ঞান-প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তাঁকে আইলচপুরে (বর্তমানে আচালপুর নামে পরিচিত) আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। শায়খ এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। বিচারকের দায়িত্ব ছেড়ে চলে আসলেন আইলচপুরে। খুব শান-শওকত ও সম্মানের মাধ্যমে তাফাদুল খান তাঁকে স্বাগত জানালেন। ইতোমধ্যে খান সাহেব আইলচপুরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদরসায়ে ইমাম শাহ নামক এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান হতো ফিক্বাহ, হাদিস, মানতিক ও দর্শনসহ বিভিন্ন উচ্চতর বিষয়ে। খান সাহেব হযরত মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করেন।

উল্লেখ্য এই মাদরাসায়ই যুগের বিখ্যাত ক'জন শিক্ষক শিক্ষকতা করেছিলেন। এদের মধ্যে শায়খ তাহির ইউসুফ সিন্ধী ও শায়খ মুহাম্মদ তাইয়্যিব সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুরহানপুরে প্রত্যাবর্তন

তাফাদুল খানের মৃত্যুর পর বারারে নেমে আসে অরাজকতা। শায়খ মুবারক রাহিমহাহুল্লাহ সেখানে আর বসবাস করতে পারলেন না। সুতরাং তিনি ফিরে আসলেন বুরহানপুরে। তাঁর সঙ্গে আরো আসলেন মুহাদ্দিস তাহির ইউসুফ সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহ। হযরত শায়খ মুবারক বাকি জীবন বুরহানপুরেই কাটান।

বাইআত ও খিলাফত লাভ

বুরহানপুরে থাকাবস্থায় কোনো এক সময় হযরতের হৃদয় দুনিয়াবিমূখতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি তাসাওউফের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। একজন কামিল পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ জরুরী মনে করলেন। তিনি ইস্তিখারাসহ আল্লাহর নিকট দুআ করলেন কাঙ্ক্ষিত মুর্শিদের সন্ধান পেতে। সে সময় বুরহানপুরে অবস্থান করছিলেন হযরত

শায়খ শাহ লস্কর মুহাম্মদ আরিফ কুদ্দিসা সিররুহু। এ মহান ওলির মুরিদ হওয়ার জন্য ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ছুটে গেলেন তাঁর দরবারে।

প্রথমে তিনি শরহে কায়সারী নামক কিতাবের দারস নেন হযরত আরিফ রাহিমাহুল্লাহর কাছে। একই সময় শায়খের নিকট শিক্ষার্জন করছিলেন হযরত শায়খ ঈসা জুন্দুল্লাহ সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহ।

কিছুদিন পাঠ গ্রহণের পর হযরত আরিফ রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন মাওলানা মুবারক রাহিমহুল্লাহ। সুহরাওয়ার্দিয়া-শাত্তারিয়া তরিকাপন্থী শায়খ আরিফের সুহবতে থেকে তিনি খিলফাত লাভে ধন্য হন বেশ কিছুদিন পরে।

চরিত্র মাধুর্য

হযরত মাওলানা মুবারক সিদ্ধী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন অনুপম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী। যুগের একজন বড় মাপের আলিম ও সুফি হিসেবে তাঁর সুনাম ছিলো। তিনি সর্বদা নামায পড়তেন ও রোযা রাখতেন। অপরদিকে শিক্ষকতা ও তরিকতের মুর্শিদ হিসেবে তাসাওউফের খিদমতেও নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। হাজার হাজার মুসলমান তাঁর থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। তিনি খুব নরমদিলের মানুষ ছিলেন। দেখা যেতো প্রায়ই তাঁর চোখদুটো অশ্রুতে সিক্ত। এছাড়া তিনি খুব অল্প সময় নিদ্রা যেতেন। কোনো কোনো সময় দেখা যেতো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই একবারও চোখ বন্ধ করেন নি। তিনি হযরত শায়খ লার্জিও সিন্ধীর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি শ্রবণে খুব আগ্রহশীল ছিলেন।

পরপারের আহ্বানে

মায়াবী এ পৃথিবী থেকে একদিন সবাইকেই পরপারের চিরন্তন জীবনের দিকে পাড়ি জমাতে হয়। হযরত মুবারক রাহিমাহুল্লাহ মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেন এক জুমুআ বারে ৯৮৮ হিজরি সনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইয়া আল্লাহ! আপনার এ মায়ার বান্দা ও ওলিকে দান করুন অফুরন্ত বিনিময়। বুলন্দ করুন তাঁর মাক্বামাতকে। হযরত মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বুরহানপুরেই সমাহিত আছেন। তাঁর সমাধিস্থল শহরতলীর আদিলপুরে হযরত শায়খ ইব্রাহিম ইবনে উমর সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহর সমাধির পাশেই অবস্থিত।[১২৭]

---

[১২৭] তারিখে আউলিয়ায়ে কিরাম, বুরহানপুর, খ. ১. পৃ. ২২৯।

হযরত শায়খ নূরুদ্দিন আহমদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১১৫৫ হিজরি, সমাধি- আহমদাবাদ, ভারত।)

তাঁর নাম শায়খ নূরুদ্দিন। কুনিয়াত মাখদুম আলম। তাঁর পিতার নাম ছিলো হযরত হাজী হারামাইন শায়খ মুহাম্মদ সালেহ রাহিমাহুল্লাহ। জুমাদিউল উলার ১০ তারিখ ১০৬৪/১০৬৩ হিজরি সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিরা জন্ম নেন সৌভাগ্য নিয়ে। হাদিস শরীফে আছে:
হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

-একজন সৌভাগ্যবান লোক তখন থেকেই সৌভাগ্যবান, যখন সে তার মায়ের উদরে ছিলো। [তাবারানী, বাইহাকী]

জন্ম থেকেই হযরত নূরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর অবয়বে পরিলক্ষিত হয় পরহেজগারী, সৌভাগ্য ও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আলামত।

শিক্ষাগ্রহণ ও প্রশিক্ষণলাভ

হযরত নূরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ মাত্র ১০ বছর বয়সে কুরআন শরীফ হিফজ করেন। ফার্সি ভাষার কিতাব গুলিস্তাঁ পাঠ করেন মাত্র ৭ দিনে। তাঁর শিক্ষক ছিলেন নিজের সুশিক্ষিতা মাতা। এরপর দ্বীনি শিক্ষাগ্রহণ করেন মাওলানা আহমদ ইবনে মুল্লা ফরিদুদ্দিন আহমদাবাদী রাহিমাহুল্লাহর নিকট। তাঁর তরিকতের মুর্শিদ ও হাদিসের শিক্ষক ছিলেন মাওলানা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আবুল-মজদ মাহবুব আলম রাহিমাহুল্লাহ। কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদ-মুশাহাদা শেষে খিলাফত লাভ করেন সুহারাওয়ার্দিয়া তরিকায়। তবে অন্যান্য সুফি তরিকাপন্থী ওলিদের কাছ থেকেও তিনি খিলাফত লাভে ধন্য হন। হযরত নূরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ বাহ্যিক শরীয়ত ও মানতিক জ্ঞানের ওপরও উচ্চতর শিক্ষার্জন করেন। সমসাময়িক যুগে তাঁর সমকক্ষ এতো উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী অন্য কেউ জীবিত ছিলেন না।

শিক্ষকতা ও ওয়াজ-নসিহত

মাওলানা নূরুদ্দিন আহমদাবাদী রাহিমাহুল্লাহর উচ্চতর জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বয়ানাত ও শিক্ষকতার উৎকর্ষতার সুনাম সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছে এসে জড়োত হতে থাকেন। তিনি খুব যৌক্তিক ও দালিলিক বয়ান করতেন বিভিন্ন বিষয়ে। অসংখ্য মানুষ তাঁর ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ করতে মাহফিলে যোগ দিতো। হযরত নূরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর অনেক ছাত্র পরবর্তীতে বড়ো মাপের আলিম হয়েছিলেন।

মাদরাসা নির্মাণ

আহমদাবাদের শায়খুল ইসলাম খান মুহাম্মদ আকরাম উদ্দিন ছিলেন হযরত নূরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহর একজন বিশিষ্ট ছাত্র ও মুরিদ। তিনি এক লক্ষ রুপির বিনিময়ে হযরতের জন্য একটি মাদরাসার ইমারত তৈরি করেন। নির্মাণকাজ শুরু হয় ১১০২ হিজরি এবং শেষ হয় ১১০৯ হিজরি সনে।

মাদরাসার বোর্ডিংয়ে বসবাসরত সকল ছাত্রকে দৈনিক ২ রুপি দেওয়া হতো। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছাত্ররা আসতো এ উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। মাদরাসায় একটি বিরাট লাইব্রেরি ছিলো যেখানে লক্ষাধিক বই সংরক্ষিত করা হয়। বাগদাদে স্থাপিত প্রসিদ্ধ নিযামিয়া মাদরাসার সঙ্গে এ মাদরাসার তুলনা করেছেন অনেকেই। এ মাদরাসা হেতু গুজরাট হয়ে ওঠে সে যুগের ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মানুষ গুজরাটকে 'দারুল হাসানাত' ও 'দারুল উলূম' নামে আখ্যায়িত করে।

হযরতের লিখিত গ্রন্থাদি

হযরত মাওলানা নূরুদ্দিন আহমদাবাদী রাহিমাহুল্লাহ একজন সুলেখকও ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ১৭০ খানা কিতাব রচনা করেন। কিতাবাদির বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ছিলো প্রশস্ত। তাঁর প্রণীত 'তাফসিরুর রাহমানী', 'তাফসিরে রাব্বানী আলা সূরা বাক্বারাহ' ও 'হাশিয়া আউয়ালিত তাফসির বাইযাবী' খুব উন্নতমানের কটি তাফসিরের কিতাব।[১২৮]

[১২৮] দুর্ভাগ্যবশত হযরত নূরুদ্দিন আহমদাবাদী রাহিমাহুল্লাহর অধিকাংশ কিতাবাদি এখন আর পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা হযরতের এসব কিতাব থেকে উপকার লাভে বঞ্চিত হচ্ছি।

হারামাইন শরীফাইনে

হযরত মাওলানা নূরুদ্দিন আহমদাবাদী রাহিমাহুল্লাহ ১১৪৩ হিজরি সনে পবিত্র হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জমায় গমন করেন। হাজ্জের কার্যাদি শেষ করে মদিনা মুনাওয়ারায় যেয়ে রওজা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম পেশ করেন ভক্তিভরে। হারামাইন শরীফাইনে দীর্ঘ ১ বছর স্থায়ী এ সফরকালে তিনি সাক্ষাৎ পান অনেক যুগশ্রেষ্ঠ উলামা ও মাশাইখে আজমের।

ইবাদত ও সাধনা

হযরত আহমদাবাদী রাহিমাহুল্লাহ দৈনিক এক খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। এছাড়া নিয়মিত জিকির-আজকারে মশগুল থাকতেন। তিনি কখনও তাহাজ্জুদের নামায তরক করতেন না। পনেরো বছর বয়স থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত তাসবিহাত পাঠ করেছেন। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ছিলো তাঁর পরহেজগারির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জীবনে কোনো রাজা-বাদশাহর নিকট থেকে তুহফা-অনুদান গ্রহণ করেন নি।

দুনিয়া থেকে বিদায়গ্রহণ

হযরত নূরুদ্দিন আহমদাবাদী রাহিমাহুল্লাহ ১১৫৫ হিজরি সনের এক বৃহস্পতিবার দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনের দিকে পাড়ি জমান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরতকে আহমদাবাদের তাঁর মাদরাসার পাশে স্থাপিত খানক্বার নিকটে সমাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ মহান ওলির বিশ্রামস্থল কবরকে নূরোজ্জ্বল করুন। তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন আ'লা মাক্বামে।[১২৯]

[১২৯] মাহবুবুত তাওয়ারিখ, খ. ২, পৃ. ৮৫০।

হযরত শায়খ শাহ আবুল গউস বিরউই মৌ'ই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(মৃত্যু- ১১৭৮ হিজরি, সমাধি- মৌ, আজমগড়, ভারত।)

হযরত শায়খ শাহ আবুল গউস[১৩০] রাহিমহুল্লাহকে মানুষ 'গরম দেওয়ান' এবং 'দেওয়ান সাবে' বলেও সম্বোধন করতো। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ মুহাম্মদ ফারুকী বিরউই লেহরাবী রাহিমাহুল্লাহ। দাদার নাম ছিলো শায়খ ইসমাঈল।

জন্ম

হিজরি ১১০০ সনের রবিউল আখিরের এক সোমবার রাতে ভারতের উত্তর প্রদেশের মৌ জিলাধীন বিরা নামক শহরে হযরত আবুল গউসের জন্ম হয়। তাঁর এক পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত খিজির ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি হযরত শায়খ আবুল ফাতাহ রুকুনুদ্দিন ইবনে শায়খুল ইসলাম হযরত জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকে সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরিকায় খিলাফত লাভ করেছিলেন।

তিমুর লং [১৩৩৬-১৪০৫ ঈ] কর্তৃক সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞের সময় হযরত খিজির ফারুকী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পুত্র মুহাম্মদ ইবনে খিজিরকে নিয়ে দিল্লি শহর ত্যাগ করেন। তিনি জৌনপুরে এসে বসবাস শুরু করলেন। এ সময়কার জৌনপুরের শাসনকর্তা ছিলেন ধার্মিক, পরহেজগার ও উলামাদের প্রিয় পাত্র সুলতান ইব্রাহিম শারকি [শাসনকাল: ১৪০২-১৪৪০]।

সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় বাইআত গ্রহণ

শাহ আবুল গউস রাহিমাহুল্লাহ তখনও যুবক মাত্র। তাঁর পিতা মুহাম্মদ শাহ ব্যস্ত ছিলেন বিষয়-সম্পদ ও জমিজমা দেখভালের কাজে। পুত্রের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিকে খেয়াল রাখার সুযোগ তাঁর কমই ছিলো। দেওয়ান গউস সাহেবের দাদা মাখদুম ইসমাঈল সাহেব নাতির প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষার তায়িত্ব নেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন বেঁচে থাকেন নি। গউস রাহিমাহুল্লাহর বয়স যখন মাত্র ৬ বছর তখন

---

[১৩০] তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর হযরত মাওলানা কাজি আতহার সাহেব মুবারকপুরী রাহিমাহুল্লাহ 'দিয়ার পৌরাব মেই ইলম ওয়া উলামা' নামক স্বরচিত একটি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ কিতাবটিই তাঁর জীবনালোচনার সূত্র।

ইসমাঈল সাহেব ইন্তিকাল করেন। এবার তাঁর পিতাই ভরণপোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নেন।

শাহ আবুল গউস বাল্যকাল থেকেই শারীরিকভাবে অনেকটা দুর্বল ছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য ধারণ করার ক্ষেত্রে পিছপা ছিলেন না। ধর্মকর্ম ও বিদআতবিরোধী অবস্থান পরিণত বয়সে প্রস্ফুটিত হয় তাঁর চরিত্রে। তিনি শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত নয় এমন কোনো কুসংস্কারকে কখনও মানতেন না। নামায, রোযা ও নফল ইবাদতের প্রতি তাঁর আগ্রহ খুব অল্প বয়সেই ছিলো। পীর-মুরিদী তথা তাসাওউফের প্রতি পরিবারের মধ্যে ভীষণ আকর্ষণ থাকায় তিনি খুব ছোট থেকেই এ ব্যাপারে আকর্ষণ বোধ করেন।

হযরত গউসের বয়স যখন মাত্র ১১ বছর তখন তাঁর পিতা হঠাৎ সংসারত্যাগী হলেন। আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে নিজেকে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখতে একাকীত্ব গ্রহণ করলেন। আর এ সময় ছেলে গউসকেও তিনি সময় সময় সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার জিকির-শুগল শিক্ষা দিতে শুরু করেন। সন্তানের আগ্রহ ও আমল দেখে সুফি পিতার আন্তর্চক্ষু খুলে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর এ সন্তানটি সাধারণ নয়। সুতরাং ১৩ বছর বয়সে তিনি নিজের এই ছেলেকে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় মুরিদ করে নিলেন। তাঁর মুরিদ হওয়ার তারিখটি ছিলো ১২ বরিউল আউয়াল ১১১৩ হিজরি।

পিতার নিক মুরিদ হওয়ার এক বছর পরই কিন্তু হযরত শায়খ গউস রাহিমাহুল্লাহ ইয়াতীম হয়ে গেলেন। শায়খ মুহাম্মদ ফারুকী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুতারিখ ছিলো ১৫ সফর, ১১১৪ হিজরি। পিতা হারানোর স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে শায়খ গউস বিরউই রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

> “আমার বয়স যখন ১৩ হয়েছে, তখন হঠাৎ একদিন অন্তরে এ ভাবনা জাগ্রত হলো, আমার পিতাজী শিঘ্রই ইহলোক ত্যাগ করবেন। ইতোমধ্যে তিনি গত দু বছর যাবৎ নিজেকে মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে রেখেছেন। আমার উচিৎ হবে এখনই তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করা। কিন্তু পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হেতু আমি মুরিদ হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে সাহস পেলাম না। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকাতেও ভয় পেতাম। সুতরাং আমি নিজের আকাঙ্ক্ষা অন্য একজনের মাধ্যমে তাঁকে জানালাম। এতে পিতাজীর মধ্যে এ ব্যাপারে চিন্তা জাগ্রত হয়েছে

বুঝতে পারলাম। তিনি সম্ভবত ভাবলেন, যদিও আবুল গউস অন্য কারোর সুহবতে থেকে আধ্যাত্মিক রহস্য সম্পর্কে অবগত হবে, আমার জন্য উচিৎ হবে তাঁকে মুরিদ বানিয়ে পারিবারিক ঐতিহ্য অব্যাহত রাখা। সুতরাং তিনি অবশেষে আমাকে মুরিদ করেন।"

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

দেওয়ান সাহেব ১৪ বছরের বালক মাত্র যখন তাঁর পিতা ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। পারিবারিক মাদরাসায় এ বয়সেই তিনি দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজ জন্ম-শহর ত্যাগ করেন। তবে তাঁর বাড়ি ছাড়ার কয়েক বছর পূর্বে তিনি দেখেছেন আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় পিতা বানারস, গাজিপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। সুতরাং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেওয়ান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ প্রথমে বানারসে যান উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায়। কিন্তু কোন্ অদৃশ্য শক্তির ইশারায় বানারসে তিনি থাকতে পারলেন না। মনে হচ্ছিলো সেখানকার খানক্বাহ বা মাদরাসাসমূহ তাঁর জন্য উপযোগী ছিলো না। তিনি এ যাত্রা গাজিপুর হয়ে নিজের জন্ম-শহরে ফিরে আসেন। কিন্তু বেশিদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি পুনরায় ভ্রমণে যান। এ যাত্রা চলে গেলেন কাচুচ শহরে। সেখানে তিনি বিভিন্ন উলামায়ে কিরাম ও মাশাইখে আজমের সুহবত লাভে ধন্য হন। সেখানকার উস্তাদ মাওলানা শাহ রামাদ্বান রাহিমাহুল্লাহর নিকট থেকে ইলমে শরীয়তের উচ্চতর জ্ঞানলাভ করেন।

বাইআত ও খিলাফত লাভ

নিজের শহরে আরো কিছুদিন বসবাসের পর হযরত আবুল গউস দেওয়ান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বানারস হয়ে ইলাহাবাদে যেয়ে হাজির হলেন। সেখানকার আলিম মীর সাইয়্যিদ গোলাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর সুহবতে যেয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। হযরত আহমদ রাহিমাহুল্লাহর নিকট একদিন তিনি আবদার জানালেন: "হয়রত! আমি একজন তরিকতের মুর্শিদের সন্ধানে আছি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দিন অনুগ্রহ করে।" মীর সাহেব একটু ভেবে জবাব দিলেন: "তুমি চলে যাও আল্লাহর ওলি হযরত শায়খ মাওলানা শাহ ফতেহ মুহাম্মদের দরবারে। তোমার আশা সেখানেই পূরণ হবে।"

সুতরাং দেওয়ান সাহেব শাহ ফতেহ রাহিমাহুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। পিতার নিকট থেকে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় তিনি দক্ষতা লাভ করে নিয়েছিলেন ইতোমধ্যে। এ তরিকাপন্থী ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষগণও। এবার ফতেহ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে চিশতিয়া তরিকার ওপর প্রশিক্ষণ শেষে খিলাফতি দান করেন। সুতরাং তিনি সুহরাওয়িার্দিয়া ও চিশতিয়া তরিকার শায়খ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

শিক্ষক ও পথনির্দেশকবৃন্দ

আমরা বলতে পারি হযরত দেওয়ান গউস রাহিমাহুল্লাহ নিম্নে উল্লেখিত আলিম ও মাশাইখে আজমের কাছ থেকে দ্বীনি শিক্ষা ও সুহবত লাভ করে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন।

১. হযরত শায়খ মুহাম্মদ শাহ রাহিমাহুল্লাহ - বেরায় অবস্থানকারী হযরতের পীর ও পিতা।

২. হযরত মাওলানা শাহ রামাদ্বান - কাচুচ শহরে অবস্থানকারী উস্তাদ।

৩. মীর সাইয়্যিদ গোলাম আহমদ এলাহাবাদী রাহিমাহুল্লাহ - উস্তাদ।

৪. ফতেহ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ - সিদানায় অবস্থানকারী তাঁর পীর।

৫. রাজা সাইয়্যিদ খাইরুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ - লেহরায় বসবাসকারী চিশতি পীর।

৬. রাজা সাইয়্যিদ দানী রাহিমাহুল্লাহ - রাজা সাইয়্যিদ রাহিমাহুল্লাহর ভাই ও চিশতি পীর।

লেহরায় অবস্থান

দেওয়ান সাহেব নিজের পরিবার ও ভূ-সম্পদ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তিনি বেহরা ছেড়ে চলে আসেন ওয়াহদাতাবাদে। এ শহরের অপর নাম লেহরা। তিনি ভূ-সম্পদ তাঁর নিজের ছোট ভাই শায়খ আহমদ শাহ রাহিমাহুল্লাহর হাতে সমঝিয়ে আসেন। লেহরায় এসে একাকী থাকার উদ্দেশ্যে একটি ছোট্ট ঘর নিজেই তৈরি করেন। তিনি এখানে দিনরাত কাটাতেন ইবাদত-বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে। লোকজন তাঁর দরবারে আসতো পথনির্দেশনা পেতে। অনেক লোক তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে ধন্য হোন।

সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদআত থেকে মুক্ত থাকা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওাসাল্লামের সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া কেউই খাঁটি আল্লাহর বান্দা ও প্রিয়জন হন নি। এছাড়া বিদআত একটি বড়ো রোগ। বিদআতীরা খুবই কট্টরতা পালন করে এজন্য যে, তারা বিদআতকে সঠিক আমল ভাবে। সুতরাং এ থেকে বিরত থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। আমরা আল্লাহর দরবারে সাহায্যপ্রার্থী।

হযরত দেওয়ান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে শিথিলতা করেন নি। অপরদিকে কঠোর বিদআত বিরোধীও ছিলেন। তাঁর পরিবারে জন্ম নেন অনেক উচ্চ পর্যায়ের আলিম ও তরিকতের শায়খ। যেমন, শাহ আবুল খায়র, মুল্লা মুহাম্মদ, কাজি মানজাহান আলী, (তাঁর পিতা) শায়খ মুহাম্মদ ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। এরা সবাই কঠোরভাবে বিদআত বিরোধী ছিলেন। এছাড়া সবাই ছিলেন সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকাতপন্থী শায়খও।

খলিফা ও বিশিষ্ট ছাত্র

দেওয়ান গউস সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পুরো জীবটাই কাটিয়েছিলেন দ্বীনি শিক্ষার উস্তাদ ও তরিকতের পথনির্দেশক হিসেবে। অনেক ওলিআল্লাহ ও আলিম তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। এদের মধ্যে ক'জন হলেন:

১. মাওলানা হাফিজ ইসহাক লেহরাবী রাহিমাহুল্লাহ।
২. শাহ মাশুক আলী গাজিপুরী রাহিমাহুল্লাহ।
৩. শায়খ শামসুদ্দিন হায়দরী রাহিমাহুল্লাহ।
৪. শায়খ নূর মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ।
৫. হাফিজ মুহাম্মদ আলী রাহিমাহুল্লাহ।

বিখ্যাত কিতাব 'বাহর জাখখার' এর লেখক শায়খ ওয়াজিহউদ্দিন আশরাফ লৌখনবী রাহিমাহুল্লাহ হযরত শায়খ শাহ আবুল গউস বিরউই মৌ'ই রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলতে যেয়ে লিখেছেন:

> "হযরত শাহ আবুল গউস- যাকে মানুষ গরম দেওয়াম বলে সম্বোধন করতো, তিনি ছিলেন হযরত ফতেহ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর প্রধান খলিফা। সমসাময়িক যুগে একজন উদার, প্রশস্ত-হৃদয়, পরহেজগার

ও ইবাদগুজার ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মতো অপর কেউ খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিলো। বিনয় ও স্বার্থহীনতায় তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি যুগের শিক্ষক ও তরিকতের প্রশিক্ষক হিসেবে উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুগের অধিকাংশ ওলি ও দরবেশ তাঁরই অনুসরণে দেওয়ান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর যজবায়ী মেজাজ থাকায় অনেকে তাঁকে 'গরম দেওয়ান' বলে সম্বোধন করতেন।"

ইন্তিকাল

জীবন তো নয় চিরন্তন। বিদায়ের সে নির্দিষ্ট ক্ষণটি উপস্থিত হবেই। তবে কিভাবে কোথায়, কোন সময় তা হানা দেবে আমরা কেউ অবগত নয়। মহান রাব্বুল আলামীন যিনি এ জীবন দানকারী, একমাত্র তিনিই এ ব্যাপারে নিশ্চিত অবগত। আমাদের আলোচিত গরম দেওয়ান রাহিমাহুল্লাহর ক্ষেত্রে সে বিদায়ের ক্ষণটি উপস্থিত হয় পবিত্র জুমু'আবার ২৫ জুমাদিউল আখিরাহ, ১১৭৮ হিজরি সনে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর ক'দিন পূর্বে হযরত দেওয়ান সাহেব সমগ্র দেহে ভীষণ ব্যথা অনুভব করলেন। কঙ্কালসারের প্রতিটি জোড়ায় এ ব্যথা প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ মহান ওলিকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। তাঁর বিশ্রামস্থলকে আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন কিয়ামত পর্যন্ত।

والحمد لله وصلى الله على النبي الكريم

সমাপ্ত

কে কোথায় সমাহিত আছেন
































দিল্লী, ভারত
হামিদুদ্দিন নাগরী (রাহ.)


মুলতান, পাকিস্তান
সদরুদ্দিন মুলতানী (রা.)


মুলতান, পাকিস্তান


সিরাজ, ইরান
শায়খ সাদি (রাহ.)


বাদাউন, ইউপি, ভারত
জিয়াউদ্দিন নাখশাবী (রাহ.)


ইলাহাবাদ, ভারত
ইসমাঈল কুরাইশী (রাহ.)


জৌনসী, ইলাহাবাদ, ভারত
আলী শা'বান জৌনসী (রাহ.)


জৌনসী, ইলাহাবাদ, ভারত
তকিউদ্দিন জৌনসী (রাহ.)


বিহার, ভারত
তকি মাহসুরী (রাহ.)


ফতেপুর, ইউপি, ভারত
মাখদুম হুসামুদ্দিন (রাহ.)


কৌরাহ, জাহানাবাদ, ভারত
কুতুবুদ্দিন জাহানাবাদী (রাহ.)


কৌরাহ, জাহানাবাদ, ভারত
বাহাউদ্দিন (রাহ.)


বুরহানপুর, ভারত
মুবারক সিন্ধী (রাহ.)


আহমদাবাদ, ভারত
নূরুদ্দিন আহমদাবাদী (রাহ.)


আজমগড়, ভারত
আবুল গউস বিরউই (রাহ.)

গ্রন্থপঞ্জী

১. সীরাত বিশ্বকোষ- ইফাবা।
২. জিয়াউল কুলূব- হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ - অনুবাদ: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, শান্তিধারা প্রকাশনী।
৩. নবীয়ে রহমত [বঙ্গানুবাদ] - সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ, অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ইফাবা।
৪. সীরাতে মুস্তফা - ইদ্রিস কান্ধলবী রাহিমাহুল্লাহ - ইফাবা।
৫. সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - শিবলী নুমানী রাহিমাহুল্লাহ, অনুবাদ: মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহ।
৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ইবনে কাছির রাহিমাহুল্লাহ - ইফাবা।
৭. সীরাতে ইবনে হিশাম [বঙ্গানুবাদ]।
৮. তারিখে তাবারী [ইংরেজী অনুবাদ] - ইবনে জরির তাবারী রাহিমাহুল্লাহ।
৯. মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম- আহমদ সাঈদ দেহলবী, অনুবাদ: মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া পুস্তকালয়।
১০. তাযকিরাতুল আউলিয়া - ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ [ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ]।
১১. কাশফুল মাহজুব - আলী হাজভেরী দাতা গঞ্জেবখশ রাহিমাহুল্লাহ [ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ]।
১২. মাসালিক আস-সালিকীন।
১৩. The Life, Personality and Writings of Al-Junayd by Ali Hassan Abdul Kadir, Islamic Book Trust.
১৪. Ansari, Muhammad Abdul Haq. "The Doctrine of One Actor: Junaid's View of Tawhid." The Muslim World 1(1983): 33–56. Electronic. Source: en.wikipedia.org/
১৫. Sells, Michael A.. Early Islamic Mysticism: Sufi, Koran, Mi'raj, Poetic and Theological Writings. Mahwah, New Jersey: Paulist Press, 1996.
১৬. তাজাল্লিয়াতে জযব - হাকিম মুহাম্মদ আখতার রাহিমাহুল্লাহ।
১৭. হিলায়াতুল আউলিয়া - আবু নুয়াইম ইসফাহানী রাহিমাহুল্লাহ।
১৮. মাদারিজুস সালিকীন - ইবনে কাইউম যাওজী রাহিমাহুল্লাহ।
১৯. আক্বওয়ালে সালাফ [ইংরেজি অনুবাদ, ৬ খণ্ড] - কামরুজ্জামান ইলাহাবাদী।
২০. নাফাহাতুল উন্স - মাওলানা আবদুর রহমান জামী রাহিমাহুল্লাহ।
২১. তারতিবুল মাদারিক - কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ - ইংরেজি অনুবাদ: আয়শা বিউলি।
২২. তাবাক্বাত - ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ।
২৩. আল-মাকতাবাতুশ শামিলা [ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি]।
২৪. আদাবুল মুরিদীন [ইংরেজি অনুবাদ, এম. মিলসন, জেরুজালেম, ১৯৭৭], আবু নাজিব সুহরাওয়ার্দি রাহ.।
২৫. সিয়ার আলামুন নুবালা- ইমাম জাহাবী রাহ., বৈরুত, ১৯৮১।
২৬. আনওয়রুল কুদসিয়া- ইমাম শা'রানী রাহ., বৈরুত, ১৯৭৮।
২৭. আজকারে কলন্দরিয়া।

২৮. জিকরে হাসান -আল্লামা গোলাম দস্তগীর।
২৯. আদ-দারুল মুনযিম - রাজা রশীদ মাহমুদ।
৩০. মাশাইখে সুহরাওয়ার্দিয়া [ইংরেজি অনুবাদ]
৩১. আনওয়ারে সুফিয়্যাহ - আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আহমাদ শা'রানী রাহিমাহুল্লাহ।
৩২. নাজমুয জাহিরা - ইবনে তুযজি হারভি (রাহ.)
৩৩. মুনতাজাম - ইবনে জাওযী (রাহ.)
৩৪. তারিখে কাবির - হাফিজ জাহাবী (রাহ.)
৩৫. তারিখে বাগদাদ - ইবনে নাজ্জার (রাহ.)
৩৬. তাবাক্বাতুল কুবরা - আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রাহ.)
৩৭. ক্বাওয়াইদুল জাওয়াহির - মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া তাদিফী
৩৮. বাহজাতুল আসরার - আবুল হাসান আলী শাতুনুফী (রাহ.)
৩৯. গাউছুল আযম - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.)
৪০. নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী মানাক্বিবে শায়খ আবদিল ক্বাদির - মুল্লা আলী ক্বারী (রাহ.)
৪১. তাফরীহুল খাতির ফী মানাক্বিবে শাইখ সৈয়্যদুনা আবদুল ক্বাদির - সৈয়দ আবদুল ক্বাদির আরবেলী (রাহ.)
৪২. মাখযানুল সুহরাওয়ার্দিয়া।
৪৩. আজকারুল আবরার - শায়খ বাহাউদ্দিন, শাহ বদরুদ্দিন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, লাহোর, ১৯৯৫।
৪৪. কিতাবুল মাজালিস - তাওহিদ ও ত্রিত্ববাদের ওপর ইলইয়াস ও আবুল হুসাইন মাগরিবী মধ্যকার খ্রিস্ট-মুসলিম বাহাস [১০২৭ ঈ.]।
৪৫. তুহফাতুল সুহরাওয়ার্দিয়া।
৪৬. সাহায়িফে মা'রিফাত।
৪৭. বাহরুল আসরার - মাহমুদ ইবনে আমির।
৪৮. মাশাইখে আহমদাবাদ - মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে সুলাইমান মাতালা।
৪৯. আখবারুল আখইয়ার - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
৫০. হায়াতে শায়খ - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
৫১. 'আহলে দিল কি দিল আওয বাতেই' - শায়খ হাবিবুর রহমান আজমী রাহিমাহুল্লাহ।
৫২. ওসিয়্যাত - আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।
৫৩. ফাওয়াইদুস সুহবাত - মাওলানা শাহ ওয়াসিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ।
৫৪. তারিখে আউলিয়ায়ে বুরহানপুর
৫৫. মাহবুবুত তাওয়ারিখ।
৫৬. নুযহাতুল খাওয়াতির।
৫৭. মাক্বামাতে মাজহারী।
৫৮. en.wikipedia.org
৫৯. revolvy.com
৬০. sunnah.org
৬১. sufiwiki.com
৬২. দিয়ার পৌরাব মেই ইলম ওয়া উলামা- কাজি আতহার মুবারকপুরী।

৬৩. তারিখে আউলিয়ায়ে কিরাম, বুরহানপুর।
৬৪. তারিখে কৌরা জাহানিয়া।
৬৫. আসরার জাহানী।
৬৬. নাজহাতুল খাওয়াতির।
৬৭. আসরার সালারি।
৬৮. কাশবাহ কাওরাহ তারিখ ওয়া শাখসিয়্যাত।
৬৯. মাখদুম জাদগান ফাতাহপুর - মাওলানা মাস’উদ আলী।
৭০. পৌরনিয়া কি দো ওয়ালি।
৭১. তাযকিরাহ আউলিয়া জৌনসী।
৭২. তারিখে মাশাইখে ইলাহাবাদ।
৭৩. বাযম সুফিয়্যাহ।
৭৪. ইতরাফে জুনুব (confession of Sins)।
৭৫. গুলিস্তাঁ - শায়খ সাদি (রাহ)।
৭৬. বুস্তাঁ - শায়খ সাদি (রাহ.)।
৭৭. রওজায়ে আকতাব।
৭৮. সিয়ারুল আউলিয়া।
৭৯. লাতাইফে আশরাফী।
৮০. তারিখে সুফিয়্যায়ে নাগরী।
৮১. মারাটি-ই-জালালী- এস. কে. এ. বি. হাসানী।
৮২. ফাওয়াইদুল ফুয়াদ।
৮৩. বাংলাপিডিয়া -অনলাইন সংস্করণ।
৮৪. মাসালিকুস সালিকীন।
৮৫. আনওয়ারে গাউসিয়া।
৮৬. সিয়ারুল আরিফীন।
৮৭. তাফসিরে রুহুল মা’আনী।
৮৮. আওয়ারিফুল মা’আরিফ - শায়খ শিহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি (রাহ.)।
৮৯. নাফাহাতুল উনস।
৯০. Biographical Encyclopedia of Sufis in Central Asia and Middle East - N Hanif
৯১. মাশারিকুদ দিরারী।
৯২. তা’ইয়্যাহ - ইবনে ফারিদ।
৯৩. রিসালাতুল কুশাইরী [বঙ্গানুবাদ - সৈয়দ মাহমুদুল হাসান]।
৯৪. তাসাওউফ তারিখ কি আয়না মে।
৯৫. মাদারিকুস সালিকীন।